অনুবাদ

মবি ডিক

হারমান মেলভিল

BanglaBook.org

সবা প্রকাশনী

অনুবাদ

মবি ডিক

রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

তিমি শিকারে যাবে বলে ন্যানটাকেট বন্দরে এল ইসমাইল, পরিচয় হল বর্বর, নরখাদক কুইকেগের সাথে। জাহাজে নাম লেখালো ওরা, একদিন রওনা হয়ে গেল সাগরে।

তখন কি ওরা জানত, সাধারণ তিমি নয়, পেকোডের ক্যাপ্টেন শিকার করতে চান মবি ডিক নামের ভয়ঙ্কর এক সাদা তিমি?

আসুন, পাঠক, আমরাও রহস্যময় বিশাল সাগরে ইসমাইলের সঙ্গী হই, নৌকা নামিয়ে ধাওয়া করি তিমির পিছে!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

অনুবাদ

মবি ডিক

রূপান্তর ■ খসরু চৌধুরী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পঁয়ষট্টি টাকা

ISBN 984-16-3189-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স. ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

MOBI DICK
TransBy: Khashru Choudhury

মবি ডিক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

১

আমাকে আপনারা ইসমাইল বলেই ডাকুন। পেশায় আমি নাবিক, সমুদ্র আমার ধ্যান-জ্ঞান। সাগরের বিশাল ব্যাপ্তি, অতুল গাম্ভীর্য আর গভীর রহস্যময়তা আমাকে অমোঘ আকর্ষণে টানে, ডাকে হাতছানিতে।

আমি যাত্রী হিসেবে সাগরে কখনও যাইনি। কারণ, যাত্রী হতে গেলে তার কাছে মানি-ব্যাগ থাকতে হবে, অবশ্য ভেতরে টাকা না থাকলে মানি-ব্যাগও যা ন্যাকড়াও তা। তাছাড়া যাত্রীরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে, ঝগড়া করে নিজেদের মধ্যে, রাতে ভাল ঘুম হয় না– মোট কথা, সাগর ভ্রমণ কিভাবে উপভোগ করতে হয়, সে-বিষয়ে তাদের তেমন একটা জ্ঞান নেই। কমোডর কিংবা ক্যাপটেন হয়েও আমি সাগরে যাইনি কখনও। পাচক হিসেবেও নয়। অবশ্য পাচকের কাজের মধ্যে অবমাননাকর কিছুই নেই, জাহাজে সে প্রায় একজন অফিসারের মতই। যদি মুরগির ঝোলের সঙ্গে চমৎকারভাবে মেশাতে জানে মাখন, লবণ আর ঝাল, মানুষ তাকে সম্মানের চোখেই দেখে। প্রাচীন মিশরে যে-পাচক আইবিসের জন্য ভাল ঝোল বা জলহস্তীর রোস্ট করতে পারত, মিশরীয়রা তাকে পূজা করত। তবু কেন যেন ঝোল রান্না করার ইচ্ছে আমার কোনদিনই হয়নি।

আমি সাগরে যাই সাধারণ নাবিক হিসেবে। কখনও দাঁড়িয়ে থাকি মাস্তুলের সামনে, কখনও নেমে যাই ফোরক্যাসলে, আবার কখনও উঠি মাস্তুলের মাথায়। এটা সত্যি যে কখনও কখনও আমাকে অন্যের আদেশ পালন করতে হয়। লাফাতে হয় এক কাষ্ঠদণ্ড থেকে আরেক কাষ্ঠদণ্ডে, ঠিক যেমন মে মাসে তৃণভূমিতে লাফায় ঘাসফড়িং। প্রথম প্রথম এসব সত্যিই খুব খারাপ লাগত। সব মানুষেরই লাগার কথা, বিশেষ করে সে যদি আসে সম্ভ্রান্ত কোন পরিবার থেকে। আপনি যদি হন কোন গ্রামের স্কুলমাস্টার, তাহলেও এসব আদেশ হজম করা কঠিন হবে আপনার পক্ষে। স্কুলের সবচেয়ে লম্বা, ষণ্ডা মার্কা ছেলেটাকেও যিনি দাঁড় করিয়ে রাখতে অভ্যস্ত, তাঁর জন্যে অন্যের আদেশ পালন করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

আমি যদি কোন বুড়ো ক্যাপটেনের কথামত ডেক ঝাড় দিই, কী ক্ষতি হয় তাতে? আপনি কি মনে করেন, আদেশ পালন করতে আমার যেরকম মনোভাব হয়, স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের অনুভব তার চেয়ে খুব বেশি কিছু আলাদা ছিল? পৃথিবীতে কে ক্রীতদাস নয়? বলুন আমাকে। বুড়ো ক্যাপটেন আমার ওপর আঙুল

নাচায় সত্যি, কিন্তু তারও রয়েছে আঙুল নাচানোর লোক।

নাবিক হিসেবে সাগরে যাবার আরও একটা কারণ আছে আমার। আদেশ পালন করতে গিয়ে যে-কষ্ট হয়, তার বিনিময়ে টাকা পাই আমি। কিন্তু যাত্রীদের একটা পয়সা দেয়ার কথাও আমি শুনিনি কখনও, বরং যাত্রীরাই জাহাজে চড়ার জন্য টাকা দেয়। এখানেই পৃথিবীর যাবতীয় পার্থক্য– কেউ দেয় আর কেউ নেয়। কাউকে টাকা দেয়াটাই বোধহয় মানুষের জন্যে সবচেয়ে অস্বস্তিকর কাজ। কিন্তু নেয়াটা, একে কীসের সঙ্গে তুলনা করা যায়? টাকা নেয়ার সময় মানুষের ভাব যেমন গদগদ হয়ে ওঠে, তা সত্যিই অপূর্ব!

নাবিক হিসেবে সাগরে যাবার আরও একটা কারণ আছে আমার। চমৎকার ব্যায়াম হয়, ফোরক্যাসল ডেকে দাঁড়িয়ে পাওয়া যায় খাঁটি বাতাস। কোয়ার্টার ডেক থেকে কমোডর যদিও মনে করে যে বাতাস প্রথমে সে-ই পাচ্ছে, আসলে তা নয়। সে পায় আমাদের গায়ে পরশ বুলিয়ে যাওয়া পুরানো বাতাস। এভাবেই সাধারণ মানুষ অনেক সময় সন্দেহ না জাগিয়ে নেতৃত্ব করে নেতাদের ওপর। যাই হোক, ব্যবসায়ীদের জাহাজে অনেক বার গেছি বলে ঠিক করলাম, এবার সাগরে যাব তিমি শিকারীদের সঙ্গে।

জানি না, এত পথ থাকতে নিয়তি আমাকে এ-পথে দাঁড় করাচ্ছে কেন। প্রকাণ্ড এই রঙ্গমঞ্চে মানুষের কত রকমারি ভূমিকা! কেউ অসাধারণ অভিনয় করছে বিয়োগান্ত নাটকে, কেউ অপেক্ষকৃত সহজ অভিনয় করছে মিলনান্তক নাটকে, আবার কেউ স্রেফ মজা পাবার জন্যে অভিনয় করছে প্রহসনে। কিন্তু আমিও তো একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, আমিই বা কেন নিজেকে ঠেলে দিচ্ছি এই তিমি শিকার অভিযানে?

প্রধান কারণ তিমি নিজেই। আকর্ষণীয়, রহস্যময় প্রাণীটা আমার যাবতীয় কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে। বন্য, দূর সমুদ্রে ওরা ঘুরে বেড়ায় দ্বীপের মত শরীর নিয়ে। অন্য মানুষের হয়তো এমন মনে হবে না, কিন্তু দূরের প্রতি আমার আকর্ষণ চিরকালের। আমি ভালবাসি নিষিদ্ধ সাগরে যেতে, নামতে ভালবাসি বর্বরদের দেশে। হয়তো ভাবছেন, তাহলে কি বর্বরদের ভয় পাই না আমি? নিশ্চয় পাই, আর দশটা মানুষের মত আমারও রয়েছে আতঙ্কের বোধ। তবে কিনা আমি মিশতে পারি বর্বরদের সঙ্গেও, একবার ওদের দেশে নেমে পড়লে মেশার চেষ্টা করাই ভাল।

সুতরাং সব দিক ভেবে তিমি শিকার অভিযানে যাওয়াই ঠিক করলাম। খুলে গেল আশ্চর্য এক জগতের দরজা, অন্তরের গভীর সাগরে সারি বেঁধে ভেসে আসতে লাগল তিমির পর তিমি, মাঝখানে ভৌতিক একটা পূর্ণ অবয়ব– বাতাসে ঝুলে থাকা বরফ– পাহাড়ের মত।

২

পুরানো কার্পেট-ব্যাগে গোটা দুই জামা ঢুকিয়ে, ব্যাগটা বগলের নিচে গুঁজে

কেপ হর্ন আর প্রশান্ত মহাসাগরের উদ্দেশে রওনা দিলাম আমি। ডিসেম্বরের এক শনিবার পৌঁছুলাম নিউ বেডফোর্ড। কিন্তু শুনে খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম যে ন্যানটাকেটগামী ছোট্ট জাহাজটা ছেড়ে গেছে ইতিমধ্যে। আগামী সোমবারের আগে সেখানে যাবার আর কোন উপায় নেই।

বেশির ভাগ তরুণ এই নিউ বেডফোর্ডে বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পড়ে তিমি শিকার অভিযানে, কিন্তু আমার তা জানা ছিল না। ন্যানটাকেটগামী জাহাজে উঠে পড়ার কথা ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারিনি। পুরানো ওই বিখ্যাত দ্বীপটার প্রাণচাঞ্চল্য আমাকে আকর্ষণ করে। তিমি ব্যবসার দিক থেকে নিউ বেডফোর্ডের তুলনায় ন্যানটাকেট যদিও- এখন অনেক পিছিয়ে আছে, তবু ন্যানটাকেট ন্যানটাকেটই। আমেরিকার মধ্যে এখানেই প্রথম একটা তিমি আটকা পড়েছিল চড়ায়, এখানেই একটা জাহাজ নুড়ি পাথরে বোঝাই করা হয়েছিল তিমির গায়ে ছোঁড়ার জন্যে– এমনি আরও অনেক গল্প আছে ন্যানটাকেটকে ঘিরে।

একটা রাত, একটা দিন এবং আরও একটা রাত আমাকে থাকতে হবে নিউ বেডফোর্ডে। কিন্তু এই সময়টা আমি কাটাব কোথায়? খাবই বা কি? নিরানন্দ, বিশ্রী রাতটা তার ঠাণ্ডা বাহুতে জড়িয়ে নিতে চাইল আমাকে। এখানে কাউকে চিনি না আমি। উদ্বিগ্ন হয়ে হাত ঢোকালাম পকেটে, বেরিয়ে এল কয়েকটা রৌপ্য মুদ্রা। ব্যাগ কাঁধে নির্জন এক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উত্তরের আঁধারকে আমি তুলনা করে দেখতে লাগলাম দক্ষিণের সঙ্গে। নিজেকে বললাম, ইসমাইল, আজ রাতে যেখানেই শোয়ার বন্দোবস্ত করো না কেন, সেখানে ঢোকার আগে ভাড়াটা একবার জিজ্ঞেস করে নিও।

ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। চোখে পড়ল 'দ্য ক্রস্ড্ হারপুনস্'-এর সাইনবোর্ড, কিন্তু জায়গাটাকে খুব বেশি ব্যয়বহুল মনে হলো। খানিক পর দেখলাম, লাল জানালা দিয়ে 'সোর্ড ফিশ ইন'-এর আলো এসে পড়েছে রাস্তায়, মনে হচ্ছে সে-আলোতে পুরু বরফ গলে গিয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে মোহময় এক দৃশ্য। কিন্তু এই সরাইখানাটাকেও মনে হলো বেশ দামী। কান পাতলাম, ভেতর থেকে ভেসে আসছে গ্লাসের টুং টাং শব্দ। এগোও, ইসমাইল, এগোও, শুনতে পাচ্ছ না? এ-জায়গা তোমার জন্যে নয়। অগত্যা প্রায় বারোটা বেজে যাওয়া বুটের তলায় আটকানো বরফ ঝেড়ে পা বাড়ালাম। নিজের অজান্তেই পানির প্রান্তে গেছে এমন সব রাস্তা ধরে এগোলাম। তীরের সরাইখানাগুলো এতটা আনন্দদায়ক না হলেও সস্তা নিশ্চয়ই হবে।

কী নির্জন সব রাস্তা! গোরস্থানের মত এখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছে দু'একটা মোমবাতি। শহরের এই অংশে জনমানুষের চিহ্নও নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল চওড়া, নিচু একটা বিল্ডিং। ধোঁয়ার মত একটা আলো সেখানে, খোলা দরজাগুলো যেন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বিল্ডিংটায় যত্নের কোন চিহ্ন নেই, সম্ভবত এখানে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার অবাধ। ঢুকতে গিয়েই ছাইয়ের একটা বাক্সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম আমি, মেঘের মত চারপাশে উড়তে লাগল ছাই। ভেতর থেকে ভেসে এল মোটা একটা স্বর। উঠে ছাই ঝেড়েঝুড়ে আরেকটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

একশো একটা কালো মুখ চেয়ে রয়েছে আমার দিকে, তাদের সামনে বিশালদেহী এক লোক মোটা একটা বই হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলপিটে। সরাইখানা ভেবে নিগ্রোদের একটা গির্জায় ঢুকে পড়েছি আমি।

এগোতে এগোতে এবার বন্দরের প্রায় কাছে এসে চোখে পড়ল একটা সাইনবোর্ড। সাদা হরফে লেখা রয়েছে– 'দ্য স্পাউটার ইন-পিটার কফিন।'

কফিন? স্পাউটার? গাঢ় অন্ধকার এই রাতে কেমন যেন অশুভ ঠেকল নামগুলো। কিন্তু ন্যানটাকেটে এই ধরনের নাম অহরহই দেখা যায়। মালিক ওই পিটার খুব সম্ভব অন্য জায়গা থেকে এসে আস্তানা গেড়েছে এখানে। স্বল্পালোকিত কাঠের ঘরগুলো দেখলে মনে হয়, পুরো সরাইখানাটাকেই বুঝি তুলে আনা হয়েছে অন্য কোন দেশ থেকে। সাইনবোর্ডটার অবস্থাও খুব খারাপ। তবে আমি যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি। নিশ্চয় এখানে সস্তায় থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ কয়েক মিনিট, রাজ্যের চিন্তা ভিড় করল মাথায়। তারপর সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বুটের তলা থেকে বরফ পরিষ্কার করতে লাগলাম। দেখা যাক, এই 'স্পাউটার' জায়গাটা কেমন।

৩

সরাইখানার প্রথম ঘরটার এক পাশের দেয়ালে প্রকাণ্ড এক অয়েল-পেইন্টিং। কিন্তু নানারকম ময়লা আর বছরের পর বছরের সঞ্চিত ধুলোয় সেটার এমন অবস্থা যে বোঝা কঠিন, কীসের ছবি ওটা। তবে খুব ধৈর্য ধরে লক্ষ করলে বোঝা যায়, শিল্পী এঁকেছেন মাঝরাতের ঝড়ে উথাল-পাতাল কৃষ্ণসাগর। আরেক পাশের দেয়ালে ঝুলছে বিশাল সব গদা আর বর্শা।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটা পেরিয়ে এগোতেই পাবলিক রুম। মাথার ওপরে কাঠের কড়ি, পায়ের নিচে কাঠের জীর্ণ পাটাতন। পাবলিক রুমটার এক প্রান্তে একটা গুহামত জায়গা– সরাইখানার বার। বারটা তৈরি করা হয়েছে রাইট হোয়েলের মাথার অনুকরণে। অনুকরণটা যদিও অক্ষম; বারে রাখা আছে একটা তিমির চোয়াল, ওটার ভেতর দিয়ে অনায়াসেই যাতায়াত করতে পারবে একটা বাস।

ধুলোভরা পুরানো সব তাকে সাজানো পুরানো ডিক্যান্টার, বোতল আর ফ্লাস্ক। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে এক বুড়ো, টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছে ঘোর আর মৃত্যু। মদ এখানে খুবই সস্তা, মাত্র এক শিলিংয়ে পাওয়া যায় পুরো এক গ্লাস।

অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা টেবিল ঘিরে বসে রয়েছে কয়েকজন নাবিক। সরাইখানার মালিককে খুঁজে বের করে বললাম, রাতে থাকার জন্যে আমার একখানা ঘর চাই। সে জানাল, ঘর নেই, সব ইতিমধ্যেই ভাড়া হয়ে গেছে। তারপর কপালে টোকা দিয়ে বলল, 'তবে আপনার বোধহয় কোন হারপুনারের সঙ্গে থাকতে আপত্তি নেই, নাকি আছে? হাবভাবে তো মনে হচ্ছে তিমি শিকারে যাচ্ছেন, এই ধরনের পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচয় থাকা ভাল।'

জবাব দিলাম, অন্য কারও সঙ্গে শোয়ার ব্যাপারটা আমি পছন্দ করিনা। তবে যদি আর কোনও উপায় না থাকে এবং হারপুনার লোকটা ভীষণ আপত্তিকর না হয়, তাহলে এই শীতের রাতে অপরিচিত একটা শহরে ঘোরাঘুরি করার চেয়ে আমি বরং তার সঙ্গে কম্বল ভাগাভাগি করতেই রাজি আছি।

'আমি সেরকমটাই ভেবেছিলাম। বসুন, রাতের খাবার এক্ষুণি রেডি হয়ে যাবে।'

বসে পড়লাম একটা বেঞ্চে। পাশে এক মাতাল নাবিক তার ছুরি নিয়ে ঝড়ে পড়া জাহাজ সামলানোর ভান করছে। অবশেষে আমাদের চার পাঁচজনকে খাবার জন্যে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো পাশের ঘরে। জায়গাটা আইসল্যাণ্ডের মত ঠাণ্ডা, কোন আগুনের ব্যবস্থা নেই, এক পাশে জ্বলছে চর্বির দুটো মোমবাতি। সরাই মালিক জানাল, আগুনের বিলাসিতা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কাঁপা কাঁপা হাতে আমরা তুলে ধরলাম গরম চায়ের কাপ। খাবারের মধ্যে চা ছাড়া রয়েছে মাংস, আলু আর ডাম্পলিং। হায় ঈশ্বর! সাপারের জন্যে ডাম্পলিং! সবুজ বক্স-কোট পরা এক তরুণ নাবিক ভয়ঙ্কর চোখমুখ করে বকাবকি করতে লাগল ডাম্পলিংগুলোকে।

'বাছা,' বলল সরাই মালিক, 'আজরাতে তুমি নিশ্চিত দুঃস্বপ্ন দেখবে।'

সরাইখানার মালিককে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'এই কি সেই হারপুনার?'

'আরে না না,' বীভৎস এক আনন্দ পাবার মত মুখ করে বলল সরাই মালিক, 'হারপুনারের গায়ের রঙ গাঢ়। তাছাড়া সে কখনও ডাম্পলিং খায় না- শুধু স্টেক খায়।'

'কিন্তু সে গেছে কোথায়?' জানতে চাইলাম আমি।

'ঘুরতে বেরিয়েছে, এসে পড়বে,' সরাই মালিক জবাব দিল।

খাবার শেষ করে সবাই ফিরে গেল বারে। হাতে কোন কাজ নেই বলে আমি দেখতে লাগলাম তাদের কার্যকলাপ।

হঠাৎ ভেসে এল একটা হট্টগোলের শব্দ। সরাই মালিক উত্তেজিত স্বরে বলল, 'গ্রাম্পাস-এর নাবিক, টাটকা খবর পাওয়া যাবে ওদের কাছ থেকে।'

প্রবেশপথের মুখে পাওয়া গেল সী-বুটের শব্দ, দড়াম করে দু'পাশে খুলে গেল দরজা, হৈ হৈ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল এক দল নাবিক। পরনে তাদের ওয়চ কোট, মাথা ঢাকা পশমী মাফলারে, দাড়ি থেকে ঝুলছে পেরেকের মত বরফ। কাউন্টারের বুড়ো ব্যস্ত হয়ে মদ ঢালতে লাগল টাম্বলারে। এক নাবিক বলল, তার মগজের ভেতরটা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তার দিকে জিন আর চিটা গুড়ের একটা পিচের মত কালো মিশ্রণ এগিয়ে দিল বুড়ো।

দেখতে দেখতে মদ দখল করে নিল তাদের মগজ, দারুণ হৈ চৈ জুড়ে দিল নাবিকের দল।

একজনকে দেখলাম দল ছেড়ে একটু সরে বসে আছে। অবশ্য সঙ্গীদের আনন্দ নষ্ট করতে চায় না সে, কিন্তু এত হৈচৈও যেন করতে চায় না। কৌতূহলী হয়ে পড়লাম লোকটার ব্যাপারে। লম্বায় পুরো ছয় ফুট, চওড়া কাঁধ, সুগঠিত বুক, সারা শরীরে কিলবিল করছে অসংখ্য পেশি। মুখমণ্ডল তামাটে, ঝিকমিক করছে

BanglaBook.org

দাঁতের সারি, চোখের অতলে যেন বিষণ্নতার ছায়া। স্বর কানে আসতেই বুঝতে পারলাম দক্ষিণের লোক সে, খুব সম্ভব এসেছে ভার্জিনিয়ার অ্যালেগানিয়ান পার্বত্য অঞ্চল থেকে। সঙ্গীদের হট্টগোল তুঙ্গে উঠতে আস্তে করে বার থেকে বেরিয়ে গেল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সঙ্গীরা লক্ষ করল ব্যাপারটা। সোরগোল উঠল তাদের মধ্যে– 'বালকিংটন! বালকিংটন! বালকিংটন কোথায়?' তার খোঁজে বার থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল সবাই।

প্রায় ন'টা বাজে। নাবিকেরা বেরিয়ে যেতে পিন পতন নীরবতা নেমে এল বারে। একটা চিন্তা দোলা দিল আমার মাথায়।

সম্ভবত কোন মানুষই আরেকজনের সঙ্গে বিছানা ভাগাভাগি করে শুতে চায় না। সত্যি বলতে কি, নিতান্ত নিরুপায় না হলে আপন ভাইয়ের সঙ্গে ঘুমানোর ব্যাপারেও আপত্তি করবেন আপনি। এর কারণ আমি জানি না, খুব সম্ভব ঘুমানোর সময় সব মানুষই গোপনীয়তা পছন্দ করে। তাহলে অপরিচিত কোন শহরে যদি ঘুমাতে হয় অপরিচিত কোন মানুষের সঙ্গে– বিশেষ করে সে-মানুষ যদি আবার হয় কোন হারপুনার, আপত্তির পরিমাণ বাড়বে বই কমবে না। আর সরাই মালিক যে বলল, নাবিকদের একত্রে ঘুমানোর অভ্যাস করা ভাল, তারও কোন যুক্তি নেই। নাবিকরা এক ঘরে শোয় সত্যি, কিন্তু সবার থাকে আলাদা হ্যামক, আলাদা কম্বল।

যত ভাবলাম ততই আরও বেশি আপত্তিকর মনে হলো হারপুনারের সঙ্গে শোয়ার ব্যাপারটা। শেষমেশ চেঁচিয়ে উঠলাম সরাই মালিকের উদ্দেশে, 'ওই হারপুনারের ব্যাপারে আমি মত বদল করেছি। বরং ওখানকার বেঞ্চটাতেই শুয়ে পড়ি।'

'যা আপনার খুশি,' জবাব দিল লোকটা।

কিন্তু বেঞ্চটা ঘরের এক কোণে টেনে নিয়ে শুতেই বাধল বিপত্তি। জানালার পাল্লার ফাঁক দিয়ে আসছে হাড়কাঁপানো বাতাস।

মনে মনে যাচ্ছেতাই সব গালি দিতে লাগলাম অদেখা সেই হারপুনারকে। আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়– আমি লুকিয়ে থাকব দরজার আড়ালে, তারপর হারপুনার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলে লাফিয়ে পড়ব বিছানার ওপর। মন্দ হয় না, কিন্তু আরেকটা চিন্তা আসায় বাতিল করতে হলো এই পরিকল্পনা। এমন আচরণ করলে হয়তো আগামীকাল সকালে আমার মাথায় বাড়ি দেয়ার জন্যে দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকবে হারপুনার!

চারপাশে নজর বুলিয়ে মনে হলো, অন্য কারও সঙ্গে বিছানা ভাগাভাগি না করলে দুর্দশার এই রাত শেষ হবে না। তাছাড়া আমি যে অযথা ভয় পাচ্ছি না, তা-ই বা কে বলতে পারে। হয়তো দেখা যাবে, হারপুনার লোকটা ভাল মানুষ, হয়তো তার সঙ্গে গড়ে উঠবে নিবিড় বন্ধুত্ব– কে জানে!.

কিন্তু অন্য সব বাসিন্দারা যখন ফিরে এল একজন দু'জন করে, তখনও হারপুনারের কোন পাত্তা নেই।

'সরাই মালিকের কাছে জানতে চাইলাম, 'কী ধরনের লোক সে– সবসময় কি এমন গভীর রাত করে ফেরে সে?' ঘড়িতে এখন প্রায় বারোটা।

BanglaBook.org

খুক খুক করে চাপা একটা হাসি দিল লোকটা। 'না। দেরি তো সে করে না। বুঝতে পারছি না, আজ এত দেরি করছে কেন। হয়তো মাথা বিক্রি করতে পারেনি।'

'মাথা বিক্রি করতে পারেনি?– এ কোন্ গল্প শোনাতে চাইছেন আমাকে?' রাগ লাগল আমার। 'আপনি কি বলতে চান, শনিবারের এই রাতে সে শহরে গেছে মাথা ফেরি করতে?'

'একদম ঠিক বুঝেছেন,' বলল ব্যাটা, 'কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম, বিক্রি সে করতে পারবে না। বাজার এখন ওই জিনিসে ভর্তি।'

'কী জিনিসে?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'মাথায়। আবার কিসে?'

'দেখুন, মিস্টার, আজেবাজে গল্প বলে আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবেন না– আমি কাঁচা মানুষ নই।'

'হুঁ,' লম্বা একটা কাঠি চেঁছে টুথপিক তৈরি করতে করতে বলল সে, 'তবে মাথা নিয়ে আজেবাজে কথা বলছেন জানতে পারলে ওই হারপুনার কিন্তু আপনাকে ছাড়বে না।'

'ওর মাথা আমি ফাটিয়ে ফেলব,' সরাই মালিকের তালগোল পাকানো গল্পের কিছুই এখনও বুঝতে পারিনি আমি।

'সেটা তো ইতিমধ্যেই ফেটে গেছে,' বলল সে।

'ফেটে গেছে? আপনি সত্যি বলতে চাইছেন যে ফেটে গেছে?'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই তো বিক্রি করতে পারছে না।'

'দেখুন,' তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি, 'এখনই আপনার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। আমি আজ রাতে থাকার জন্যে আপনার কাছে একটা ঘর চেয়েছিলাম। আপনি বললেন, খালি ঘর দিতে পারবেন না, সেখানে একজন হারপুনার থাকে। সে-হারপুনারকে আমি এখনও দেখিনি, কিন্তু আপনি তার সম্বন্ধে আজগুবি সব গল্প বলে চলেছেন। পরিষ্কার করে বলুন, হারপুনার লোকটা কেমন, তার সঙ্গে থাকা নিরাপদ কিনা। মাথার গল্পটা যদি সত্যি হয় তাহলে বুঝতে হবে, ওই লোক বদ্ধ পাগল। কোন পাগলের সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা আমার নেই, আর সে-অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করতেও চাই না। আপনি জেনেশুনে এরকম একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে আমাকে ঠেলে দিতে চাইলে দেশের অপরাধ আইনে আপনার বিচার হওয়া উচিত।'

'থামুন,' লম্বা করে শ্বাস টানল লোকটা, 'যথেষ্ট বক্তৃতা হয়েছে। হারপুনার লোকটা সদ্য ফিরেছে দক্ষিণ সাগর থেকে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে নিউজিল্যান্ডের এম্বামিং করা কয়েকটা মাথা, আর সেগুলোই সে বিক্রি করছে। নিশ্চয় জানেন, এম্বামিং করা মাথার দারুণ চাহিদা রয়েছে কিউরিও হিসেবে। বিক্রি করা প্রায় শেষ, শুধু একটা মাথা সে এখনও বিক্রি করে উঠতে পারেনি। আগামীকাল রোববার বলে আজ গেছে সেই মাথাটা বিক্রি করতে। গির্জায় প্রার্থনা করতে যাওয়া লোকজনের সামনে দিয়ে মাথা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো খুব স্বস্তিকর দৃশ্য নয়। গত রোববারে আমি বাধা দিয়েছিলাম, সে তো প্রায় বেরিয়েই পড়েছিল কোমরে

BanglaBook.org

চারটে মাথা ঝুলিয়ে।'

এতক্ষণে বোঝা গেল, আমাকে বোকা বানাবার কোনরকম ইচ্ছে সরাই মালিকের নেই।

বললাম, 'ঐ হারপুনার বিপজ্জনক লোক।'

'কিন্তু ভাড়া দেয় নিয়মিত,' জবাব দিল সরাই মালিক। 'আসুন, রাত অনেক হয়ে গেছে। যে-খাটে থাকতে দেব, দু'জনে শুয়েও হাত-পা ছুঁড়তে পারবেন। আসুন, আসুন, কী হলো?'

এক মুহূর্ত ভেবে পা বাড়ালাম। লোকটাকে অনুসরণ করে ওপরতলার একটা ঘরে এলাম। দারুণ ঠাণ্ডা, তবে খাট সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলেনি সে। দু'জন কেন চারজন লোকও অনায়াসে থাকতে পারবে।

'ওই যে,' পুরানো একটা সী চেস্টের ওপর মোমবাতি রেখে বলল পিটার, 'ওখানে এবার আরাম করে শুয়ে পড়ুন। গুডনাইট।' খাটের দিক থেকে চোখ ফেরাবার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

শুজনি উঠিয়ে ভাল করে দেখলাম বিছানাটা, আরামদায়ক না হলেও একেবারে খারাপ নয়। এবার নজর বোলালাম ঘরটার চারপাশে। আসবাবপত্রের বালাই নেই বললেই চলে, শুধু জীর্ণ একটা শেল্‌ফ্ আর একটা ফায়ারপ্লেস। এক কোণে পড়ে রয়েছে একটা হ্যামক আর বড়সড় একটা নাবিকের ব্যাগ। হারপুনারের যাবতীয় পোশাক-আশাক নিশ্চয় ওটার মধ্যেই আছে। শেল্‌ফের ওপর মাছের হাড়ের কয়েকটা বড়শি, বিছানার মাথার দিকটায় দাঁড় করানো রয়েছে বিরাট এক হারপুন।

বিছানার এক পাশে বসে ভাবতে লাগলাম অদেখা হারপুনারের কথা। তারপর উঠে ঘরের মাঝখানে গিয়ে মাঙ্কি জ্যাকেটটা খুলে ফেলে ভাবতে লাগলাম আবার। কিছুক্ষণ পর খুলে ফেললাম কোট, শুধু শার্ট পরে থাকায় দেখতে দেখতে কাঁপন শুরু হলো শরীরে। মোমবাতিটা নিভিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ ঘুম এল না। তারপর কেবল যখন তন্দ্রামত এসেছে, প্যাসেজ থেকে ভেসে এল ভারী পদশব্দ, আলো চোখে পড়ল দরজার নিচ দিয়ে।

ধক করে উঠল বুকের ভেতরটা, নিশ্চয় সেই হারপুনার! নিশ্চল হয়ে রইলাম, বাধ্য না হলে কথা বলব না। এক হাতে একটা মোমবাতি আরেক হাতে নিউজিল্যাণ্ডের এম্বামিং করা মাথা নিয়ে ঘরে ঢুকল হারপুনার। বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত না করেই মোমবাতিটা রাখল ঘরের এক কোণে, তারপর খুলতে বসল নাবিকদের সেই ব্যাগ। মুখটা দেখার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তা দেখা গেল না। যখন দেখলাম, চমকে উঠলাম আমি। হায় ঈশ্বর! এ কী মুখ! রঙ তার লালচে হলুদ, এখানে-সেখানে আবার বড় বড় কালচে চৌকো দাগ। যা ভেবেছিলাম তা-ই, আমার এই সঙ্গীটি ভয়াবহ না হয়েই যায় না। নিশ্চয় কারও সঙ্গে লড়াই করে কেটেকুটে গেছে, এখন সোজা ফিরছে সার্জনের কাছ থেকে। কিন্তু না, আলো সরাসরি মুখের ওপর পড়তে দেখলাম, ওগুলো স্টিকিং-প্লাস্টার নয়। প্রথমটায় বুঝতে পারলাম না দাগগুলো কিসের, তারপর একটা কথা দোলা দিল মাথায়। একজন তিমি শিকারীর গল্প শুনেছিলাম,

BanglaBook.org

নরখাদকদের দেশে যাবার পর নরখাদকরা তার সারা গায়ে এঁকে দিয়েছিল উল্কি। এই হারপুনারেরও নিশ্চয় সেরকম কোন অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু গায়ের ওই রঙ কি সূর্যতাপের ফল? দক্ষিণ সাগরে অবশ্য কখনও যাইনি আমি, তাই বলে শ্বেতাঙ্গ কোন মানুষ সূর্যতাপে এমন লালচে হলুদ হয়ে যায়, সে-কথাও শুনিনি কখনও। হারপুনারটা আমাকে এখনও লক্ষ করেনি। ব্যাগ খুলে একটা টোমাহকের মত পাইপ আর সীলের চামড়ার একটা ওয়ালেট বের করল সে, ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল শুকনো মাথাটা। এবার সে মাথা থেকে খুলে ফেলল নতুন বীভার হ্যাট। চমকে উঠলাম আবার। তার লালচে হলুদ মাথাজোড়া টাকটাকে মনে হচ্ছে ছাতা পড়া কোন নরকঙ্কালের খুলি। হারপুনার যদি আমার আর দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে না থাকত, নিশ্চিত ঝেড়ে দৌড় দিতাম আমি।

তবু জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাবার কথা ভাবলাম একবার। কাপুরুষ আমি নই, কিন্তু হারপুনারের চেহারা যে এতটা ভয়ঙ্কর, স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। মনে হলো, গভীর রাতে স্বয়ং শয়তান যেন ঢুকে পড়েছে আমার ঘরে। এত ভয় পেলাম যে গলায় স্বর ফুটল না।

ধীরে ধীরে কাপড় ছাড়ছে সে। মুখের মত তার বুক আর বাহুতেও চৌকো চৌকো দাগ, যেন তিরিশ বছর যুদ্ধ করে এইমাত্র ছাড়া পেয়েছে সে। পায়েও তার একইরকম দাগ। আর সন্দেহ নেই, এই লোক বর্বর-নরখাদক। কে জানে, মাথাটা তার আপন ভাইয়েরই কিনা। আমার ওপরেও চোখ যে পড়বে না, সেটাই বা কে বলতে পারে। ব্যাটার টোমাহকটা চোখে পড়লেই পিলে চমকে ওঠে।

কিন্তু চমকে ওঠারও সময় নেই। তার এবারের কার্যকলাপে নিশ্চিত হলাম যে সে বিধর্মী। চেয়ারে ঝোলানো পোশাকের পকেট থেকে আবলুস কাঠের মত চকচকে একটা পিঠ কুঁজো মূর্তি বের করল সে, বসিয়ে দিল ফায়ারপ্লেসের ওপর। মূর্তিটা যেন অবিকল কঙ্গোর একটা দিন তিনেকের শিশু।

চোখ সরু করে দেখতে লাগলাম, এবার ব্যাটা কী করে। প্রথমে পোশাকের পকেট থেকে চাঁছা কাঠের মুঠো দুয়েক পাতলা ফালি বের করে সাবধানে রাখল মূর্তিটার সামনে, তারপর সেগুলোর ওপর কয়েকটা বিস্কুট রেখে আগুন ধরিয়ে দিল। একটু পরেই বিস্কুটগুলো বের করে রাখল মূর্তির সামনে, নিবিয়ে দিল আগুনটা। কিন্তু অতি শুকনো এই নৈবেদ্য বুঝি পছন্দ হলো না দেবতার, খাওয়া তো দূরের কথা, ঠোঁটও ফাঁক করল না সে। ওদিকে গদগদ হয়ে তার ভক্ত আউড়ে চলেছে বিধর্মীদের প্রার্থনা-সঙ্গীত। পূজা শেষে মূর্তিটাকে অবহেলাভরে আবার রেখে দিল পকেটে, ঠিক যেমন শিকারী তার ব্যাগে ছুঁড়ে দেয় গুলির ঘায়ে মৃত বনমোরগ।

অদ্ভুত এসব কাণ্ডে আমার অস্বস্তি বেড়ে চলল। টোমাহকটা তুলে নিয়ে মোমবাতির আলোয় পরীক্ষা করল সে। তারপর ধরিয়ে গলগল করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে, দাঁতে কামড়ে ধরে এক লাফে এসে পড়ল বিছানার ওপর। অজান্তেই চিৎকার কোরে উঠলাম আমি। বিস্মিত একটা ঘোঁৎ শব্দ ছেড়ে বিছানা হাতড়াতে লাগল সে।

তোতলাতে তোতলাতে গড়ান দিয়ে সরে গেলাম দেয়ালের কাছে। তারপর

তাকে অনুরোধ করলাম শান্ত হবার জন্যে।

'তুমি আবার কোন্ শয়তান?' বলল সে। 'কী, কথা বলবে, নাকি খতম করে দেব?' টোমাহক নাচাতে লাগল হারপুনার।

'পিটার, ঈশ্বরের দোহাই, পিটার কফিন!' চেঁচালাম আমি। 'মি. পিটার! দেখুন কী কাণ্ড! কফিন! হে ঈশ্বর, রক্ষা করো!'

'বলো কে তুমি! কথা না বললে খুন করে ফেলব!' তার টোমাহকের নাচনে ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল গরম ছাই। আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, কাপড়ে না আবার আগুন ধরে যায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মোমবাতি হাতে ঘরে এসে উপস্থিত হলো সরাই মালিক। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে গেলাম তার পাশে।

'ভয় পাবেন না,' মুচকি হাসল সরাই মালিক। 'কুইকেগ আপনার কোন ক্ষতি করবে না।'

'থামুন!' গলা চড়ালাম আমি, 'কেন আগে বলেননি যে এই হারপুনারটা একজন নরখাদক?'

'আমি ভেবেছিলাম, আপনি জানেন,' কুইকেগের দিকে ঘুরল সরাই মালিক, 'ইনি আজরাতে তোমার সঙ্গে থাকবেন, ঠিক আছে?'

বিছানায় বসে পাইপ টানতে লাগল কুইকেগ।

'এসো,' অবশেষে বিছানার দিকে নির্দেশ করল সে। নরখাদক হলেও খুব ভাল মানুষ সে। অযথাই এতক্ষণ ভয় পেয়েছি তাকে। নরখাদক তো রক্ত-মাংসের আর দশটা মানুষের মতই। আমি যদি তাকে ভয় পাই, সেও আমাকে ভয় পেতে পারে। মাতাল কোন খ্রিস্টানের চেয়ে নম্র একজন নরখাদকের সঙ্গে ঘুমানোই ভাল।

'মি. পিটার,' বললাম আমি, 'টোমাহকটা ওকে সরিয়ে রাখতে বলুন, বন্ধ করতে বলুন ধূমপান।'

সরাই মালিকের মুখে কথাটা শুনতেই পাইপ নিবিয়ে দিল কুইকেগ, তারপর বিছানার এক পাশে যথাসাধ্য সরে গিয়ে নরম সুরে আবার ডাকল আমাকে।

'গুডনাইট, পিটার কফিন,' বললাম আমি, 'এখন আপনি যেতে পারেন।' সে চলে যেতেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সেরাতের চেয়ে ভাল ঘুম আমার জীবনে আর কখনও হয়নি।

৪

পর দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখলাম, আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে কুইকেগ। ওর হাতটা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুমের মধ্যেই আরও জোরে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

'কুইকেগ!' ডাকলাম আমি জোর ধাক্কা দিয়ে। জবাবে ভীষণ জোরে নাক ডেকে উঠল দু'বার। গড়িয়ে সরে গেলাম এক পাশে। শুজনিটা খানিক উঠিয়ে টোমাহকটাকে শিশুর মত পাশে শুইয়ে রেখেছে ও।

BanglaBook.org

'কুইকেগ, ওঠো, কুইকেগ!' আবার ডাকলাম আমি। ঘোঁৎ করে উঠল ও। জোরে জোরে আরও বেশ কয়েক বার ডাকার পর নড়ল কুইকেগ। সারা শরীর ঝাঁকাল পানি থেকে ওঠা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের মত। বসে চোখ কচলে এমনভাবে তাকাল, যেন আমি এখানে কিভাবে এলাম বুঝতে পারছে না। তারপর ধীরে ধীরে চোখে ফুটল পরিচয়ের চিহ্ন। আমি চুপচাপ চেয়ে রইলাম, অদ্ভুত এই জিনিসকে অবশ্যই ভালভাবে জানা দরকার। অবশেষে আমার কথা পুরোপুরি মনে পড়ে গেল ওর। এক লাফে বিছানা থেকে নিচে নামল কুইকেগ। নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে বোঝাল, আগে ও কাপড় পরতে চায়, তারপর আমার জন্যে ছেড়ে দেবে ঘরটা। কোন বর্বরের পক্ষে এই আচরণ দারুণ সভ্য মনে হলো, আমিই বরং গত রাতে রুক্ষ ব্যবহার করেছি ওর সঙ্গে। কৌতূহল আরও বহু গুণ বেড়ে গেল আমার। তবে এটা নিশ্চয় আপনারা স্বীকার করবেন যে কুইকেগের মত মানুষ প্রতি দিন দেখা যায় না।

প্রথমে লম্বা বীভার হ্যাট মাথায় দিল কুইকেগ, তারপর ট্রাউজারস না পরেই তুলে নিল বুটজোড়া। এরপর যে-কাণ্ডটা ঘটল, তার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি । ধপাস করে বসে পড়ল মেঝেতে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সোজা বিছানার তলায়। ফোঁসফোঁসানি আর নড়াচড়ার ধরনে বুঝতে পারলাম, কুইকেগ এখন বুট পরার কঠিন কাজে ব্যস্ত। ওর এই আচরণ অদ্ভুত হলেও অর্থ কিন্তু পরিষ্কার। কুইকেগ এখন রয়েছে রূপান্তরের স্তরে, না সভ্য না বর্বর। পুরো সভ্য হলে বুট পরার মত সাধারণ একটা বিষয় নিয়ে মাথাই ঘামাত না, তেমনি বর্বরের রেশ রয়ে না গেলে বুট পরার জন্যে ঢুকত না বিছানার নিচে। বেশ কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল কুইকেগ, ঘরের এক পাশ থেকে আরেক পাশে পায়চারি করতে লাগল খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

ঘরটার জানালায় কোন পর্দা নেই, ফলে কাছের বাড়িগুলো থেকে পুরো ঘরটা দেখা যায়। ভেবে দেখুন, এই অবস্থায় কুইকেগ পায়চারি করছে শুধু বীভার হ্যাট আর বুট পরে। তাড়াতাড়ি টয়লেট সেরে ওকে প্যান্ট পরতে বললাম আমি। এতক্ষণে ব্যাপারটা ওর মাথায় ঢুকল। সকালে যে-কোন খ্রিস্টান মুখ ধোয়, কিন্তু কুইকেগ কাজ সারল বুক, বাহু আর হাতে পানি দিয়ে। এরপর ওয়েস্টকোট পরে, শক্ত একটা সাবান ঘষে ফেনা লাগাল মুখে। মনে মনে কেবল ভাবছি, রেজর রেখেছে কোথায়, তখনই ঘটল আরেক কাণ্ড। সাবান ঘষা শেষ করে ছোট্ট একটা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, কাঠের হাতল খুলে ফেলে রেজরের কাজ চালাতে লাগল হারপুন দিয়ে। তখন হাসি পেলেও পরে জেনেছি, দারুণ ধার হারপুনের মাথায় আর সেটা তৈরি হয় সেরা ইস্পাতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল ওর টয়লেটের কাজ। মাঙ্কি জ্যাকেট পরে, মার্শালদের ব্যাটনের মত করে হারপুন নাচাতে নাচাতে গর্বিত পদক্ষেপে বেরিয়ে এল কুইকেগ।

BanglaBook.org

৫

ঝটপট পোশাক পরে নেমে এলাম বার-রুমে। মি. পিটার এক গাল হাসল আমাকে দেখে। তার ওপর কোন রাগ নেই আমার, তবে হারপুনারকে নিয়ে রহস্য করায় খানিকটা বিরক্ত হয়েছিলাম। যাই হোক, প্রাণখোলা হাসি একটা দারুণ ভাল জিনিস। প্রাণ খুলে হাসতে পারলে খারাপ অনেক কিছুই দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

বার-রুম এখন গত রাতে আসা বোর্ডারে ভর্তি। প্রায় সবাই তিমি শিকারের সঙ্গে যুক্ত। চীফ মেট, সেকেণ্ড মেট, থার্ড মেট, ছুতোর, কুপার, কামার, হারপুনার, শিপ কীপার। সবার পরনে লোমঅলা মাঙ্কি জ্যাকেট।

চিবুকের রঙ দেখলে অনায়াসেই বলে দেয়া যায়, কে কত বেশি দিন সাগরে থেকেছে। কিন্তু কুইকেগের মত রঙবেরঙের চিবুক কি আর কোন লোকের আছে? শুধু রঙ বৈচিত্রই নয়, তার চিবুকের গঠনটাও দেখবার মত। চিবুক তো নয় যেন আণ্ডিজ পর্বতমালার পশ্চিম ঢাল।

'কই, এসো!' একটা দরজা খুলে চেঁচাল সরাই মালিক। নাস্তা করার জন্যে হুড়মুড় করে এগোল সবাই।

টেবিলে বসে মনে মনে আশা করলাম, এবার শুনতে পাব তিমি শিকারের গরম গরম গল্প। কিন্তু আমাকে দারুণ অবাক করে দিয়ে একদম চুপ মেরে রইল সবাই। ব্যাপারটা কিছুতেই মেলাতে পারলাম না। অসমসাহসী যে-সব লোক তিমির মুখোমুখি হতেও ভয় পায় না, নাস্তার টেবিলে বসে তারা মুখ খোলা তো দূরের কথা, খানিকটা যেন অস্বস্তিবোধ করছে।

নির্লিপ্তভাবে টেবিলের এক মাথায় বসে রয়েছে কুইকেগ। কিন্তু নাস্তার টেবিলে হারপুন সঙ্গে করে আনাটা বোধ হয় তার সবচেয়ে বড় ভক্তও মেনে নেবে না। তবে কিনা বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা, নির্লিপ্ত হয়ে থাকাটাই ভদ্রতার প্রকাশ।

কুইকেগের নাস্তা করার বিশদ বিবরণ আমি দিতে যাচ্ছি না। কফি বা হট রোল ছুঁয়েও দেখল না ও, মনোযোগ যা কিছু রইল বীফস্টেকের ওপর। নাস্তা সেরে আর সবার সঙ্গে সেও গেল পাবলিক রুমে, পাইপ ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল গলগল করে। শহরটায় একটা চক্কর লাগাবার জন্যে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমি।

৬

নিউ বেডফোর্ডের কয়েকটা রাস্তায় ঘুরতেই কুইকেগের কথা ভুলে গেলাম। এই শহরের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। কেবল হোয়েলম্যানই নয়, এখানে রয়েছে খাঁটি নরখাদক। এমনও অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যাদের কোমরে ঝোলানো হাড়ে এখনও লেগে রয়েছে মাংস, আগন্তুককে তাদের দিকে একবার তাকাতেই

BanglaBook.org

হবে ঘাড় ফিরিয়ে।

প্রতি সপ্তাহে এখানে অনেক লোক আসে ভারমন্ট আর নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে। বেশির ভাগই যুবক কাঠুরে, কুঠার ফেলে দিয়ে হাতে তুলে নিতে চায় তিমি শিকারের বর্শা। ওই যে দেখুন একজন! মাথায় বীভার হ্যাট আর পরনে টেইল কোট। এই যে এইমাত্র আরেকজন এসে উপস্থিত হলো সু'ওয়েস্টার আর বোম্বাজাইন ক্লোক পরে।

কিন্তু এটা ভাববেন না যে নিউ বেডফোর্ডে শুধু হারপুনার, নরখাদক আর গেঁয়ো লোকই রয়েছে। কানানের মত অতটা না হলেও যথেষ্ট তেল রয়েছে এখানে। খেতে ফলে চমৎকার শস্য, পাওয়া যায় স্বাদু ওয়াইন। দুধ আর ডিম খুব একটা মেলে না সত্যি, কিন্তু সারা আমেরিকায় আর কোথায় রয়েছে এখানকার মত অভিজাত বাড়ি, সমৃদ্ধ সব পার্ক আর বাগান?

যে-ফুলে এই বাগানগুলো ভরা, সেসব এসেছে প্রশান্ত, আটলান্টিক আর ভারত মহাসাগর থেকে।

আলোকসজ্জা কাকে বলে দেখতে চাইলে আপনাকে যেতে হবে নিউ বেডফোর্ডের কোন বিয়েতে। শোনা যায়, প্রত্যেকটা বাড়িতে নাকি রয়েছে তেলের একটা করে বিশাল মজুত। এখানকার লোক যথেচ্ছ জ্বালায় স্পার্ম তিমির চর্বির মোমবাতি, কারণ, হিসেবের প্রয়োজন তাদের নেই।

গরমে এই শহর ভরে ওঠে চমৎকার মেপলে, অগাস্টের বাতাসে নাচে হর্স-চেসনাট আর ক্যাণ্ডেলাব্রা-ওয়াইজ।

আর নিউ বেডফোর্ডের মেয়েরা ফোটে নিজেদেরই লাল গোলাপের মত। কিন্তু গোলাপ তো ফোটে শুধুই গরমে, তাদের গণ্ডদেশ সারা বছরই ফুটে থাকে সপ্ত আসমানের সূর্যালোক হয়ে। এই রঙ কেবল সালেম ছাড়া অন্য কোথাও আপনি পাবেন না। নিউ বেডফোর্ডের তরুণীদের নিশ্বাসে নাকি ভাসে কস্তুরীর গন্ধ, প্রেমিক নাবিকের দল দূর থেকেই বুঝতে পারে চোখের সামনে আর কতক্ষণ পর ভেসে উঠবে তটরেখা।

৭

নিউ বেডফোর্ডে রয়েছে হোয়েলম্যানদের একটা চ্যাপেল। ভারত বা প্রশান্ত মহাসাগরগামী মৎস্য শিকারীরা রোববারে সেখানে যেতে খুব কমই ভুল করে।

সকালের পায়চারি সেরে ফিরে আবার বেরিয়ে পড়লাম সেই চ্যাপেলের উদ্দেশে। ইতিমধ্যে পরিষ্কার, রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ ভরে গেছে কুয়াশায়, শনশন করে বইছে হিমেল বাতাস। চ্যাপেলের ভেতরে ঢুকতে দেখলাম, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে রয়েছে নাবিক আর নাবিকদের বৌ, বিধবারা। গোপনে শোক পালন করাই সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হয়ে বসার কারণ। চ্যাপলেন এখনও আসেননি। পুলপিটের দু'পাশেই কালো বর্ডার দেয়া মার্বেল পাথরের বেশ কয়েকটা ফলক। তার মধ্যে তিনটের ভাষা নিম্নরূপ:

BanglaBook.org

*

ক্যাপটেন ইজেকিয়েল হার্ডির পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে–
জাপান উপকূলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এক স্পার্ম তিমির আক্রমণে।
তারিখ: অগাস্ট ৩, ১৮৩৩।
স্মৃতিফলক নির্মাণে: তাঁর বিধবা।

জন ট্যালবটের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে–
১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মাত্র আঠারো বছর বয়সে পাটাগোনিয়ার আইল অভ ডেজোলেশন-এর নিকটে জাহাজ থেকে পানিতে পড়ে তিনি নিহত হয়েছিলেন। নিহতের স্মৃতিতে ফলক নির্মাণ করেছেন তাঁর বোন।

রবার্ট লং, উইলিস এলারি, নাথান কোলম্যান, ওয়াল্টার ক্যানি, সেথ মেসি এবং স্যামুয়েল গ্লেইগ-এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে–
প্রশান্ত মহাসাগরের এক অভিযানে এঁরা ছিলেন 'এলিজা' জাহাজের নাবিক। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর এক তিমি তাঁদের নৌকো টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিল দৃষ্টিসীমার বাইরে। নিখোঁজদের স্মৃতিতে এই ফলক নির্মাণ করেছেন তাঁদের জাহাজের জীবিত সঙ্গীগণ।

দরজার কাছে বসে মাথা ঘোরাতে পাশেই কুইকেগকে দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। পরিবেশের ভাবগাম্ভীর্যে কৌতূহল নিয়ে চুপ করে তাকিয়ে রয়েছে ও। যাঁদের স্মৃতিতে তৈরি হয়েছে এখানকার ফলকগুলো, জানি না তাঁদের কোন আত্মীয়-স্বজন আজ উপস্থিত আছে কিনা। খোঁজ নেই এমন অনেক দুর্ঘটনাই ঘটে চলেছে মহাসাগরে। একটা ব্যাপার অনুভব করলাম। যাদের হৃদয়ের ক্ষত এখনও শুকায়নি, ফলকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাদের হৃদয় হবে নতুন করে রক্তাক্ত।

ওখানে লেখা রয়েছে আমার, অর্থাৎ মহাসাগরে গমনকারী হোয়েলম্যানদের নিয়তি। হ্যাঁ, ইসমাইল, ওই একই নিয়তি তোমারও হতে পারে। তবু মনটা আমার প্রফুল্ল হয়ে উঠল। হ্যাঁ, তিমি শিকার অভিযানে রয়েছে পদে পদে মৃত্যু– চোখের পলকে জলজ্যান্ত একজন মানুষ চলে যেতে পারে অনন্তলোকে। কিন্তু তারপর? আমার মনে হয়, জীবন আর মৃত্যুর ধারণাতেই বিরাট ফাঁক রয়েছে আমাদের। পৃথিবীতে মানুষ যেটাকে আমার 'ছায়া' বলে, সেটাই আসল আমি। আমার শরীর আসলে আমারই বাইরের একটা ঢাকনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৮

আমি বসার পরপরই ভেতরে ঢুকলেন মোটাসোটা এক দীর্ঘদেহী লোক। এক নজরেই বুঝতে পারলাম, ইনিই চ্যাপলেন। ফাদার মেপল হোয়েলম্যানদের খুবই প্রিয়। যৌবনে ফাদার ছিলেন হারপুনার। লক্ষ করলাম, তাঁর সঙ্গে ছাতা নেই,

অর্থাৎ, তিনি ক্যারিজে চড়ে আসেননি। তেরপলের হ্যাটের ওপর গলে যাচ্ছে বরফ, পানির ভারে পাইলট ক্লথ জ্যাকেটটা মেঝেতে প্রায় নুইয়ে ফেলতে চাইছে তাঁকে। যাই হোক, একে একে হ্যাট, জ্যাকেট, জুতো খুলে এক কোণায় রেখে, চমৎকার একটা সুট পরে পুলপিটে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

পুরানো আর সব পুলপিটের মত এটাও বেশ উঁচু। সিঁড়ি থাকলে ছোট এই চ্যাপেলটা আরও ছোট হয়ে যাবে বলে সম্ভবত চ্যাপলেনের কথামতই খাড়াভাবে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে দড়ির একটা মই। তবে মইটাই এই চ্যাপেলের একমাত্র অদ্ভুত দৃশ্য নয়। পুলপিটের দু'পাশে যে মার্বেল পাথরের সেনোটাফ, তার পেছনের দেয়ালে ঝুলছে বিশাল এক পেইন্টিং। শিল্পী এঁকেছেন এক জাহাজের ছবি। কালো পাথরের এক উপকূলে আছড়ে পড়ছে বরফ-সাদা ঢেউ, সেই উপকূলের সামনে তীব্র ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়ছে জাহাজটা। কালো মেঘের অনেক ওপরে ভাসছে রৌদ্রালোকিত এক ছোট্ট দ্বীপ, আর তারই আড়ালে উঁকি দিয়ে হাসছে স্বর্গীয় এক দূত। যেন বলছে, 'লড়াই করো, জাহাজ, লড়াই চালিয়ে যাও আর কিছুক্ষণ। ওই দেখো, সূর্য বেরিয়ে এসেছে! পেছনে সরে যাচ্ছে কালো মেঘ, শান্ত নীলাকাশ খুব বেশি দূরে নেই।'

৯

ধীর অথচ কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপাসনাকারীদেরকে একত্রিত হয়ে বসতে বললেন ফাদার মেপল।

বেঞ্চের সারিগুলোর মাঝে উঠল ভারী সী বুটের শব্দ আর ফাঁকে ফাঁকে মহিলাদের জুতোর মৃদু খসখস, তারপর আবার নেমে এল নীরবতা। সবার দৃষ্টি ফাদার মেপলের ওপর গভীরভাবে নিবদ্ধ।

সামান্য থেমে হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি, বাদামী হাত দুটো বুকের ওপর রেখে দারুণ ভক্তিভরে একটা প্রার্থনা করলেন।

প্রার্থনার পর সুর করে একটা স্তোত্র আওড়াতে লাগলেন ফাদার, প্রায় সবাই যোগ দিল তাঁর সঙ্গে। স্তোত্রের পর স্বল্প বিরতি। বাইবেলের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নির্দিষ্ট একটা পাতায় এসে ফাদার বললেন, 'জোনার প্রথম অধ্যায়ের শেষ পংক্তিটা মনে করার চেষ্টা করুন সবাই– ঈশ্বর প্রকাণ্ড এক মাছকে প্রস্তুত করলেন জোনাকে গিলে ফেলার জন্যে।'

মুহূর্তের বিরতি। 'এই ঘটনার মাত্র চারটে অধ্যায় আর সেখানে উপদেশ রয়েছে দু'রকম। একটা আমাদের পাপী মানুষদের প্রতি, আরেকটা ঈশ্বরের প্রচারক হিসেবে আমার প্রতি। নবী হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরকে না মেনে অপরাধ করেছিলেন জোনা, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় অপরাধ করেছিলেন ঈশ্বরের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করে।'

এরপর তিমি মাছ কিভাবে জোনাকে খেয়ে ফেলেছিল এবং শেষমেশ তিনি উদ্ধার পেয়েছিলেন, তার একটা বিশদ বর্ণনা দিয়ে তিনি বললেন, 'কিন্তু

BanglaBook.org

আপনাদের চেয়ে অনেক বড় পাপী আমি। তাই বাইবেলের এই ঘটনা আপনাদের চেয়ে আমাকে শিক্ষা দেয় অনেক বেশি। ঈশ্বরের যে-ভার আপনাদের ওপর, তার চেয়ে অনেক বেশি ভার তিনি দিয়েছেন আমাকে। খুব ভাল হত যদি আপনাদের কেউ এই পুলপিটে এসে ঘটনাটা শোনাতেন, আর বেঞ্চে বসে শুনতে পারতাম আমি। ওহ্, এই ভার বহন করা সত্যিই বড় কঠিন। তবে কিনা,' অদ্ভুত এক আভা ফুটে উঠল তাঁর মুখে– 'পাপের পেছনেই থাকে পুণ্য, ঠিক যেমন আলো থাকে গাঢ় অন্ধকারের আড়ালে।'

আশীর্বাদের ভঙ্গীতে কয়েক মুহূর্ত দুলিয়ে, দু'হাতে মুখ ঢাকলেন ফাদার মেপল। তাঁকে ওই অবস্থায় একাকী রেখে, ধীরে ধীরে সবাই বেরিয়ে গেল গির্জা থেকে।

১০

চ্যাপেল থেকে স্পাউটার-ইন-এ ফিরতে একাকী পেলাম কুইকেগকে, খুব সম্ভব চলে এসেছে ফাদারের আশীর্বাদ শুরু হবার খানিক আগে। আগুনের সামনে একটা বেঞ্চে বসে আছে ও। ওর কড়া নজর নিবদ্ধ এক হাতে ধরা কাঠের নিগ্রো দেবতার ওপর, আরেক হাতে ধরা ছুরি দিয়ে খোঁচা মারছে মূর্তির নাকে, সেইসঙ্গে কণ্ঠে গুনগুনানি সুর।

আমাকে দেখে মূর্তিটা তুলে রাখল কুইকেগ, তারপর টেবিলের ওপর থেকে মোটা একটা বই এনে গুনতে লাগল সেটার পৃষ্ঠা। যত দূর মনে হচ্ছে, গোটা পঞ্চাশেক পৃষ্ঠা গোনার পর একবার করে থামছে ও, গলা থেকে বেরিয়ে আসছে বিস্মিত শিস, তারপর গুনছে পরবর্তী পঞ্চাশ পৃষ্ঠা। হয়তো একবারে পঞ্চাশের বেশি সংখ্যা গুনতে শেখেনি, তাজ্জব হয়ে যাচ্ছে একটামাত্র বইয়ে এতগুলো পৃষ্ঠা রয়েছে দেখে।

দারুণ আগ্রহ নিয়ে আমি লক্ষ করতে লাগলাম ওর কার্যকলাপ। বর্বর হলেও কেমন যেন একটা আকর্ষণ রয়েছে ওর মধ্যে। বাহ্যিক রূপ যেমনই হোক না কেন, মানুষ তার আত্মা লুকিয়ে রাখতে পারে না। ওর ওই উল্কি এবং অন্যান্য অদ্ভুত আচরণের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে সরল, সৎ একটা মন। আরেকটা ব্যাপার হয়তো হাস্যকর মনে হবে, কিন্তু ওর মাথা দেখলেই আমার মনে পড়ে যাচ্ছে জেনারেল ওয়াশিংটনের কথা– অন্তত আবক্ষ মূর্তিতে ওয়াশিংটনের যেরকম মাথা দেখা যায়, তার সঙ্গে ওর মাথার যথেষ্ট মিল রয়েছে। কুইকেগ যেন নরখাদকরূপে বেড়ে ওঠা জর্জ ওয়াশিংটন।

আমি গভীরভাবে লক্ষ করলেও কুইকেগ কিন্তু একবার তাকানো ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি, ও ব্যস্ত রয়েছে মোটা সেই বই নিয়ে। ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত। তবে এটাও ঠিক যে বর্বরেরা খানিকটা অদ্ভুতই হয়। স্বাভাবিক থাকতে থাকতে হঠাৎ ওরা কি করে বসবে, বলা খুব সহজ নয়। তবে কুইকেগের ব্যাপারে একটা কথা ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। প্রায় বিশ হাজার মাইল

BanglaBook.org

দূরের এক দেশ থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে সে এমন এক দল লোকের মাঝখানে, ওর দৃষ্টিতে যে-পরিবেশ হয়তো বৃহস্পতি গ্রহের মত।

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। নিঃশব্দ আলোড়ন উঠল আমার ভেতরে। টানছে, ওই বর্বর আমাকে টানছে অপ্রতিরোধ্য এক আকর্ষণে। মুখোশে আড়াল করা কোন ভণ্ডামি নেই ওর মধ্যে। হ্যাঁ, ওই বিধর্মীর সঙ্গে বন্ধুত্বের একটা চেষ্টা করব। খ্রিস্টানদের দয়া যে ফাঁকা সৌজন্যমাত্র, তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেছে। বেঞ্চ টেনে ধীরে ধীরে গিয়ে বসলাম ওর পাশে, নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতে লাগলাম বন্ধুত্ব প্রকাশের জন্যে। গত রাতে ওর সদয় ব্যবহারের কথা মনে করিয়ে দিতে কুইকেগ জানতে চাইল, আজরাতে ওর সঙ্গে থাকব কি না। থাকব শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখজোড়া, যেন হঠাৎ করে পেয়ে গেছে অপ্রত্যাশিত কোন উপহার।

এরপর মোটা বইটা আমরা ওল্টাতে লাগলাম একসঙ্গে। ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম মুদ্রণের উদ্দেশ্য, বুঝিয়ে দিলাম ছবিগুলোর অর্থ। দেখতে দেখতে কৌতূহলী হয়ে উঠল কুইকেগ। গল্প শুরু হয়ে গেল আমাদের বিখ্যাত এই শহরকে ঘিরে। ধূমপানের প্রস্তাব দিলাম আমি। পাইপ আর তামাক বের করে ওখান থেকেই আমাকে ধূমপানের অনুরোধ করল ও। সুতরাং একই পাইপ হস্তান্তরের মাধ্যমে শুরু হলো আমাদের যৌথ ধূমপান।

আমার সম্বন্ধে সন্দেহের শেষ যে-বরফটুকু ছিল ওই বর্বরের মনে, তাও যেন গলে গেল এই ধূমপানের মাধ্যমে। ধূমপানের পালা শেষে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল ও, কপালে কপাল ঠেকিয়ে বলল, এই মুহূর্ত থেকে বিয়ে হয়ে গেল আমাদের– ওর দেশীয় ভাষায় যে-কথার অর্থ, এখন থেকে আমরা দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু; প্রয়োজনে আমার জন্যে জীবন দেবে ও। গ্রামের দিকে অবশ্য লোকে প্রায়ই বলে এমন জীবন দেয়ার কথা, যার মধ্যে বিশ্বাস্য কিছুই নেই। কিন্তু ওই বর্বর এখনও জানে না যে কথা আবার বানিয়ে বলা যায়।

রাতের খাবার সেরে, আরও কিছুক্ষণ গল্প করে ঘরে গেলাম আমরা। এম্বামিং করা মাথাটা আমাকে উপহার দিল কুইকেগ। তারপর টোবাকো ওয়ালেট খুলে, তামাকের নিচ থেকে হাতড়ে বের করল তিরিশটা রূপোর ডলার। টেবিলের ওপর ডলারগুলো ছড়িয়ে সমান দু'ভাগে ভাগ করল ও, এক ভাগ আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল যে ওগুলো আমার। আপত্তি করতে গেলাম আমি, কিন্তু বাধা দিয়ে ডলারগুলো ও রেখে দিল আমার পকেটে। তারপর সান্ধ্য পুজো সারার জন্যে কাঠের নিগ্রো দেবতাকে বের করে বসিয়ে দিল ফায়ারপ্লেসের মাথায়। কিছুক্ষণ পর ভাবভঙ্গীতে বুঝতে পারলাম, ওর সঙ্গে যোগ না দেয়ায় অস্বস্তিবোধ করছে কুইকেগ। আমিও পড়ে গেলাম দারুণ অস্বস্তিতে– ওর ইচ্ছেটাকে সম্মান দেয়া উচিত হবে কিনা বুঝতে পারলাম না।

আমি একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান, শৈশব থেকেই বেড়ে উঠেছি গির্জার শিক্ষায়। তাহলে কীভাবে আমি এক বর্বর পূজারীর সঙ্গে তার কাঠের মূর্তি পূজায় সামিল হতে পারি? কিন্তু পূজা জিনিসটা আসলে কী? ভাবলাম আমি। তোমার কি মনে হয়, ইসমাইল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা প্রভু গুরুত্বহীন এক কালো কাঠের

টুকরোর প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে পারেন? অসম্ভব! তাহলে পূজা জিনিসটা কী?– ঈশ্বরের ইচ্ছেনুসারে কাজ করাটাই পূজা। ঈশ্বরের ইচ্ছে কি– সঙ্গীর প্রতি সেই কর্তব্য করা, যা প্রয়োজনে সেও করবে আমার প্রতি। কুইকেগের কাছ থেকে কি আশা করি আমি? আশা করি ও আমার সঙ্গে পূজা অর্থাৎ উপাসনা করবে খ্রিস্টান ধর্মের নিয়মানুসারে। তাহলে, বলাই বাহুল্য, ওই একইরকম আশা ও-ও করতে পারে আমার কাছে। সুতরাং আগুন জ্বালিয়ে দিলাম কাঠের চিলতেয়, তারপর কুইকেগের সঙ্গে ওর দেবতাকে দিলাম পোড়া বিস্কুটের নৈবেদ্য। পূজা শেষে গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়, কিন্তু আরও খানিকক্ষণ গল্প করার আগে ঘুম এল না।

১১

ঘুম সহজে আসতে চাইল না। মাঝরাতে উঠে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ থাকার পর বসলাম আমরা। চোখ খুলব কি খুলব না করতে করতে খুলেই ফেললাম শেষ পর্যন্ত। ঘরের ভেতরে গাঢ় অন্ধকার, জানালার বাইরে ঝাপসা আলোর ক্ষীণ আভাস। জেগে যখন আছিই আলো জ্বালতে আপত্তি ছিল না আমার। কিন্তু তার আগে প্রায় একই সঙ্গে ধূমপানের ইচ্ছে জাগল দু'জনেরই। গত রাতে বিছানায় বসে ওর ধূমপানের ব্যাপারে কতই না আপত্তি করেছিলাম, অথচ আজ সেটাকেই মনে হচ্ছে চমৎকার একটা ঘরোয়া আনন্দ। প্রীতির স্পর্শে কত সহজেই না উবে যায় মানুষের সংস্কার। মনের গভীরে এখন টোকা দিচ্ছে একটাই কথা– প্রকৃত কোন বন্ধুর সঙ্গে পাইপ এবং কম্বল ভাগাভাগির চেয়ে আরামের বুঝি আর কিছু নেই। পাইপের ধোঁয়ায় দেখতে দেখতে নীলচে একটা চাঁদোয়া তৈরি হলো আমাদের ওপরে।

তরঙ্গায়িত সেই চাঁদোয়ায় ভর করেই কুইকেগের মন সুদূরে ভেসে গেল কিনা জানি না, বলতে লাগল ওর দেশের কথা। আমিও কৌতূহলী হয়ে উঠলাম শোনার জন্যে। দ্রুত কথা বলায় প্রথমে অসুবিধে হলো ওর ভাঙা ভাঙা বাক্য বুঝতে, তবে খানিক পরেই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

১২

কুইকেগ দক্ষিণ-পশ্চিমের সুদূর এক দ্বীপ কোকোভোকোর অধিবাসী। কোন ম্যাপে অবশ্য কোকোভোকোর উল্লেখ নেই, খাঁটি জায়গাগুলোর কখনোই থাকে না।

শৈশবে বর্বরেরা যখন ঘেসো জমিতে ছুটে বেড়ায় ছাগল সঙ্গে নিয়ে, কুইকেগ তখনই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল খ্রিস্টীয় জগৎ দেখবে। ওর বাবা ছিল গোত্রপ্রধান, রাজা; চাচা প্রধান পুরোহিত; খালারাও সব অজেয় বীরের স্ত্রী। ওর শিরায় ছিল রাজকীয় রক্ত, কিন্তু সম্ভবত শৈশবের ইচ্ছের তাড়না সে-রক্তকে

কর্তৃত্বলোভী হয়ে উঠতে দেয়নি।

একদিন এক জাহাজ ভিড়ল ওর বাবার উপকূলে। খ্রিস্টানদের দেশে যাবার জন্যে জাহাজে উঠতে চাইল কুইকেগ, কিন্তু অনুমতি মিলল না জাহাজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। এল স্বয়ং রাজা, তবুও কোন লাভ হলো না। কুইকেগ ততক্ষণে বদ্ধপরিকর। দ্বীপের অদূরে রয়েছে এক প্রণালী, জাহাজকে তার ভেতর দিয়ে যেতেই হবে। প্রণালীর এক পাশে প্রবাল প্রাচীর, আরেক পাশের স্থলভূমি জঙ্গলে পরিণত হয়েছে গরান গাছে। পানির মাঝ পর্যন্ত নেমে যাওয়া সেই জঙ্গলে ক্যানু লুকিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল কুইকেগ। জাহাজ আসতেই এক লাথিতে ক্যানু ডুবিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও জাহাজের পাশে; শেকল বেয়ে ডেকে উঠে চেপে ধরল রিং-বোল্ট। বলল, কেটে টুকরো টুকরো করলেও নড়তে রাজি নয় ও।

পানিতে ফেলে দেয়ার ভয় দেখাল ক্যাপটেন, খোলা কবজির ওপর খঞ্জর উঁচিয়ে রইল; কিন্তু কুইকেগ রাজার ছেলে, ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, চোখের পাতাও কাঁপাল না। সত্যিকারের এই জেদ দেখে শেষ পর্যন্ত নরম হলো ক্যাপটেন। বলল, নিজের বাড়ির মতই জাহাজটার যেখানে খুশি ঘুরতে পারে ও। কিন্তু ক্যাপটেনের কেবিন দেখার সৌভাগ্য ওর কখনোই হলো না, সবাই মিলে ওকে লাগিয়ে দিল নাবিকের কাজে। ধীরে ধীরে একজন হোয়েলম্যানে পরিণত হলো কুইকেগ, হারপুন ছোঁড়া শিখল। এসব নিয়ে ওর মনে কোন অপমানবোধ নেই। লালন করছে ও গোপন একটা ইচ্ছে, সেটা পূরণ হলেই হলো। ওর দেশবাসী এমনিতেই সুখী, তবু খ্রিস্টানদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাদের আরও সুখী করতে চায় ও। কিন্তু হোয়েলম্যানদের সঙ্গে মিশতে মিশতে ধাক্কা খেল কুইকেগ। দেখল, খ্রিস্টানেরাও হতে পারে দুর্দশাগ্রস্ত আর শয়তানের শিরোমণি। বন্দরে জাহাজ ভিড়ার পর নিউ বেডফোর্ড এসে পুরো হতাশ হয়ে পড়ল ও। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, খ্রিস্টান হওয়ার আর প্রয়োজন নেই, মরবে ও একজন বিধর্মী হিসেবেই।

এভাবেই একজন মূর্তি পূজারী এখনও বাস করছে খ্রিস্টানদের মাঝে, পরছে তাদের পোশাক, বলার চেষ্টা করছে তাদেরই অর্থহীন ভাষা।

জানতে চাইলাম, আগামীতে কি করতে চায় ও। কুইকেগ বলল, সাগরে যাবে তিমি শিকার করতে। উৎফুল্ল হয়ে বললাম, এখান থেকে ন্যানটাকেটে যাব আমি, তিমি শিকারীদের রওনা দেয়ার জন্যে ওটাই সবচেয়ে ভাল বন্দর। আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে কুইকেগ জানাল, আমার সঙ্গে ও-ও যাবে ন্যানটাকেটে, উঠবে একই জাহাজে, পাহারা দেবে একই প্রহরে, খাবে পাশাপাশি বসে– অর্থাৎ, ও পেতে চায় আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গ। খুশিমনেই রাজি হলাম আমি। কুইকেগ একজন অভিজ্ঞ হারপুনার, আমার মত নতুন লোককে ওর অভিজ্ঞতা অনেক সাহায্য করবে।

পাইপে শেষ টান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো ওর গল্প। কয়েক মুহূর্ত পর দু'জনেই তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে।

BanglaBook.org

পর দিন সকালে, সোমবার, এম্বামিং করা মাথাটা এক নাপিতকে গছিয়ে বিল মিটিয়ে দিলাম আমাদের দু'জনের। কুইকেগের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে দেখে মালিকসহ মজা পেল সরাইখানার সবাই।

ন্যানটাকেটগামী স্কুনার 'দ্য মস' এসে গেছে। একটা ঠেলাগাড়ি ভাড়া করে তাতে জিনিসপত্র চাপিয়ে রওনা দিলাম আমরা। ঘাড় ঘুরিয়ে পথচারীরা বার বার দেখল আমাদের। তাদের দেখার বস্তু অবশ্য কুইকেগ নয়, নরখাদক নিউ বেডফোর্ডে অনেক দেখা যায়– কোন শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে যে নরখাদকের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, এটা তাদের ধারণার বাইরে।

অবশেষে টিকেট কেটে মালপত্রসহ নিরাপদে উঠে পড়লাম স্কুনারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাল উঠল, জাহাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল আকুসনেট নদী দিয়ে। বন্দরে সারি দিয়ে রয়েছে তিমি শিকারের জাহাজ, এখানে কষ্টকর একটা অভিযান শেষ মানে আরেকটার শুরু।

খোলা পানিতে এসে গতি বাড়াল স্কুনার। দু'চোখ ভরে চারপাশের চমৎকার দৃশ্য দেখছি আমরা, হঠাৎ ঘটল এক কাণ্ড। গেঁয়ো এক লোক পেছন থেকে টিটকিরি দিতেই হারপুনটা রেখে খপ্ করে তাকে ধরে ফেলল কুইকেগ। এক ঝাঁকুনিতে তার পুরো শরীর উঠে গেল শূন্যে, পরমুহূর্তে চার হাত পায়ে ডেকে আছড়ে পড়ল বেচারা। যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে পেছন ফিরে পাইপ ধরাল কুইকেগ। কয়েকটা টান দিয়ে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

'ক্যাপটিং! ক্যাপটিং!' এক দৌড়ে অফিসারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা; 'ক্যাপটিং, ওটা একটা শয়তান।'

'হ্যালো, স্যার,' কুইকেগের দিকে এগিয়ে এসে চেঁচাল ক্যাপটেন, 'জানেন, লোকটাকে আপনি প্রায় মেরে ফেলতে যাচ্ছিলেন?'

'ও কি বলছে?' আমার দিকে ফিরল কুইকেগ।

'বলছে, ওই লোকটাকে তুমি খতমের জোগাড় করেছিলে।'

'খতম?' বিরক্তিতে বেঁকে গেল ওর মুখ, 'কুইকেগ পুঁচকে মাছ মারে না, মারলে তিমি মারে– তিমি!'

'শুনুন,' গর্জে উঠল ক্যাপটেন, 'আবার এই ধরনের আচরণ দেখলে আপনাকে আমি খুন করব!'

ক্যাপটেনের কথা শেষ হতে না হতেই প্রধান পালের প্রচণ্ড টানে দু'ভাগ হয়ে গেল ওয়েদার-শীট, জাহাজ কাৎ হয়ে হুড়হুড় করে পানি উঠতে লাগল ডেকের পেছনদিকে। ছিটকে নদীতে গিয়ে পড়ল গেঁয়ো লোকটা, ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল যাত্রীদের মধ্যে। একটুও বিচলিত না হয়ে নিষ্কম্প হাতে শীটটা নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলল কুইকেগ, বন্ধ হলো জাহাজের লাফালাফি। এবারে কোমর থেকে উর্ধাংশের পোশাক খুলে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল খরস্রোতা নদীতে। কেটে গেল দারুণ উত্তেজনার কয়েকটা মিনিট। কুইকেগ ভেসে উঠলে দেখা গেল তার এক হাতে জাপটে ধরা একটা অচেতন শরীর। বোট নামিয়ে উদ্ধার করা হলো দু'জনকেই।

BanglaBook.org

খানিক পরেই জ্ঞান ফিরল গেঁয়ো লোকটার। ক্যাপটেন নিজে এসে ক্ষমা চাইল কুইকেগের কাছে। ওই মুহূর্ত থেকে জড়িয়ে গেলাম ওর সঙ্গে।

জীবন বাজি রাখা এই বীরত্ব সমাজের মহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টিতে মেডেল পাবার দাবিদার কিনা, সে-সম্বন্ধে কুইকেগ সম্পূর্ণ অসচেতন। শরীর থেকে লবণ ধুয়ে ফেলার জন্যে ও কেবল চাইল পরিষ্কার পানি। ধোয়ামোছার পালা শেষ হতে শুকনো কাপড় পরল কুইকেগ, তারপর বুলওয়ার্কে হেলান দিয়ে পাইপ ধরাল ধীরেসুস্থে।

১৪

যাত্রাপথে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ঘটল না, নিরাপদে ন্যানটাকেট বন্দরে এসে ভিড়ল স্কুনার।

ন্যানটাকেট! ম্যাপ খুলে দেখুন, পৃথিবীর একেবারে কোণে জায়গাটা অবস্থিত। চারপাশে শুধু বালি আর বালি।

অঞ্চলটা নাকি আবিষ্কার করেছে রেড ইণ্ডিয়ানরা। কিংবদন্তি আছে, প্রাচীন কালে উপকূলভাগে ছোঁ মেরে ইণ্ডিয়ান একটি শিশুকে ধরে উড়ে গিয়েছিল এক ঈগল। কাঁদতে কাঁদতে বাবা-মা দেখল, ঈগলের নখরে ঝুলতে ঝুলতে বিশাল জলরাশির ওপর দিয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় বাচ্চা চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। ক্যানুতে করে তারা বেরিয়ে পড়ল সেদিক লক্ষ্য করে। বিপজ্জনক এক অভিযান শেষে এখানে এসে খুঁজে পেল শিশুটির কঙ্কাল।

সৈকতে জন্মগ্রহণ করলে সাগরের প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে, এ আর আশ্চর্য কি! প্রথমে সৈকতে কাঁকড়া ধরল ন্যানটাকেটরা, সাহস একটু বাড়তে জাল দিয়ে ধরতে লাগল ম্যাকেরেল, তারপর নৌকো নিয়ে এগোল কড মাছ ধরার জন্যে, সবশেষে জাহাজের বহর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পৃথিবীর জলভাগ আবিষ্কারের নেশায়।

বাইবেলের ভাষায়– ন্যানটাকেটাররা জাহাজে করে একাই গিয়েছিল সাগরে। হ্যাঁ, সাগরই হয়ে উঠেছিল তাদের ঘরবাড়ি, যা কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য তাও সাগরেই। সাগরই হয়ে উঠল তাদের জীবিকা। লুকায় তারা ঢেউয়ের আড়ালে, প্রয়োজনে ঢেউয়ের মাথায় ওঠে, ঠিক যেমন শ্যামোআ শিকারীরা ওঠে আল্পসে। বহু বছর তারা মাটির সংস্পর্শে আসেনি। ফলে শেষমেশ যখন এল, সবকিছুই মনে হলো অদ্ভুত। তাই দিনের বেলা মাটির ওপরে থাকলেও রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ভাসাল তারা। স্থলভাগ দৃষ্টিসীমা থেকে মুছে যেতে থামল তাদের নৌকো। পাল গুটিয়ে শুয়ে পড়ল ন্যানটাকেটাররা, তাদের বাড়ির নিচ দিয়ে ছুটে গেল সিন্ধুঘোটক আর তিমির দল।

BanglaBook.org

আমরা যখন বন্দরে নামলাম, সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া আজ আর কিছু করার নেই। আসার সময় স্পাউটার-ইন-এর মালিক বলে দিয়েছে তার কাজিন হোসিয়া হাসির সরাইখানায় যেতে। ট্রাই পট্স্-এর চাউডার সুপ নাকি বিখ্যাত।

ঠিকানা মিলিয়ে খুঁজে বের করে ফেললাম ট্রাই পট্স্ ইন। গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজন কর্মচারীকে গালি দিচ্ছে হলুদ গাউন পরা হলুদ চুলের এক মহিলা। আহত চোখের মত লাল একটা বাতি দুলছে তার মাথার ওপর।

'এসো, কুইকেগ,' বললাম আমি, 'ইনি নিশ্চয় মিসেস হাসি।'

ধারণা আমার মিথ্যে নয়। রাতের খাবার আর থাকার জায়গা চাই শুনে আপাতত লোকটাকে রেহাই দিয়ে ছোট একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গেল মহিলা। টেবিলে বসিয়ে দিয়ে জানতে চাইল– 'ক্ল্যাম না কড?'

'কডটা আবার কিরকম, ম্যাডাম?' জানতে চাইলাম আমি।

'ক্ল্যাম না কড?' একই ভঙ্গীতে পুনরাবৃত্তি করল মহিলা।

'রাতের খাবার হিসেবে ক্ল্যাম? এই তীব্র ঠাণ্ডায় আপনি আমাদের ক্ল্যাম দিতে চান, মিসেস হাসি? ঠাণ্ডা যে আরও বেড়ে যাবে।'

ইতিমধ্যে মহিলা আবার গালি দিতে শুরু করেছে সেই কর্মচারীকে। হাবভাবে মনে হলো, আমার কথাগুলোর মধ্যে শুধু 'ক্ল্যাম' শব্দটাই তার কানে গেছে। রান্নাঘরের দরজার সামনে গিয়ে 'দু'জনের জন্যে ক্ল্যাম' বলে ভেতরে চলে গেল মিসেস হাসি।

'কুইকেগ,' বললাম আমি, 'এক ক্ল্যামে দু'জনের হবে তো?'

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা গন্ধে মনে হলো না যে খাবারটা খুব একটা সুবিধের হবে। কিন্তু ধোঁয়া ওঠা চাউডার সামনে এনে রাখতে ধারণাই বদলে গেল। হেজেল নাটের মত ছোট ছোট শামুক, শিপ বিস্কুটের গুঁড়ো আর লবণে জারিত শুয়োরের মাংসের সঙ্গে মেশানো হয়েছে পরিমাণমত মাখন, মরিচ আর লবণ। যাত্রার ফলে এমনিতেই খিদে লেগেছিল, তাই সুস্বাদু চাউডারের বাটি দেখতে দেখতে শূন্য হয়ে গেল। মাছজাতীয় খাবার পেয়ে বহু দিন পর তৃপ্তির সঙ্গে ঢেলো কুইকেগ। আমার মাথায় ততক্ষণে দোলা দিয়েছে মিসেস হাসির বলা দ্বিতীয় পদটা। হ্যাঁ, ওটাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রান্নাঘরের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জোরে বললাম, 'কড', তারপর ফিরে এসে বসে রইলাম চুপচাপ। কয়েক মিনিট পর ভেসে এল ভিন্ন ধরনের একটা গন্ধ। বেশি অপেক্ষা করতে হলো না, আমাদের সামনে সাজিয়ে দেয়া হলো ধূমায়িত কড-চাউডার।

ট্রাই পট্স্-এর মত মাছজাতীয় খাবার সম্ভবত আর কোথাও পাওয়া যায় না। এখানকার পাত্রে সবসময় গরম হচ্ছে চাউডার। সকালের নাস্তায় চাউডার, দুপুরে চাউডার, রাতেও তাই। সরাইখানার সামনের অংশটা বোঝাই হয়ে আছে শামুকের খোলায়। মিসেস হাসির গলায় ঝুলছে কডের ভার্টেব্রার একটা মালা, হোসিয়া হাসির অ্যাকাউন্ট খাতাটা বাঁধানো হাঙরের চামড়ায়। এখানকার

BanglaBook.org

দুধেও মাছ মাছ গন্ধ কেন বুঝতে পারছিলাম না। এক সকালে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখি, মাছ খাচ্ছে মি. হাসির গরু।

যাই হোক, খাবার শেষে একটা বাতি দিয়ে মিসেস হাসি বলে দিল, শোয়ার জন্যে আমাদের কোন্ দিকে যেতে হবে। কুইকেগ কেবল ওপরতলার দিকে পা বাড়িয়েছে, ওকে বাধা দিয়ে হারপুনটা চাইল মহিলা, কোনও বোর্ডারকে সে হারপুন নিয়ে ঘরে যেতে দেয় না।

'কেন?' বললাম আমি, 'সব জাত হোয়েলম্যানই সঙ্গে হারপুন রাখে। এতে অসুবিধেটা কোথায়?'

'অসুবিধে আছে,' বলল মহিলা। 'জিনিসটা বিপজ্জনক। বছর চারেক আগে এক নাবিক মারা গিয়েছিল নিজেরই হারপুনে বিদ্ধ হয়ে। তারপর থেকে আর কাউকে সঙ্গে হারপুন রাখতে দিই না। মি. কুইকেগ, আপনার অস্ত্রটা দিন, আগামীকাল সকালেই পেয়ে যাবেন। তা ভাল কথা, সকালে কি খাবেন আপনারা, ক্ল্যাম না কড?'

'দুটোই,' জবাব দিলাম আমি, 'আর স্বাদ বদলের জন্যে গোটা দুই সেঁকা হেরিংও দেবেন।'

১৬

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আগামীকালের পরিকল্পনা স্থির করতে লাগলাম আমরা। কুইকেগ বলল, সে ইয়োজো– মানে ওর নিগ্রো দেবতার সঙ্গে গত কয়েক দিন ধরে পরামর্শ করেছে। ইয়োজো বলেছে, কোন্ জাহাজে যাত্রা করব, সেটা বাছার ভার পুরোপুরি আমার ওপর ছেড়ে দিতে হবে, কুইকেগ সঙ্গে যেতে পারবে না।

হাজার কথা বোঝালেও দেবতাকে অমান্য করবে না কুইকেগ। তাই পর দিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। আজ আবার ও রোজা অর্থাৎ উপোস করছে। সারা দিন বসে থাকবে ইয়োজোকে নিয়ে, প্রয়োজনে আরও পরামর্শ করবে। অনেক খুঁজে-পেতে তিন বছরের জন্যে অভিযানে যাবে, এমন তিনটে জাহাজ বের করলাম আমি। ডেভিল-ড্যাম, টিট-বিট আর পেকোড। ভাল করে দেখে শুনে মনে হলো, পেকোডই হবে আমাদের উপযুক্ত জাহাজ। বুড়ো ক্যাপটেন পেলেগ অনেক দিন পর্যন্ত এটার চীফ মেট ছিল, এখন প্রধান মালিকদের একজন।

আমি যে এই জাহাজে যেতে চাই, তা বলার জন্যে মালিকদের কাউকে খুঁজতে লাগলাম কোয়ার্টার-ডেকে। প্রথমটায় কাউকে দেখতে পেলাম না, তারপর চোখে পড়ল মূল পালের পেছনদিকে রাইট হোয়েলের চোয়ালে নির্মিত অদ্ভুত চেহারার এক তাঁবু। ভেতরে উঁকি দিতে এক বুড়োকে দেখতে পেলাম। বুড়োর শরীর আর দশটা নাবিকের মতই পেশিবহুল, পরনে ভারী নীল পাইলট-ক্লথ, মুখের খুদে খুদে অসংখ্য কুঞ্চন কঠোর সব অভিযানের সাক্ষর বহন করছে।

'আপনি কি পেকোডের ক্যাপটেন?' তাঁবুর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

'ধরো আমিই যদি পেকোডের ক্যাপটেন হই, তার কাছে তোমার কি প্রয়োজন?' জানতে চাইল বুড়ো।

'আমি এই জাহাজে যাবার কথা ভাবছিলাম।'

'ভাবছিলে, অ্যাঁ, ভাবছিলে তাই না? তুমি তো ন্যানটাকেটার নও– এই ধরনের জাহাজে গেছ কখনও?'

'না, স্যার, কখনও যাইনি।'

'যতদূর মনে হচ্ছে, হোয়েলিং সম্বন্ধে কিছুই জানো না তুমি– অ্যাঁ?'

'কিছুই না, স্যার; কিন্তু আশা করি খুব শিগগিরই শিখে নিতে পারব। ব্যবসায়ীদের জাহাজে অনেক বার গেছি, আমার মনে হয়–'

'ব্যবসায়ী জাহাজের নিকুচি করি। ওই কথা আমার সামনে আর কখনও বলবে না। ব্যবসায়ী জাহাজ! ওসব জাহাজে গেছ বলে মনে মনে বুঝি খুব গর্ব অনুভব করো? যত্তোসব! তা এত দিন ব্যবসায়ী জাহাজেই গেছ যখন, এবার হোয়েলিং শিপে যেতে চাও কেন?– ব্যাপারটা সন্দেহজনক, তাই না?– একসময় তো জলদস্যু ছিলে, অ্যাঁ? লুটে নিয়েছ তোমার শেষ ক্যাপটেনের সর্বস্ব, ঠিক কিনা?– এবার বুঝি জাহাজ সাগরে গেলে সব অফিসারকে খুনের মতলব করেছ?'

প্রতিবাদ করে বললাম যে এসব আমি কখনোই করিনি বা ভাবিনি। ক্যাপটেন পেলেগের বলার ভঙ্গীতে রসিকতার ছোঁয়া থাকলেও বুঝতে পারলাম, বিদেশী কাউকে বিশ্বাস করে না সে।

'কিন্তু হোয়েলিংয়ে যেতে চাও কেন? তোমাকে জাহাজে নিতে চাইলে এ-কথা তো আমার জানতেই হবে।'

'তাহলে শুনুন, স্যার। আমি দেখতে চাই হোয়েলিং জিনিসটা কেমন। পৃথিবীটাও ভাল করে দেখতে চাই আমি।'

'হোয়েলিং দেখতে চাও, অ্যাঁ? ক্যাপটেন আহাবকে দেখেছ কখনও?'

'ক্যাপটেন আহাব কে, স্যার?'

'হুঁ, যা ভেবেছিলাম। ক্যাপটেন আহাবই এই জাহাজের ক্যাপটেন।'

'তাহলে তো ভুল করে ফেলেছি। এতক্ষণ ধরে ভাবছি, আমি বুঝি ক্যাপটেনের সঙ্গেই কথা বলছি।'

'এতক্ষণ ধরে তুমি কথা বলেছ ক্যাপটেন পেলেগের সঙ্গে। এই জাহাজটা আমার, আর নাবিক জোগাড় থেকে শুরু করে এটাকে অভিযানের উপযুক্ত করে রাখার দায়িত্ব ক্যাপটেন বিলদাদের। আমরা দু'জনেই পেকোডের প্রধান অংশীদার এবং এজেন্ট। যাক যা বলছিলাম। ক্যাপটেন আহাবকে অবশ্যই দেখবে, বেচারির একটা পা কেবল আছে।'

'কী বলতে চান, স্যার? আরেকটা পা কি তিমিতে নিয়ে গেছে?'

'তিমিতে নিয়ে গেছে! ইয়াং ম্যান, কাছে এসো। ওই পা শুধু নিয়ে যায়নি, চিবিয়ে গিলে ফেলেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্পার্ম তিমি। আহা রে!'

ক্যাপটেন আহাবের জন্যে ক্যাপটেন পেলেগের সহানুভূতি আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেল। বললাম, 'কিভাবে জানব, স্যার, নির্দিষ্ট কোন তিমির এত হিংস্রতা থাকতে পারে। তবু ছোট্ট এই দুর্ঘটনা হয়তো তিমির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সাহায্য

BanglaBook.org

করবে আমাকে।'

'মনটা তোমার খুবই নরম, ইয়াং ম্যান। সত্যিই কি তুমি সাগরে গিয়েছিলে কখনও? সত্যি করে বলো।'

'স্যার,' জবাব দিলাম আমি, 'আপনাকে তো বলেছি বোধ হয়, চার বার আমি সাগরে গেছি ব্যবসায়ী জাহাজের–'

'থামো! নিষেধ করেছি না ব্যবসায়ী জাহাজের কথা আমার সামনে বলতে? একটা বোঝাপড়া হওয়া উচিত তোমার সঙ্গে। হোয়েলিং কেমন জিনিস, সেটার একটা আভাস তো দিলাম, তারপরেও যেতে চাও?'

'চাই, স্যার।'

'খুব ভাল কথা। কিন্তু তুমি তো শুধু হোয়েলিংই দেখতে চাও না, পৃথিবীটাকেও দেখতে চাও। যাও, ওই ওয়েদার বোর ওপর দিয়ে একটা উঁকি দিয়ে এসে আমাকে বলো, কি দেখলে।'

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম হতভম্ব হয়ে। ক্যাপটেন পেলেগ কি সত্যিই এটা বলেছে নাকি রসিকতা করছে? কিন্তু না। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, ক্যাপটেনের মুখে রসিকতার কোন চিহ্ন নেই।

একটা উঁকি দিয়ে ফিরে এলাম আমি।

'কি দেখলে?' জিজ্ঞেস করল পেলেগ।

'এমন কিছু নয়,' জবাব দিলাম আমি– 'শুধু পানি আর পানি, দিগন্ত প্রায় দেখাই যায় না। তবে, একটা ঝড় আসছে মনে হয়।'

'তাহলে পৃথিবীর আর কি দেখার আশা করো তুমি? কেপ হর্নের ওপারে গিয়ে নতুন কিছু? পৃথিবী তো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে।'

বোকা বনে গেলাম। কিন্তু তিমি শিকার অভিযানে যেতেই হবে আমাকে, আর যেতে হলে পেকোডের চেয়ে ভাল জাহাজ সম্ভবত আর নেই। মনের কথা খুলে বললাম পেলেগকে। নাছোড়বান্দা ভাব দেখে শেষমেশ আমাকে জাহাজে নিতে রাজি হলো বুড়ো।

'তাহলে তো এখনই তোমাকে দিয়ে কিছু কাগজপাতি সই করিয়ে নিতে হয়। চলো,' আমাকে পথ দেখিয়ে একটা কেবিনে নিয়ে গেল সে।

দেখা হলো অদ্ভুত চেহারার ক্যাপটেন বিলদাদের সঙ্গে। বয়েস ষাটের কম নয়, বাড়তি এক বিন্দু চর্বি নেই শরীরের কোথাও। ক্যাপটেন পেলেগের মতই এখন নাবিকের জীবন থেকে অবসর নিয়েছে সে। বসে বসে হিসেবপাতি দেখে। একেবারে কেবিন বয় হিসেবে জীবন শুরু করে পর্যায়ক্রমে হারপুনার, বোট-হেডার, চীফ-মেট, ক্যাপটেন এবং শেষে জাহাজের মালিক হয়েছে ক্যাপটেন বিলদাদ। ধার্মিক, কিন্তু কঠিন-প্রাণ, একটা পয়সা বাজে খরচ হতে দেয় না। সে হয়তো চলে এই দর্শনে যে মানুষের ধর্মজীবন এক জিনিস, আর বাস্তব জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। জাহাজে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করার সময় সে ছিল একজন কঠোর টাস্ক-মাস্টার। নাবিকদের নাকি এতই খাটিয়ে নিত যে অভিযান শেষে তীরে নেমে প্রায় সবাইকেই যেতে হত হাসপাতালে।

নাকের ওপর চশমা লাগিয়ে প্রকাণ্ড একখানা বই পড়ছে ক্যাপটেন বিলদাদ।

BanglaBook.org

শরীর সম্পূর্ণ সোজা। উবু বা কুঁজো সে কখনোই হয় না। লোকে বলে, কোটের ঝুলে ধুলো লাগার ভয়ে।

'বিলদাদ,' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপটেন পেলেগ, 'আবার ওটা নিয়ে বসেছ, অ্যাঁ? বলি, গত ত্রিশ বছর ধরে তো ওই ধর্মশাস্ত্র পড়ছ, বুঝেছ কিছু?'

দীর্ঘ দিন ধরে এসব খোঁচা মারা কথা শুনে অভ্যস্ত, তাই জবাব দেয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করল না বিলদাদ, কিন্তু আমাকে দেখে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকাল সে পেলেগের দিকে।

'এ আমাদের জাহাজে যেতে চায়।'

'চাও বুঝি?' সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল বিলদাদ।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম আমি।

'ওকে কেমন বুঝছ, বিলদাদ?' জানতে চাইল পেলেগ।

'কাজ চলবে,' বলে মাথা নামিয়ে বিড়বিড় করে আবার বই পড়তে লাগল ক্যাপটেন বিলদাদ।

একটা আলমারি খুলে কাগজপাতি নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল পেলেগ। সঙ্গে সঙ্গে নানারকম চিন্তা ভিড় করে এল আমার মাথায়। ইতিমধ্যেই জেনেছি, হোয়েলিং জাহাজে কোন মজুরি দেয়া হয় না। তবে পরিশ্রম আর পদ অনুসারে ক্যাপটেন থেকে শুরু করে লাভের একটা অংশ পায় সবাই, এই পারিশ্রমিককে বলে– লে। যেহেতু আমি হোয়েলিংয়ে নতুন, খুব বেশি লে আমার হবে না। তবে সাগর যাত্রার অভিজ্ঞতা রয়েছে যখন, আমাকে তো দেয়া উচিত অন্তত ২৭৫ লে– অর্থাৎ, নেট লাভের ২৭৫ ভাগের এক ভাগ। সবাই জানে, ২৭৫ লে কোন অংশই প্রায় নয়, তবু নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। যতটুকুই পাই, আমার কাপড়চোপড়ের খরচা চলে যাবে মনে হয়। তাছাড়া তিন বছরের থাকা-খাওয়ার জন্যে একটা পয়সাও দিতে হবে না।

এই জাহাজের রয়েছে অনেক অংশীদার। প্রধান অংশীদার দু'জন– ক্যাপটেন পেলেগ আর ক্যাপটেন বিলদাদ। এছাড়াও রয়েছে অনেক বিধবা, পিতৃহীন সন্তান, এমনকি চ্যান্সারি ওয়র্ড। কেউ হয়তো পাবে বড়সড় একটা তক্তার দাম, আবার কেউবা গোটা কয়েক পেরেকের। তবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। আপনারা যেমন টাকা খাটান স্টক এক্সচেঞ্জে, ন্যানটাকেটাররা তেমনি জাহাজে। আবার মনে হলো ২৭৫ লের কথা, ভাগ্য ভাল থাকলে ২০০ লেও মিলে যেতে পারে।

বইয়ের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে করতেই ক্যাপটেন বিলদাদ বলল, 'বুঝেশুনে লে দিও, আমাদের রাজার ভাণ্ডার নেই। এই পৃথিবীতে–'

'বেশ,' বাধা দিল পেলেগ, 'তা, ক্যাপটেন বিলদাদ, এই ছেলেটাকে কত লে দিলে ঠিক হবে বলে মনে হয় তোমার?'

'সে তুমিই ভাল জানো,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিল বিলদাদ, '৭৭৭ লে খুব বেশি হবে না, কি বলো?'

'তুমি একটা যাচ্ছেতাই, বিলদাদ,' চেঁচিয়ে উঠল পেলেগ, 'ছেলেটাকে ডোবাতে চাও? এর চেয়ে নিশ্চয় অনেক বেশি পাবে সে।'

'৭৭৭,' চোখ না তুলেই বলল বিলদাদ।

'আমি ওকে ৩০০ দিতে চাই। শুনতে পেয়েছ? ৩০০ লে।'

'ক্যাপটেন পেলেগ, মন তোমার খুবই দয়ালু। কিন্তু এভাবে বেশি দেয়ার অর্থ কি অনেক বিধবা, এতিমের রুটি-রুজিতে হস্তক্ষেপ করা নয়? সুতরাং ৭৭৭।'

'৭৭৭-এর নিকুচি করি,' গর্জে উঠল ক্যাপটেন পেলেগ। 'এসব বিষয়ে তোমার কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু বিবেক বলেও একটা কথা আছে।'

'এত বিবেকবান হলে জাহাজ তো লাটে উঠবে।'

'ক্যাপটেন বিলদাদ!' তেড়ে গেল ক্যাপটেন পেলেগ। দ্রুত এক পাশে সরে তাকে এড়িয়ে গেল বিলদাদ।

শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। এও ভাবছিলাম, যে-জাহাজের অন্যতম প্রধান দু'জনের মতের এত অমিল, সেটাতে যাওয়া আদৌ উচিত হবে কিনা। ক্যাপটেন বিলদাদ পালিয়ে যেতে পারে মনে করে ইতিমধ্যে সরে দাঁড়িয়েছিলাম দরজার সামনে থেকে। কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বিলদাদ গিয়ে আবার বসল স্বস্থানে, পেলেগের এই রণমূর্তির সঙ্গে সে যেন খুব ভালভাবে পরিচিত। ওদিকে পেলেগের হাবভাবে মনে হলো, দারুণ হম্বিতম্বি করার ফলে তার রাগের মজুত নিঃশেষ হয়ে গেছে। বিলদাদের পাশে এসে বসল সে। সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'ঝড়টা সরে গেছে মনে হয়। বিলদাদ, তুমি তো বর্শা-টর্শা খুব ভাল ধার করো, আমার ছুরিটা একটু ধার করে দেবে? এই যে নাও, ধন্যবাদ। আর, ইসমাইল, তোমার নাম তো ইসমাইল তাই না? তুমি যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ, ৩০০ লে হিসেবে।'

'ক্যাপটেন পেলেগ,' বললাম আমি, 'আমার এক বন্ধুও যেতে চায় হোয়েলিংয়ে– আগামীকাল সকালে নিয়ে আসব ওকে?'

'নিশ্চয়। ওকে এক নজর দেখব আমরা।'

'সে আবার কত লে চায়?' গুঙিয়ে উঠল বিলদাদ।

'ওটা নিয়ে ভেব না, বিলদাদ,' বলে আমার দিকে ঘুরল পেলেগ। 'তোমার বন্ধু কখনও হোয়েলিংয়ে গেছে?'

'শুধু যায়নি, অনেক তিমিও মেরেছে, ক্যাপটেন পেলেগ।'

'বেশ, নিয়ে এসো ওকে।'

কাগজপাতি সই করে রওনা দিলাম আমি। এক সকালের হিসেবে যথেষ্ট কাজ করা হয়েছে। আমি আর কুইকেগ দু'জনেই পেকোডে যেতে পারব, আর কি চাই!

কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলাম না। যার নেতৃত্বে যাব, সেই ক্যাপটেনকেই যে এখনও দেখলাম না। অবশ্য এরকম প্রায়ই হয় যে ক্যাপটেন জাহাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে একেবারে শেষ মুহূর্তে। কারণ, হোয়েলিং এত লম্বা সময় ধরে হয়, বন্দরে থাকাকালীন জাহাজের দিকে আর নজরই দেয় না ক্যাপটেন, ব্যস্ত থাকে পরিবার বা নিজস্ব কোন জরুরী কাজ নিয়ে। যাই হোক, যার হাতে নিজেকে ছেড়ে দেব, তাকে দেখার ইচ্ছে হওয়াটা স্বাভাবিক। ফিরে গিয়ে ক্যাপটেন পেলেগের কাছে জানতে চাইলাম, ক্যাপটেন আহাবকে কোথায় পাওয়া যাবে।

'ক্যাপটেন আহাবের কাছে কি প্রয়োজন? তোমাকে তো নিয়েছি আমরা।'

BanglaBook.org

'তা ঠিক, কিন্তু তাকে একবার দেখার ইচ্ছে হচ্ছে।'

'এখন তাঁর দেখা পাবে বলে মনে হয় না। কি হয়েছে ঠিক জানি না আমি, কেবিন থেকে বেরোতেই চান না। এক ধরনের অসুখ বোধ হয়, কিন্তু অসুস্থও মনে হয় না। সত্যি বলতে কি, অসুস্থ তিনি নন, আবার সুস্থ বলাও সম্ভব নয়। এক অদ্ভুত মানুষ এই ক্যাপটেন আহাব– কেউ কেউ তাই ভাবে– তবে মানুষ তিনি ভাল। তোমার খুব পছন্দ হবে। না, না, ভয়ের কিছু নেই। তিনি এক অভিজাত, দেবতার মত মানুষ, অথচ ধার্মিক নন। বেশি কথা বলেন না, কিন্তু বললে তোমাকে শুনতে হবে। মনে রেখো, আহাব সাধারণের অনেক ওপরে। তিনি কলেজে পড়াশোনা করেছেন, গেছেন নরখাদকদের দেশে, মহাসাগরের ঢেউয়ের চেয়েও গভীর রহস্য দেখে তিনি অভ্যস্ত। তাঁর বর্শার নিশানা নির্ভুল। ক্যাপটেন বিলদাদ নন তিনি, ক্যাপটেন পেলেগও নন, তিনি হলেন আহাব। নিশ্চয় জানো, প্রাচীন কালে আহাব নামে এক রাজা ছিলেন!'

'খুব শয়তান ছিলেন সেই রাজা। মারা যাবার পর তো তাঁর রক্ত কুকুরে চেটে চেটে খেয়েছিল, তাই না?'

'এসো, কাছে এসো, আরও কাছে,' ক্যাপটেন পেলেগের স্বরে এমন কিছু একটা ছিল যে রীতিমত চমকে গেলাম আমি। 'পেকোডে ওই কথা কখনও উচ্চারণ করবে না। অন্য কোন জায়গাতেও না। ক্যাপটেন আহাব তো আর নিজে রাখেননি তাঁর নাম, রেখেছে তাঁর অশিক্ষিত বিধবা মা। আহাবকে মাত্র বারো মাসের শিশু রেখে মহিলা মারা যায়। লোকে রটিয়েছে, আহাব ভবিষ্যতে কেমন হবেন বুঝতে পেরেই নাকি ওই রাজার নামে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল। আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই। কথাটা মিথ্যে। ক্যাপটেন আহাবকে আমি অত্যন্ত ভালভাবে চিনি। অনেক দিন আগে আমি তাঁর সঙ্গে সাগরে গেছি মেট হিসেবে। আমি জানি, কখনোই তিনি খুব হাসিখুশি থাকেন না। বাড়ি ফেরার সময় কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যান, তবে সেটা তাঁর হারানো পায়ের যন্ত্রণায়। আসলে গত অভিযানে পা-টা হারানোর পর তিনি কেমন যেন মেজাজী হয়ে গেছেন, হিংস্রও হয়ে ওঠেন কখনও কখনও। তবে মনে রেখো, রসিক বাজে ক্যাপটেনের চেয়ে মেজাজী ভাল ক্যাপটেনের নেতৃত্বে সাগরে যাওয়া ঢের ভাল। তাছাড়া তাঁর রয়েছে মিষ্টি চেহারার একটি বৌ। শুধু তা-ই নয়, সেই মেয়ের গর্ভে একটা সন্তানও হয়েছে বুড়োর। তাহলেই বুঝে দেখো, এরকম বৌ বাচ্চাঅলা একজন মানুষের পক্ষে কি চূড়ান্ত হিংস্রতা সম্ভব? না, না, ক্যাপটেন আহাবের নিশ্চয় মনুষ্যত্ব আছে!'

ফিরতে লাগলাম চিন্তিত মন নিয়ে। অস্পষ্ট একটা দুঃখবোধ জাগল ক্যাপটেন আহাবের জন্যে। হয়তো তার হারানো পায়ের কথা ভেবে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। এই দুঃখবোধ কিংবা সহানুভূতির পাশাপাশি কেমন যেন একটা সম্ভ্রমও জাগল। সে এক অদ্ভুত সম্ভ্রম, অবর্ণনীয়, কেবল অনুভব করা যায়। তবে সে-সম্ভ্রম আমাকে ক্যাপটেন আহাবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিল না, বরং আরও টানতে লাগল রহস্যের জাল বিছিয়ে। যাই হোক, অবশেষে আমার চিন্তাধারা গতিপথ পরিবর্তন করল, ধীরে ধীরে কোথায় যেন সরে গেল ক্যাপটেন আহাব।

কুইকেগের রোজা বা উপোস যেহেতু সারা দিন চলবে, রাত নামার আগে ওকে বিরক্ত করব না বলে ঠিক করলাম। কারও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যত হাস্যকরই হোক না কেন, সম্মানের চোখে দেখি আমি।

আমাদের, খ্রিস্টানদের, এসব ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো উচিত। অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের আচার নিয়ে কিছুটা পাগলামি করে বলেই যে আমরা তাদের চেয়ে ভাল, এটা ভাবা ঠিক নয়। ওই যে কুইকেগ, ওর ইয়োজো আর রোজা নিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে– কিন্তু তাতে কি হয়েছে? কুইকেগ ওর ধর্ম নিয়ে তৃপ্ত, অন্য ধর্মের হাজার কিছু বলেও ওকে ওর বিশ্বাস থেকে নড়ানো যাবে না। সুতরাং ও থাকুক ওর ধর্ম নিয়ে। দয়াময় ঈশ্বর সব ধর্মের জন্যেই সদয় হন। কারণ, সবারই মাথার নাট-বল্টু ঢিলে হয়ে গেছে, সুচিকিৎসা প্রয়োজন।

সন্ধ্যার দিকে, ওর রোজা এতক্ষণে নিশ্চয় শেষ হয়ে গেছে ভেবে, ওপরতলায় গিয়ে ধাক্কা দিলাম দরজায়। কোন জবাব নেই। খোলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। 'কুইকেগ,' চাবির ফুটোয় মুখ লাগিয়ে নরম করে ডাকলাম। 'কুইকেগ, আমি ইসমাইল।' কোন সাড়াশব্দ নেই। দীর্ঘ সময় ওকে একা রেখে গেছি, মৃগীতে আক্রান্ত হতে পারে। চাবির ফুটোয় চোখ লাগালাম। কিন্তু দরজাটার অবস্থান এত বিশ্রী, খাটের পায়ার দিক এবং খানিকটা দেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। তবে দেয়ালের গায়ে হারপুনের কাঠের হাতলটা হেলান দেয়া দেখে খুবই অবাক হলাম, হারপুন তো মহিলা নিয়ে নিয়েছিল গতকাল। যাই হোক, হারপুন যখন আছে, আশেপাশে কুইকেগও নিশ্চয় আছে।

'কুইকেগ!– কুইকেগ!'– এবারেও কোন সাড়াশব্দ নেই। নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে। দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। নিচতলায় ছুটে গেলাম। একজন পরিচারিকার সঙ্গে দেখা হতে তাকেই খুলে বললাম ব্যাপারটা। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এরকমই কিছু একটা সন্দেহ করেছিলাম আমি। সকালে নাস্তার পর বিছানা গোছাতে গিয়ে দেখি, দরজা বন্ধ, ভেতরে কোন শব্দ নেই। এখন পর্যন্ত একই অবস্থা। ম্যাডাম! মিস্ট্রেস! খুন! মিসেস হাসি! মৃগী!'– চিৎকার করতে করতে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল সে, পেছনে পেছনে আমি।

বেরিয়ে এল মিসেস হাসি। এক হাতে রাই-সরষের পাত্র, আরেক হাতে ভিনিগারের শিশি।

'উড-হাউস থেকে দরজা ভাঙার মত কিছু একটা আনুন! কুড়াল!' খালি হাতেই ওপরতলার দিকে ছুটলাম আমি।

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'কুড়াল আনুন! আগে দরজা ভাঙি, ঈশ্বরের দোহাই, আপনারা ততক্ষণে ডাক্তার ডেকে আনুন!'

'আমার দরজা ভাঙবেন?' ভিনিগারের শিশি নামিয়ে রেখে খপ্ করে আমার একটা হাত ধরে ফেলল মহিলা। 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

যথাসম্ভব ঠাণ্ডা মাথায়, সংক্ষেপে ঘটনাটা বললাম তাকে। 'আত্মহত্যা করেছে!' চেঁচিয়ে উঠল মহিলা। 'আবার সেই ঘটনা ঘটল! হায় হায় রে, আমার সরাইখানার সর্বনাশ করেছে! এখনই একজন পেইন্টার ডেকে আনো কেউ, সাইনবোর্ড লিখে দিয়ে যাক– আত্মহত্যা-প্রবণদের প্রবেশ নিষেধ, গাড়িবারান্দায় ধূমপান নিষিদ্ধ।'

দরজা ভাঙতে যেতেই ছুটে এসে আমাকে বাধা দিল মহিলা।

'না। সরাইখানার সর্বনাশ আমি করতে দেব না। মাইলখানেক দূরে এক মিস্ত্রি আছে, তালা খুলতে হলে তাকে ডেকে আনুন। থামুন! আমার কাছে একটা চাবি আছে, এখানে লাগবে মনে হয়।' চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিল মহিলা, কিন্তু দরজা খোলার কোন নাম নেই।

'ভাঙতে হবে,' পেছনে সরে গেলাম আমি। হাত চেপে ধরে আবার বাধা দিল মহিলা। কিন্তু কোন বাধা মানলাম না, সোজা ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলাম সর্বশক্তি দিয়ে।

সশব্দে খুলে গেল দরজা, প্লাস্টারের কণা ছুটে গেল চারদিকে। ঘরের ঠিক মাঝখানে মাথায় ইয়োজোর মূর্তিটা রেখে, উবু হয়ে বসে আছে পাথরের মত নিশ্চল কুইকেগ।

'কুইকেগ,' কাছে গিয়ে বললাম আমি, 'এসব কি হচ্ছে?'

'উনি কি সারা দিন এইভাবে বসে আছেন?' অবাক হলো মহিলা।

কিন্তু কুইকেগের মুখ থেকে কোন কথা বের করা গেল না। একবার মনে হলো, অবস্থান বদল করানোর জন্যে ওকে ধাক্কিয়ে ফেলে দিই। এভাবে একনাগাড়ে আট দশ ঘণ্টা কি মানুষ বসে থাকতে পারে! পেটেও তো কিছু পড়েনি।

'মিসেস হাসি,' বললাম আমি, 'বুঝতেই পারছেন, ও বেঁচে আছে। দয়া করে যান, ব্যাপারটা আমি দেখছি।'

মহিলা চলে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কুইকেগকে একটা চেয়ারে বসাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। কোন কথাও বলল না ও, এমনকি আমার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

ভেবে অবাক হলাম, এটাই কি ওদের রমজানের রীতি? উপোসের সময়টা কি ওরা এভাবেই বসে থাকে? তাহলে থাকুক, সময় পেরিয়ে গেলেই অবস্থান বদলাবে। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, ওদের রমজান বছরে মাত্র একদিনের জন্যে আসে।

খেতে গেলাম নিচে। সদ্য তীরে আসা কিছু নাবিক জুড়ে দিয়েছে তাদের অভিযানের গল্প। প্রায় এগারোটা পর্যন্ত সে-গল্প শুনে উঠলাম আমি। ওপরে যেতে যেতে ভাবলাম, এতক্ষণে নিশ্চয় কুইকেগের উপবাস শেষ হয়েছে। কিন্তু না। যেভাবে দেখে গিয়েছিলাম, অবিকল সেভাবেই আছে, এক ইঞ্চিও নড়েনি ও। বেশ বিরক্তই লাগল এবার, একটা কাঠের টুকরো মাথায় নিয়ে সারা দিন এভাবে ঠায় বসে থাকার কোন মানে হয়!

'ঈশ্বরের দোহাই, কুইকেগ, উঠে কিছু মুখে দাও, অনাহারে তো মারা

BanglaBook.org

পড়বে।' কিন্তু কুইকেগ ঠোঁটও নাড়াল না।

ওর ব্যাপারে হতাশ হয়ে ঘুমাব বলে ঠিক করলাম। মোমবাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। মাত্র চার ফুট দূরে অনাহারী একজন লোক সারা দিন ধরে বসে আছে অতি কষ্টকর এক আসনে, এটা জানলে কি ঘুম আসা সম্ভব!

তবু ঘুম এল। সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি, তখনও একইভাবে বসে আছে কুইকেগ, কেউ যেন মেঝের সঙ্গে ওকে সেঁটে দিয়েছে স্ক্রু দিয়ে। কিন্তু সূর্যের প্রথম রশ্মি জানালা দিয়ে ঢুকতেই উঠে পড়ল ও। ওর অনাহারক্লিষ্ট মুখে ঝলমল করছে অদ্ভুত এক আনন্দ। সারা দিন সারা রাত অনড় বসে থাকায় খিল ধরা পায়ে কিছুক্ষণ খোঁড়াল কুইকেগ, তারপর আমার কপালে কপাল ঠেকিয়ে জানাল যে ওর রমজান শেষ হয়েছে।

বিছানা ছেড়ে কাপড় পরলাম আমি। উপোসের সময় মিসেস হাসির যে-ক্ষতি হয়েছে, সবরকম চাউডারের কয়েকটা বাটি খেয়ে তা পুষিয়ে দিল কুইকেগ। অবশেষে হ্যালিব্যাটের কাঁটায় দাঁত খুঁটতে খুঁটতে পেকোডে যাবার জন্যে বন্দরের উদ্দেশে রওনা দিলাম আমরা।

১৮

জাহাজের কাছে যেতেই তাঁবু থেকে বের হয়ে ক্যাপটেন পেলেগ বলল, কাগজপত্র না দেখালে কোন নরখাদককে জাহাজে উঠতে দেবে না সে।

'কিসের কাগজ, ক্যাপটেন পেলেগ?' জানতে চাইলাম আমি।

'মানে আমি বলতে চাইছি,' জবাব দিল সে, 'ওকে কাগজ দেখাতে হবে।'

'হ্যাঁ, ও যে ধর্মান্তরিত হয়েছে তার কাগজ,' বলল ক্যাপটেন বিলদাদ।

'কুইকেগ তো ফার্স্ট কংগ্রিগেশনাল চার্চের সদস্য।'

'মানে তুমি বলতে চাও, কোলম্যানের মীটিং হাউসের?'

'অতশত জানি না। ফার্স্ট কংগ্রিগেশনাল চার্চের সদস্য– ব্যস।'

'ভাঁওতাবাজি ছাড়ো!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপটেন বিলদাদ, 'ওখানে ওকে একদিনও দেখিনি। ঠিক করে বলো, কোন্ চার্চ?'

'ফার্স্ট কংগ্রিগেশনাল চার্চ বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি আদি ক্যাথলিক চার্চকে, যেখানে সব ধর্মের লোকই ছিল সমান।'

'বেশ, বেশ,' মাঝখান থেকে বলে উঠল ক্যাপটেন পেলেগ, 'তোমার কুয়োহগ না কি নাম যেন, ওকে জাহাজে আসতে বলো। হাতে তো বিরাট একখানা হারপুন দেখছি। তা, কুয়োহগ, হোয়েল-বোটের মাথায় উঠেছ কখনও? গেঁথেছ কোন মাছকে?'

এক লাফে বুলওয়ার্কে উঠল কুইকেগ, আরেক লাফে গিয়ে পড়ল পাশে বাঁধা একটা হোয়েল-বোটের ওপর। চেঁচিয়ে বলল, 'ওই যে আলকাতরার ফোঁটাটা দেখা যাচ্ছে, ওটা তিমির চোখ।' ক্যাপটেন বিলদাদের কাঁধের ওপর দিয়ে ছুটে

BanglaBook.org

গেল হারপুন, ডেক পেরিয়ে অদৃশ্য করে দিল আলকাতরার ফোঁটা।

'ওই যে,' হেসে উঠল কুইকেগ, 'তিমি মারা গেছে।'

'বিলদাদ, তাড়াতাড়ি কাগজপত্র নিয়ে এসো,' বলল ক্যাপটেন পেলেগ, 'এই কুয়োহগকে আমাদের জাহাজে নিতেই হবে। আমরা ওকে ৯০ লে দেব। আজ পর্যন্ত ন্যানটাকেটের বাইরের কোনও হারপুনার এত পায়নি।'

দুই ক্যাপটেনের সঙ্গে কেবিনে গেলাম আমরা। কুইকেগের কাগজ তৈরি হতে বেশি দেরি লাগল না।

১৯

'তোমরা কি এই জাহাজে যাচ্ছ?'

পেকোড থেকে নেমে পথ চলতে শুরু করেছি আমি আর কুইকেগ, হঠাৎ এক অপরিচিত লোক আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিল প্রশ্ন। পরনে রঙ-জ্বলা জ্যাকেট আর ট্রাউজারস, সারা মুখে বসন্তের দাগ।

'তোমরা এই জাহাজে যাচ্ছ?' আবার প্রশ্ন করল সে।

'মানে, তুমি পেকোডের কথা বলছ?' তাকে ভাল করে এক নজর দেখার জন্যে বললাম আমি।

'হ্যাঁ, পেকোড।'

'হ্যাঁ, এইমাত্র কাগজপাতি সই করে এলাম।'

'ওখানকার কিছু মনে ধরেছে?'

'কি মনে ধরবে?'

'যাক গে, তোমাদের হয়তো ওই জিনিসটাই নেই। অনেকেরই থাকে না। না থাকাই ভাল। মন হলো কোন গাড়ির পঞ্চম চাকার মত।'

'কি আজেবাজে বকছ?' বললাম আমি।

'তার রয়েছে বিরাট মন।'

'কুইকেগ, চলো। এই লোক সম্ভবত পাগলাগারদ থেকে এসেছে। এমন কারও কথা সে বলছে, যাকে আমরা চিনি না।'

'ঠিক!' বলল আগন্তুক, 'পুরানো বজ্রকে তোমরা এখনও দেখোনি।'

'পুরানো বজ্রটা কে?'

'ক্যাপটেন আহাব।'

'মানে, আমাদের পেকোডের ক্যাপটেন?'

'আমাদের বুড়ো নাবিকদের অনেকেই তাকে ওই নামে ডাকে। তোমরা এখনও তাকে দেখোনি, তাই না?'

'না, দেখিনি। সে নাকি অসুস্থ, তবে শিগগিরই ভাল হয়ে যাবে।'

'ভাল হয়ে যাবে!' হেসে উঠল আগন্তুক। 'ক্যাপটেন আহাব যদি ভাল হয়, আমার বাম হাতটাও ভাল হয়ে যাবে।'

'তার সম্বন্ধে কতটুকু জানো তুমি?'

BanglaBook.org

'তার আগে বলো, ওরা তোমাদের কতটা জানিয়েছে।'

'এমন কিছু নয়। কেবল শুনলাম সে একজন ভাল তিমি শিকারী আর ভাল ক্যাপটেন।'

'সত্যি, দুটো কথাই সত্যি। তবে এটা নিশ্চয় বলেনি যে কয়েক বছর আগে কেপ হর্নে ক্যাপটেন আহাব তিন দিন তিন রাত পড়েছিল মরার মত; বলেছে সান্তার বেদীর সামনে স্প্যানিয়ার্ডদের সঙ্গে ভয়াবহ সেই সঙ্ঘর্ষের কথা? জানো, রূপালী লাউয়ের খোলে তার থুতু ফেলার কথা? ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে গত অভিযানে তার পা হারানোর কথা? এসব কিছুই শোনোনি। কিছুই জানো না। জানবেই বা কিভাবে, ন্যানটাকেটের কেউই জানে না। তবে পা হারানোর কথাটা খুব সম্ভব শুনেছ। এটা অনেকেই জানে যে ক্যাপটেন আহাবের একটা মাত্র পা, অন্য পা-টা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে প্রকাণ্ড এক স্পার্ম তিমি।'

'শোনো,' বললাম আমি, 'যেসব নিয়ে এতক্ষণ বকবক করলে, সেসবের কিছুই আমি জানি না, আর জানবার ইচ্ছেও নেই। যতদূর মনে হচ্ছে, তোমার মাথার বেশ কয়েকটা নাট-বল্টু ঢিলে হয়ে গেছে।'

পেকোডের দিকে আঙুল তুলে কয়েক মুহূর্ত কি এক সুখস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে রইল ভিখিরি চেহারার আগন্তুক। তারপর সামান্য চমকে উঠে, ঘুরে বলল, 'কাগজপাতি সই করা হয়ে গেছে, তাই না? বেশ, বেশ, যা সই হয়ে গেছে, হয়ে গেছে; যা হয়নি, তা হবে; হয়তো শেষমেশ হবেও না। নিশ্চয় অনেক নাবিক যাবে এবার, ঈশ্বর তাদের করুণা করুন! ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমাদের ওপর বর্ষিত হোক। তোমাদের দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে দুঃখিত।'

'দেখো,' বললাম আমি, 'যদি বলার মত কিছু থাকে, তাহলে বলে ফেলো। ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না।'

'তোমার কথা বলার ধরন খুব ভাল লাগল। এরকম স্পষ্ট কথা বলতে পারে, এমন কারও পেকোডে যাওয়া উচিত। জাহাজে ওঠার পর সবাইকে জানিয়ে দিয়ো, আমি ওদের সঙ্গে এবার অভিযানে না যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'তা, তোমার নামটা কি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'এলিজা।'

এলিজা! হাঁটতে হাঁটতে ভাবলাম আমি। আমরা দু'জনেই যে যার মত মন্তব্য করছিলাম লোকটা সম্বন্ধে। একসময় আমরা একমত হলাম, লোকটা একটা প্রতারক, আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিছুদূর এগোবার পর একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে দেখি, অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে পেছনে পেছনে আসছে এলিজা। কুইকেগকে এ-ব্যাপারে কিছুই জানালাম না। দেখা যাক, লোকটা একই বাঁক নেয় কিনা। নিল। ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। লোকটা আমাদের অনুসরণ করছে, কিন্তু অনেক ভেবেও অনুসরণের কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। তার বলা রহস্যময় কথাগুলো মনে পড়ে গেল একে একে। কেপ হর্নে ক্যাপটেন আহাবের দীর্ঘ অচেতনতা, রূপালী লাউয়ের খোল, স্প্যানিয়ার্ডদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ– গতকাল বলা ক্যাপটেন পেলেগের কথাগুলোও মনে পড়ল।

BanglaBook.org

পরীক্ষা করে দেখতে হবে, এলিজা সত্যিই অনুসরণ করছে কিনা। রাস্তা পেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম উল্টোদিকে। পাশ কাটিয়ে চলে গেল এলিজা, আমাদের লক্ষ করেছে বলে মনে হলো না। বুকের ওপর থেকে যেন পাথর নেমে গেল। এলিজা সত্যিই একটা প্রতারক, ভাবলাম আবার।

২০

দিন দু'য়েকের মধ্যেই সাড়া পড়ে গেল পেকোডে। পুরানো পাল মেরামত করা হলো, নতুন পাল এল, এল ক্যানভাস, দড়াদড়ি। ক্যাপটেন পেলেগ তাঁবু ছেড়ে বেরোয় না বললেই চলে, কর্মচারীদের ওপর তার তীক্ষ্ণ নজর। ওদিকে ক্যাপটেন বিলদাদ ব্যস্ত ভাঁড়ারের জিনিসপত্র কেনা নিয়ে।

কুইকেগের কাগজ সই করার পর দিন সরাইখানায় নাবিকরা বলাবলি করতে লাগল, যার যার সিন্দুক আজরাতের মধ্যেই তুলে ফেলতে হবে জাহাজে। জাহাজ ছাড়তে নাকি আর বেশি দেরি নেই। অবশ্য এসব জাহাজ ছাড়বে ছাড়বে করেও দিনের পর দিন পার করে দেয়। তবে এই দেরি ইচ্ছেকৃত নয়। দূর সাগরে দীর্ঘ অভিযানের জন্য কত জিনিস যে লাগে।

শুধু বসবাসের জন্যেই লাগে বিছানা, সসপ্যান, ছুরি, কাঁটাচামচ, বেলচা, চিমটে, গামছা, জাঁতিসহ আরও নানা টুকিটাকি। এছাড়াও রয়েছে হোয়েলিংয়ের একশো এক রকম জিনিস। শেষ সময়েও দেখা যায় প্রয়োজনীয় কোন জিনিস সঙ্গে নেয়া হয়নি। মহাসাগরে নেই কোন মনোহারী দোকান, ব্যাঙ্কার, ডাক্তার বা রুটিঅলা। তাই সাথে নিতে হয় বাড়তি জিনিস। বাড়তি নৌকো, বাড়তি কাষ্ঠদণ্ড, বাড়তি রশি, বাড়তি হারপুন, বাড়তি আরও অনেক কিছু- কেবল বাড়তি ক্যাপটেন আর বাড়তি জাহাজ নেয়া অসম্ভব।

আমরা ন্যানটাকেটে আসার সময়েই পেকোডে ভাঁড়ারের জিনিস নেয়া প্রায় শেষ হয়েছিল। কিন্তু শুধু গরুর মাংস, পাঁউরুটি, পানি, জ্বালানি, লোহার আঙটা, পেরেক নিলেই তো চলবে না, জাহাজে লাগে নির্দিষ্ট জিনিসের বাইরে ছোট বড় আরও অনেক কিছু।

যেখানে যেটা প্রয়োজন সেটার দিকে নজর রাখতে ক্যাপটেন বিলদাদের বৃদ্ধা বোনের কোন জুড়ি নেই। এখনই হয়তো তাকে দেখা যাবে স্টুয়ার্ডের জন্যে এক বয়াম আচার হাতে, আবার একটু পরেই হয়তো পালকের কলম নিয়ে যেতে দেখা যাবে চীফ মেটের ডেস্কের জন্যে। এমনকি পিঠে বাত হয়েছে, এমন কারও জন্যে পশমি কাপড় নিতেও ভুল হয় না বুড়ির। পেকোডের সবাই অযথাই তাকে আন্ট চ্যারিটি বলে ডাকে না। প্রিয় ভাইটির সাহায্যে লাগে, এমন কাজ করতে কোন ক্লান্তি নেই আন্ট চ্যারিটির। বোনের জন্যে ক্যাপটেন বিলদাদ খুবই উপকৃত হয়, আর এই উপকার করার ফলে বোনের হাতে আসে দশ বিশটা ডলার।

গতকালই তো এক হাতে একটা তেল তোলার হাতা, আরেক হাতে একটা তিমি মারার বর্শা নিয়ে কী ব্যস্তই না ছিল বুড়ি। ক্যাপটেন পেলেগও তাঁবুর ভেতর– বায় করছিল নাবিকদের গালি দিতে দিতে।

প্রস্তুতির এই দিনগুলোতে আমি আর কুইকেগ প্রত্যেকদিন আসি আর জানতে

BanglaBook.org

চাই ক্যাপটেন আহাবের সংবাদ। বার বার শুনি একই জবাব– ক্রমেই আরোগ্য লাভ করছে ক্যাপটেন, যে-কোন দিন এসে উপস্থিত হবে ডেকে। এখন ভাবলে অবাক লাগে, যে-মানুষ খোলা সাগরে জাহাজের একনায়ক বিশেষ, তাকে এক নজরও না দেখে আমি পেকোডে যেতে রাজি হয়েছিলাম কীভাবে। আসলে মানুষ যখন ভুল করেছে বলে সন্দেহ করে, তখন ভুলটা চাপা দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সেসময় ক্যাপটেন আহাব সম্বন্ধে আমার প্রশ্নগুলো ছিল নিছক প্রশ্নই, গভীরভাবে মাথা ঘামাবার চেষ্টা করিনি।

অবশেষে একদিন ঘোষণা দেয়া হলো, আগামীকাল কোন এক সময়ে জাহাজ অবশ্যই ছাড়বে। সুতরাং পরদিন বেশ সকাল সকালই রওনা দিলাম আমি আর কুইকেগ।

২১

আমরা যখন জেটিতে পৌঁছুলাম, তখন প্রায় ছ'টা বাজে। কুয়াশাচ্ছন্ন ঊষা ধূসর চাদর বিছিয়ে রেখেছে চারপাশে।

'ওই দেখো, কয়েকজন নাবিক দৌড়াচ্ছে,' বললাম আমি কুইকেগকে, 'জাহাজ মনে হয় সূর্য উঠলেই ছাড়বে। চলো, চলো!'

'থামো!' একটা স্বর ভেসে এল পেছন থেকে, আমাদের দু'জনের কাঁধে হাত রেখে অদ্ভুত চোখে চেয়ে রয়েছে এলিজা।

'জাহাজে উঠতে যাচ্ছ?'

'হাত সরাও,' বললাম আমি।

'ভাগো এখান থেকে!' শরীর ঝাঁকাল কুইকেগ।

'তোমরা তাহলে জাহাজে যাচ্ছ না?'

'হ্যাঁ, আমরা জাহাজেই যাচ্ছি,' বললাম আমি, 'কিন্তু যাই বা না যাই তাতে তোমার কি? দেখো, মি. এলিজা, তুমি কিন্তু অন্যের ব্যাপারে বড় বেশি নাক গলানো শুরু করেছ।'

'তাই বুঝি? আমি খেয়াল করিনি।'

'চলো, কুইকেগ, এর মাথাটা পুরোপুরিই গেছে।'

'শোনো!' কয়েক ধাপ এগোতেই পেছন থেকে ডাকল এলিজা।

'এগোও, কুইকেগ, ওর কথায় কান দিয়ো না।'

দ্রুত এসে আবার আমার কাঁধে হাত রাখল এলিজা, 'খানিক আগে কয়েকজন নাবিকের মত লোককে জাহাজের দিকে যেতে দেখেছ?'

সাধারণ এই প্রশ্ন কেমন যেন চমকে দিল আমাকে। বললাম, 'হ্যাঁ, চার কি পাঁচজন লোক ছিল। তবে এত কুয়াশা ছিল সেসময়, কোন ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব।'

'কুয়াশা, ঘোর কুয়াশা,' বলল এলিজা।

আবার এগোলাম আমরা, আবার এসে আমার কাঁধে হাত রাখল সে।

BanglaBook.org

'দেখো, আর কোথাও তাদের খুঁজে পাও কিনা। খুঁজবে?'

'কাদের খুঁজব?'

'সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!' পেছনে সরে যেতে যেতে বলল এলিজা। 'আমি সাবধান করে দিতে চাচ্ছিলাম তোমাদের– মনে কিছু কোরো না– খুব কুয়াশা পড়েছে আজ, তাই না? বিদায়। শিগগির বোধ হয় আর দেখা হবে না তোমাদের সঙ্গে। তবে মহা সেই বিচারক ডেকে পাঠালে ভিন্ন কথা।' আবোলতাবোল বকে অবশেষে আমাদের রেহাই দিল সে।

পেকোডে বিরাজ করছে নিরেট স্তব্ধতা। কোথাও কেউ নেই। কেবিনের প্রবেশপথ ভেতর থেকে বন্ধ। ফোরকাসলে গিয়ে একটা আলো দেখতে পেয়ে নিচে নেমে গেলাম আমরা। দুটো সিন্দুকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে গভীর ঘুমে অচেতন জ্যাকেট পরা বুড়ো এক মাল্লা।

'ওই নাবিকগুলো গেল কোথায়, কুইকেগ?' বললাম আমি মাল্লাটার দিকে চেয়ে। কিন্তু হাবভাবে নাবিকগুলোকে ও দেখেছে বলে মনে হলো না। পুরো ব্যাপারটাকে আমি চোখের ভুল হিসেবেই ধরে নিতাম, যদি না এলিজা ওই প্রশ্নটা করত। যাই হোক, জোর করে মনটা ওদিক থেকে সরিয়ে রসিকতা করে কুইকেগকে বললাম, অযথা দাঁড়িয়ে না থেকে মাল্লাটার ওপরে বসাই ভাল। ঘুমন্ত লোকটার নিতম্বে হাত দিল ও, যেন পরীক্ষা করে দেখছে জায়গাটা নরম কিনা, তারপর সোজা বসে পড়ল নিরীহ মুখ করে।

'হায় ঈশ্বর! ওখানে বসো না, কুইকেগ।'

'খুব সুন্দর আসন, ঠিক আমাদের দেশের মত।'

'ওঠো, কুইকেগ। ওই দেখো, কত কষ্ট করে শ্বাস নিচ্ছে লোকটা। তুমি ভারী মানুষ, বেচারির মুখটা তো ভর্তা হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ওঠো, নাহলে ছিটকে ফেলে দেবে তোমাকে। অবাক ব্যাপার, এখনও জাগছে না কেন!'

উঠে গিয়ে মাল্লাটার মাথার কাছে বসে পাইপ ধরাল কুইকেগ। আমি বসলাম তার পায়ের কাছে।

শুরু হলো আমাদের যৌথ ধূমপান। কুইকেগ বলল, ওদের দেশে কোন সোফা বা গদিমোড়া চেয়ার নেই। নিচু বংশের কিছু লোককে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করা হয় আসন হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে। বসে বসে খেয়ে তারা আলসেও হয় চূড়ান্ত। কারও আসনের প্রয়োজন হলে তাদের কয়েকটাকে কিনে নিয়ে যায় বাড়িতে। সত্যিকারের আসনের তুলনায় এগুলোকে স্থানান্তরের ঝামেলা নেই বললেই চলে। তাছাড়া একটা সোফা যেখানে-সেখানে নিয়ে যাওয়াও যায় না। কিন্তু ওদের দেশে এমনকি জলাভূমির পাশের স্যাঁতসেঁতে জায়গাতেও আরামে বসার কোন অসুবিধে নেই। নিজে বা কাউকে দিয়ে একটা আসনকে ডেকে নিলেই হলো।

লোকটার গায়ের ওপর দিয়েই পাইপ হস্তান্তরের মাধ্যমে ধূমপান চলছিল আমাদের। ছোট্ট জায়গাটা ধোঁয়ায় ভরে যাওয়াতে ফোঁৎ ফোঁৎ করতে লাগল বুড়ো মাল্লা, খানিক পর উঠে বসল চোখ রগড়াতে রগড়াতে।

বলল, 'এই, কে তোমরা?'

BanglaBook.org

'এই জাহাজেরই নাবিক,' জবাব দিলাম আমি। 'তা, জাহাজটা ছাড়বে কখন বলতে পারো?'

'ও, তোমরা তাহলে এই জাহাজেই যাচ্ছ? আজই ছাড়বে। গত রাতে তো ক্যাপটেন এসেছিল ডেকে।'

'কোন্ ক্যাপটেন? আহাব?'

'তাছাড়া আবার কে?'

আরও প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম আহাব সম্বন্ধে, এমন সময় একটা শব্দ ভেসে এল ডেকের দিক থেকে।

'ওই যে স্টারবাক,' বলল মাল্লাটা। 'খুব ভাল চীফ মেট, ধার্মিক, প্রাণবন্ত। এবার যেতে হবে।' দ্রুত ডেকের দিকে এগোল সে, পেছনে পেছনে আমরা।

ইতিমধ্যে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যের সোনালী আলো। দু'জন তিনজন করে এসে উপস্থিত হতে লাগল নাবিকরা, রিগাররা ব্যস্ত হয়ে পড়ল দড়িদড়া নিয়ে, ওদিকে টুকিটাকি জিনিস আনা অব্যাহত রয়েছে। বাইরে এত হৈচৈ, অথচ তখনও কেবিন থেকে বেরোয়নি ক্যাপটেন আহাব।

২২

অবশেষে ধীরে ধীরে জেটি ত্যাগ করল পেকোড। তখন দুপুর। শেষ মুহূর্তে একটা হোয়েলবোটে করে আন্ট চ্যারিটি নিয়ে এল সেক্সে মেটের জন্যে একটা নাইট-ক্যাপ আর স্টুয়ার্ডের জন্যে একটা বাড়তি বাইবেল।

এখনও ক্যাপটেন আহাবের কোন পাত্তা নেই। সবাই বলছে, ক্যাপটেন কেবিনে আছে। অবশ্য এই মুহূর্তেই ক্যাপটেনের প্রয়োজনীয়তা নেই। ব্যবসায়ী জাহাজগুলোতে নোঙর তোলার অনেক পরেও ক্যাপটেনের দেখা পাওয়া যায় না। তখন কেবিন টেবিলে বসে সে গল্পগুজব করে তীরের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে।

ক্যাপটেন পেলেগ আর ক্যাপটেন বিলদাদের যৌথ নেতৃত্বে এগিয়ে চলল পেকোড। স্টার্নে দাঁড়িয়ে আছি আমি, হঠাৎ তীব্র একটা ধাক্কা অনুভব করলাম পাছায়। তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখি, ক্যাপটেন পেলেগ তার পা টেনে নিচ্ছে। ওটাই আমার জীবনের প্রথম লাথি খাওয়া।

'এভাবেই বুঝি ব্যবসায়ী জাহাজে হাত গুটিয়ে বসে থাকা হয়?' গর্জে উঠল সে। 'ঝাঁপিয়ে পড়ো, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো সবাই।' নির্বিচারে ডানে-বামে লাথি চালাতে লাগল ক্যাপটেন পেলেগ। নিশ্চয় যথেষ্ট মদ গিলেছে ক্যাপটেন, ভাবলাম আমি।

বন্দর ছেড়ে বেরোনোর পর জাহাজ থেকে বিদায় নিল আন্ট চ্যারিটি, ক্যাপটেন পেলেগ আর ক্যাপটেন বিলদাদ।

BanglaBook.org

২৩

কুইকেগ অনেক আগেই হয়েছে, সম্প্রতি আমি যুক্ত হলাম হোয়েলিংয়ে। সাধারণ মানুষের চোখে এই পেশা মোটেই সম্মানজনক নয়। এ-যাবৎ তারা আমাদের, অর্থাৎ তিমি শিকারীদের প্রতি দারুণ অবিচার করে এসেছে।

এটাকে কোন পেশাই মনে করা হয় না। অন্য লোকেরা যেরকম সহজে তাদের পেশার কথা উল্লেখ করে, একজন হারপুনারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আর দশটা লোকের মত একজন তিমি শিকারী যদি ভিজিটিং কার্ড তৈরি করে, মানুষের কাছে তা হবে হাসির খোরাক।

পৃথিবীর প্রায় সবাই আমাদের পেশাটাকে নিষ্ঠুর মনে করে, তিমি শিকারী মাত্রেই তাদের চোখে কসাই। হ্যাঁ, আমরা কসাই, এ-কথা সত্যি। কিন্তু মার্শালদের চেয়ে বড় কসাই আর কেউ আছে? অথচ তারা পৃথিবীর চোখে বীর, এইসব বীরদের ভাগ্যে জোটে পদকের পর পদক। অভিযোগ রয়েছে, তিমি শিকারীরা নোংরা, তিমির মৃতদেহ তাদের জাহাজের ডেক নোংরা করে দেয়। কিন্তু সৈন্যদের গলিত মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রের যে-অবস্থা করে, সেই নোংরামির কি কোন জুড়ি আছে?

বেশির ভাগ মানুষের ধারণা, আমাদের কোন অবদানই নেই। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যত মোমবাতি জ্বলছে, তার মূলে রয়েছি আমরা।

আমার ভাগ্যে যদি কোন মরণোত্তর খেতাব জোটে, তাহলে তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হোয়েলিংয়ের। একজন ছাত্রের কাছে ইয়েল কলেজ আর হার্ভার্ড যা, আমার কাছে একটা হোয়েল শিপ তা-ই।

২৪

পেকোডের চীফ মেট স্টারবাক ন্যানটাকেটেরই স্থানীয় অধিবাসী। ঠাণ্ডা দেশে জন্ম নিলেও গরমে সে অভ্যস্ত। দীর্ঘদেহী, আন্তরিক স্টারবাকের বয়েস মাত্র তিরিশ। তার চোখে রয়েছে হাজারটা বিপজ্জনক ঘটনার ছায়া। মন তার ইস্পাতদৃঢ়, তবু কিছু কুসংস্কার আছে। মূর্খের চেয়ে শিক্ষিতের কুসংস্কারকে সে অনেক বেশি ভয় পায়। স্টারবাক বলে, 'তিমিকে ভয় পায় না, এমন কোন লোককে আমি আমার নৌকোয় নেব না।' এই কথা বলে সে হয়তো বোঝাতে চায়, বিপদ উপলব্ধি করার মধ্যেই রয়েছে সাহসের পরিচয়, কিংবা কাপুরুষের চেয়ে অকুতোভয় সঙ্গী অনেক বেশি বিপজ্জনক।

সেকেণ্ড মেট স্টাব বলে, 'যত তিমি শিকারী আছে, তাদের মধ্যে স্টারবাকের চেয়ে সাবধানী মানুষ আর কেউ নেই।'

স্টারবাকের দৃষ্টিতে সাহস কোন আবেগ নয়। তিমি শিকারী হতে গেলে সাহসের প্রয়োজন, আর প্রয়োজনীয় জিনিস বলেই এটাকে অযথা খরচ করা স্টারবাক অনুমোদন করে না। সূর্যাস্তের পর তিমির পিছু নিতে সে নারাজ।

তিমিকে সে মারতে চায়, কিন্তু মরতে চায় না তিমির হাতে। প্রয়োজনে তিমি যে কতখানি হিংস্র, সেটা তার চেয়ে ভাল আর ক'জন জানে! বাবার মৃত্যু সে নিজের চোখে দেখেছে। অতল ওই মহাসাগরের কোথায় সে খুঁজে পাবে তার ভাইয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গ?

২৫

স্টাব পেকোডের সেকেণ্ড মেট। কেপ কডের অধিবাসী। হাসিখুশি, ফুর্তিবাজ মানুষ। দুঃসাহসী নয়, আবার কাপুরুষও বলা যাবে না। আক্রমণোদ্যত তিমির সামনে দাঁড়িয়ে বর্শা ছুঁড়তে হাত কাঁপে না স্টাবের। আসলে মানুষের কাছে যেটা মৃত্যুর চোয়াল, দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে সেটাই তার কাছে পরিণত হয়েছে ইজি চেয়ারে। মৃত্যুর কথা সে আদৌ কোন দিন ভেবেছে কিনা জানি না, ভাবলেও নিশ্চয় গভীর ভাবে নয়। জীবনের সব কিছুই তার কাছে রসিকতা।

থার্ড মেট ফ্লাস্ক। টিসবারির অধিবাসী। খাটো, শক্তসমর্থ এই তরুণ তিমির ব্যাপারে সবসময়েই যুদ্ধংদেহী। তিমির বিশাল আকার তার কাছে কোন মহিমাই বহন করে না, ওগুলো যেন দানবীয় জল-ইঁদুর মাত্র, দেখার সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলাটাই প্রধান কর্তব্য।

এই তিন মেট– স্টারবাক, স্টাব আর ফ্লাস্ক পেকোডের বোটগুলোতে হেডম্যান হিসেবে কাজ করে।

আগেকার যুগে নাইটের পাশে পাশে যেমন স্কয়ার থাকত, তিমি শিকারে তেমনি মেট যেন নাইট আর হারপুনার তার স্কয়ার।

তো, পেকোডের চীফ মেট স্কয়ার হিসেবে বেছে নিল কুইকেগকে। কুইকেগের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যেই ওর সম্বন্ধে আপনারা অনেক কিছু জেনেছেন।

আরেক হারপুনার ট্যাসটেগো। গে হেডের এক ইণ্ডিয়ান। এই জায়গাটা যুগে যুগে বিখ্যাত সব হারপুনারের জন্ম দিয়েছে, তারা সবাই গে হেডার বলে পরিচিত। ট্যাসটেগো বেশ লম্বা, হালকা-পাতলা শরীরে কিলবিল করছে মাংসপেশি, কালো গোল গোল চোখ, চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। রেড ইণ্ডিয়ানদের রক্ত বইছে তার শিরায়। ফলে অন্যান্য ইণ্ডিয়ানরা তীর-ধনুক হাতে যেমন নির্ভীক, সেও তেমনি হারপুন হাতে। ট্যাসটেগো সেকেণ্ড মেট স্টাবের স্কয়ার।

তৃতীয় হারপুনার ডাগ্‌গু, বিশালদেহী এক কালো কুচকুচে নিগ্রো। তার কান থেকে ঝুলছে বড় দুটো সোনালি আংটা। প্রথম জীবনে সে আফ্রিকা ছাড়া আর কোন দেশ দেখেনি। তারপর একদিন কৌতূহলী হয়ে যোগ দেয় এক জাহাজে। ডাগ্‌গু হলো ফ্লাস্কের স্কয়ার, পাশাপাশি দু'জনকে দেখায় দাবার রাজা আর বোড়ের মত। শ্বেতাঙ্গ কোন লোক তার সামনে দাঁড়ালে মনে হয়, সাদা পতাকা নিয়ে কেউ দুর্গে এসেছে সন্ধি ভিক্ষা করতে।

BanglaBook.org

ন্যানটাকেট ছাড়ার পর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল, তবু ক্যাপটেন আহাবের দেখা নেই। যে-কারও মনে হতে পারে যে তিনজন মেটই বুঝি পেকোডের সর্বেসর্বা। কিন্তু মাঝে মাঝে চূড়ান্ত আদেশ আসে কেবিন থেকে। বোঝা যায়, অলক্ষে হলেও পেকোডের এক নায়ক অনুপস্থিত নয়।

নিচের কাজ সেরে কখনও কখনও ডেকে আসি আমি, চোখ খুঁজে ফেরে অপরিচিত এক মুখকে। তীব্র শীতকে পেছনে ফেলে জাহাজ এখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে স্বাভাবিক আবহাওয়ার দিকে। সেদিনও যথারীতি ওপরে গেছি। ট্যাফরেইলের দিকে চোখ পড়তেই শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীরে। কোয়ার্টারডেকে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন আহাব।

অসুস্থ তাকে মনে হচ্ছে না। লম্বা চওড়া শরীর যেন তৈরি হয়েছে ব্রোঞ্জ দিয়ে। পাকা চুলের ভেতর থেকে সাদা একটা রেখা তামাটে কপাল, গলা বেয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে পোশাকের ভেতর। কোন কোন বড় গাছে বজ্রপাত হয়, ছাল-বাকল ছিঁড়ে বিদ্যুৎ নেমে আসে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত। গাছ মরে না, কিন্তু চিরদিনের মত চিহ্নিত হয়ে যায়। জানি না, ক্যাপটেন আহাবের ওই দাগ জন্মগত নাকি কোন ভয়াবহ সংঘর্ষের স্মৃতি বহন করছে। একবার ট্যাস্টেগোর সিনিয়র, বুড়ো এক গে-হেডার হারপুনার শুনিয়েছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক গল্প– সাগরের অশরীরী কোন্ শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের ফলেই নাকি ওই দাগ হয়েছে ক্যাপটেন আহাবের। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই গল্পের প্রতিবাদ করেছিল আরেক বুড়ো নাবিক।

ক্যাপটেন আহাবের এই অদ্ভুত চেহারা আমাকে এমনই আচ্ছন্ন করে ফেলল যে, লক্ষই করলাম না, তাকে অদ্ভুত দেখানোর অন্যতম প্রধান কারণ বিচ্ছিন্ন অঙ্গের স্থানে লাগানো সাদা একটা কৃত্রিম পা। তার এই পা তৈরি হয়েছে স্পার্ম তিমির চোয়ালের হাড় থেকে।

জাহাজের ওপর দিয়ে খোলা সাগরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাপটেন আহাব। স্থির ওই দৃষ্টিতে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। প্রথম থেকেই সে একেবারে চুপ। আশেপাশে দাঁড়ানো অফিসারদের মুখেও কোন কথা নেই। বোঝা যায় অস্বস্তিতে ভুগছে তারা। ক্যাপটেন আহাবের দুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্বের সামনে চিরকালই অস্বস্তিতে ভুগেছে মানুষ।

খোলা বাতাসে খুব বেশিক্ষণ না থেকে কেবিনে ফিরে গেল ক্যাপটেন আহাব। কিন্তু সেদিনের পর থেকে প্রায়ই তাকে দেখতে পেল নাবিকেরা। কখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কখনও টুলে বসে রয়েছে, আবার কখনও ভারী পা ফেলে পায়চারি করছে ডেকে। আকাশ পরিষ্কার হবার সাথে সাথে যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে লাগল ক্যাপটেন আহাব। আমার মনে হলো, বিষণ্ন পরিবেশই ক্যাপটেনকে কেবিনে বন্দী করে রেখেছিল, এখন ভাল আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে তার ওপর ভর করছে নতুন এক কর্মচাঞ্চল্য।

দেখতে দেখতে এসে গেল প্রকৃতির নাচুনী দুই মেয়ে– এপ্রিল আর মে। তাদের নৃত্যের তালে তালে উধাও হলো বরফ। মনমরা ভাব দূরে ছুঁড়ে ফেলে

চাঙ্গা হয়ে উঠল সবাই। পরিবেশের একটা প্রভাব আছে। প্রভাবান্বিত হলো ক্যাপটেন আহাবও। তবে নিজের মত করে। অন্য আর দশটা লোক যেখানে ভেঙে পড়ত প্রাণখোলা হাসিতে, সেখানে কেবল রঙিন ছোপ লাগল তার দৃষ্টিতে।

২৭

আরও দিন গেল। পরিষ্কার প্রকৃতি এখন ঝলমল করে সূর্যালোকে, রাতের আকাশকে পরায় রত্নখচিত মখমলের মালা। মানুষের ভেতরটাও কেমন ওলোট-পালট হয়ে যায়। নিস্তব্ধ গোধূলির স্বচ্ছ বরফের মত উপচে পড়ে স্মৃতির স্ফটিক।

বয়স যত বাড়ে, ঘুম তত কমতে থাকে। ক্যাপটেন আহাবও ব্যতিক্রম নয়। রাতে কেবিনের চেয়ে খোলা বাতাসেই বেশিক্ষণ থাকে সে। 'কেবিনে যাওয়া যেন,' বিড়বিড় করে বলে সে, 'নিজের খোঁড়া কবরে গিয়ে ঢোকা।' তো, এমনি এক রাতে ডেকে পায়চারি করছে সে, এমন সময় স্টাব খোলা বাতাসে না থেকে তাকে কেবিনে যেতে বলল।

ঠাণ্ডা চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ক্যাপটেন আহাব। তারপর বলল, 'নিজের কাজে যাও। আমার পিছনে লেগো না। চাদর মুড়ি দিয়ে শোয়া ছাড়া তোমাদের জীবনে আর আছেটা কি? অবশ্য গর্তে গিয়ে না ঢোকা পর্যন্ত কুকুরের ভাল লাগবেই বা কেন– যাও, ভাগো এখান থেকে!'

বাক্যটার শেষ অংশের ধাক্কায় কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে রইল স্টাব। তারপর উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমার সঙ্গে কারও এভাবে কথা বলাটা আমি পছন্দ করি না, স্যার। মোটেই পছন্দ করি না।'

'থামো!' দাঁত কিড়মিড় করতে করতে পেছনে সরে গেল ক্যাপটেন আহাব, যেন ভয়ঙ্কর কোন ইচ্ছে দমন করতে চায়।

'না, স্যার,' আরও সাহস দেখিয়ে বলল স্টাব, 'কারও কুকুর বলাটা আমি এত সহজে মেনে নেব না।'

'কুকুর বলা পছন্দ হয়নি, তাই না? বেশ, কুকুর বলে আর ডাকব না। তুমি হলে দশটা গাধার সমান। একটা খচ্চর। ভাগো, নইলে একেবারে খতম করে ফেলব! যাও!'

এমন ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তেড়ে এল ক্যাপটেন আহাব যে পালিয়ে এল স্টাব।

'এর আগে আমার সঙ্গে কেউ এমন ব্যবহার করলে ঘুসি না খেয়ে পার পায়নি,' কেবিনের পথে যেতে যেতে বিড়বিড় করতে লাগল স্টাব। 'অদ্ভুত ব্যাপার, খুবই অদ্ভুত। এখন কি করা উচিত বুঝতে পারছি না। ফিরে গিয়ে ব্যাটাকে ঘুসি লাগাব?– নাকি এখানেই হাঁটু মুড়ে তার জন্যে প্রার্থনা করব? হ্যাঁ, প্রার্থনা করাটাই বুঝি ভাল হবে। কিন্তু প্রার্থনা যে জীবনে করিনি কখনও। অদ্ভুত ব্যাপার, খুবই অদ্ভুত। এই লোকটাও কম অদ্ভুত নয়। সত্যি কথা বলতে কি, এর চেয়ে অদ্ভুত লোকের সঙ্গে আমি আর কোন জাহাজে উঠিনি। কীভাবে ছুটে এল

BanglaBook.org

আমার দিকে!– চোখদুটো জ্বলছিল বাঘের মত। ব্যাটা কি পাগল নাকি? বিছানায় সে এখন থাকে না বললেই চলে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র তিন ঘণ্টা, সে-সময়টুকুও ঘুমায় না। স্টুয়ার্ড বলল, সে দেখেছে, চাদরসহ বুড়োর কাপড়চোপড় নাকি তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে বিছানার পায়ের দিকে। বুড়োর নিশ্চয় মাথা গরম হয়েছে। হ্যাঁ, ওই জিনিস থাকলে মাথা গরম হবেই। ওই যে, লোকে যাকে বলে– বিবেক। অদ্ভুত ব্যাপার, লোকে ঘুমাবে না? কিন্তু ওটা কি হলো? বুড়ো যে কুকুর বলল আমাকে! শুধু তা-ই নয়। বলল, দশটা গাধার সমান। খচ্চর। আর যেভাবে তেড়ে এল, লাথি মারত নাকি? নাকি লাথি মেরেছে, আমি লক্ষ করিনি? এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম! কিন্তু– ঈশ্বর, আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? যাক গে, আপাতত বাদ যাক এসব চিন্তা। হ্যামক আমায় ডাকছে। গিয়ে ঘুম দিই। দেখা যাক, আগামীকাল সকালে ব্যাপারটাকে বাস্তব মনে হয়, নাকি অবাস্তব।'

২৮

স্টাব চলে যাবার পর বুলওয়ার্কে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ক্যাপটেন আহাব। তারপর প্রহরারত এক নাবিককে নিচে পাঠাল তার হাড়ের টুল আর পাইপটা আনতে। পাইপ এলে সেটাকে বিনাকলের বাতিতে ধরিয়ে, টুলে বসে ধূমপান করতে লাগল সে।

শোনা যায়, প্রাচীন কালে ডেনিশ রাজারা নাকি তাদের সিংহাসন তৈরি করত নারহোয়ালের দাঁত দিয়ে। এখন, এই প্রায়ান্ধকারে, হাড়ের টুলে বসে থাকা ক্যাপটেন আহাবকে দেখলে কেউ মনে করতে পারে সে বুঝি ওই প্রাচীন রাজাদের উত্তরসুরি।

ক্যাপটেনের পাইপ থেকে বেরোনো রাশি রাশি ধোঁয়া বাতাসে ফিরে এসে ঝাপটা মারতে লাগল তারই মুখে। অবশেষে পাইপে টান দিয়ে সে স্বগতোক্তি করে উঠল, 'কই, ধূমপান তো আর শান্তি দিচ্ছে না। যা শান্তি দেয় না, তাকে কি কাছে রাখার কোন যুক্তি আছে? তাহলে আর কী কাজ এই পাইপে? আমি আর ধূমপান করব না আজ থেকে–'

জ্বলন্ত পাইপটা পানিতে ছুঁড়ে দিল সে। তারপর পাউচ হ্যাট মাথায় চাপিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

২৯

পর দিন সকালে ফ্লাস্কের সাথে আলাপ জুড়ল স্টাব।

'এরকম অদ্ভুত স্বপ্ন আমি কখনও দেখিনি। জানোই তো, বুড়ো ক্যাপটেনের একটা পা মাছের হাড়ের। সেই পা দিয়ে সে একটা লাথি মারল

আমাকে। পাল্টা লাথি মারতে গিয়ে দেখি এক অবাক কাণ্ড। বিশ্বাস করো, দেখি কি, আহাব যেন একটা পিরামিড হয়ে গেছে। আমি বোকার মত সেখানেই লাথি মেরে চললাম। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার কি জানো, ফ্লাস্ক– স্বপ্ন যে কত অদ্ভুত হতে পারে– লাথি মারতে মারতে একসময় মনে হলো, আরে, কেন অযথা রাগ করছি! সে তো আসল পা দিয়ে লাথি মারেনি, মেরেছে কৃত্রিম পা দিয়ে। আসল পা আর কৃত্রিম পার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সেজন্যেই বেতের চেয়ে একটা ঘুসি পঞ্চাশ গুণ বেশি ব্যথা দেয়। যে-জিনিসে প্রাণ আছে, সেটাই জলজ্যান্ত অপমানের সৃষ্টি করে। সুতরাং তার লাথিটাকে ঠিক লাথি বলা চলে না, ওটা অনেকটা বেত মারার মতই। কৃত্রিম পা-টা দেখেছ, নিচের দিকটা কেমন সরু? ওই পায়ের লাথিতে অপমানিত হবার মত কিছু নেই। কিন্তু কোন চাষা যদি লাথি মারত তার গোদা পা দিয়ে, দারুণ অপমানের ব্যাপার ছিল। যাই হোক এবার ঘটল এক মজার ঘটনা। ব্যাজারের মত চুলঅলা বুড়ো এক মৎস্যমানব কোত্থেকে হাজির হয়ে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এখানে কি করছ?" আমি তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, আপনাকে তো লাথি মারিনি বোধ হয়। "জ্ঞানী স্টাব," বলল সে, তারপর বিড়বিড় করে একই কথা বলেই চলল। বুড়ো এই একনাগাড়ে 'জ্ঞানী স্টাব' বলা থামাবে না বুঝতে পেরে আবার পিরামিডটাকে লাথি মারতে উদ্যত হলাম। কিন্তু যেই না পা তুলেছি, গর্জে উঠল বুড়ো, "থামো, থামো বলছি!" বললাম, ব্যাপার কি বুড়ো মিয়া? সে বলল, "এসো, তোমার বিষয়ে একটা আলোচনা করা যাক। ক্যাপটেন আহাব তোমাকে লাথি মেরেছে, তাই না?" হ্যাঁ, জবাব দিলাম। "সে লাথি মেরেছে তার কৃত্রিম পা দিয়ে, তাই না?" আবার বুড়োর প্রশ্ন। হ্যাঁ, একই জবাব আমার। "তাহলে তো তোমার রাগ করার কোন কারণই দেখছি না," মাথা ঝাঁকাল বুড়ো। "একে তোমাকে লাথি মেরেছে বিখ্যাত এক মানুষ, তার ওপর মাছের হাড়ে তৈরি চমৎকার পা দিয়ে। এটা একটা সম্মান। হ্যাঁ, আমি এটাকে সম্মানের ব্যাপারই মনে করি। শোনো, জ্ঞানী স্টাব। প্রাচীন ইংল্যাণ্ডে বড় বড় জমিদাররা রানীর হাতে চড় খাওয়াটাকে মহা সম্মানের ব্যাপার মনে করত। এই চড়ের বিনিময়ে অনেকে এমনকি 'নাইট' উপাধিও বাগিয়ে নিয়েছে। তো, রানীর চড় খেয়ে তারা যেমন নাইট হত, আহাবের লাথি খেয়ে তুমি তেমনি জ্ঞানী হলে। এবার যা বলছি, মন দিয়ে শোনো। মাঝে মাঝে তার লাথি খাবে, কিন্তু ভুলেও পাল্টা লাথি মারার চেষ্টা করবে না। কারণ, তাতে কোন লাভ হবে না। পিরামিড তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ।" কথা শেষ করে অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে সে চলে গেল বাতাসে সাঁতরাতে সাঁতরাতে। নাক ডেকে চিৎ হতেই ঘুম ভেঙে গেল আমার। দেখি, শুয়ে আছি হ্যামকে। এখন বলো, ফ্লাস্ক, স্বপ্নটা কেমন মনে হলো?'

'ঠিক বলতে পারব না। তবে কেমন যেন অর্থহীন।'

'হতে পারে। হতে পারে। কিন্তু এই স্বপ্ন সত্যিই আমাকে জ্ঞান দিয়েছে। ওই দেখো, পাশ ফিরে সাগরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আহাব। সবচেয়ে ভাল কাজ কি জানো, ফ্লাস্ক? বুড়োকে একা থাকতে দেয়া। সে যা-ই বলুক, কখনও তার জবাব দেবে না। আরে! কী বলে চেঁচাচ্ছে বুড়ো? শোনো!'

'মাস্তুল থেকে দেখো! তীক্ষ্ণ চোখে দেখো সবাই! তিমির সন্ধান পাওয়া গেছে! সাদা কোন তিমি দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে!'

'ঘটনাটা কেমন মনে হচ্ছে, ফ্লাস্ক? অদ্ভুত না? শুনতে পেয়েছ– সাদা তিমি। সত্যিই বিশেষ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবার। এই সাদা তিমির কথাই সম্ভবত আহাবের মনে দগদগে ঘা হয়ে আছে। কিন্তু– ওরে বাবা, ক্যাপটেন যে এদিকেই আসছে!'

৩০

হোয়েল-শিপের অফিসারদের মধ্যে এমন একটা পদ রয়েছে, যা আর কোনরকম নৌযানেই নেই।

দু'শো বছর কি তারও আগে ডাচ ফিসারিতে হোয়েল-শিপের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ক্যাপটেনের হাতে ছিল না। অর্ধেক কর্তৃত্ব ছিল আরেকজন অফিসারের, যাকে বলা হত– স্পেকসিগুার। এই পদ প্রধান হারপুনারের সমকক্ষ। তখন ক্যাপটেন দেখত জাহাজের নেভিগেশন আর সাধারণ ব্যবস্থাপনার দিকটা, তিমি শিকার এবং তার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কিছুর কর্তৃত্ব ছিল স্পেকসিগুার বা প্রধান হারপুনারের। ব্রিটিশ গ্রীনল্যাণ্ড ফিসারিতে স্পেকসিগুার নামে ডাচ সেই পদটা এখনও বহাল রয়েছে বটে, কিন্তু তার আগের মর্যাদা আর নেই। এখন সে ক্যাপটেনের নিম্নপদস্থ কর্মচারী মাত্র। তবে এ-কথা অনস্বীকার্য, তিমি শিকারের সফলতা অনেকটাই হারপুনারদের ওপর নির্ভর করে।

৩১

এখন দুপুর। স্টুয়ার্ড মাথা বের করে জানাল, ডিনার রেডি। বসে বসে অক্ষাংশের চার্ট দেখছিল ক্যাপটেন আহাব। এমনই গভীর তার মনোযোগ, যেন শুনতেই পায়নি স্টুয়ার্ডের ডাক। কিন্তু না। ডেকে এসে 'ডিনার, মি. স্টারবাক' বলেই আবার কেবিনে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সুলতানের পদশব্দ মিলিয়ে যেতে উঠল প্রধান আমীর– স্টারবাক, বিনাকলে চোখ লাগিয়ে 'ডিনার, মি. স্টাব' বলেই নামতে লাগল নিচে।

দ্বিতীয় আমীর স্টাব তখন দড়িদড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল। গুরুত্বপূর্ণ দড়িটাতে বেশ জোরে শেষ একটা টান দিয়ে ডিনার, 'মি. ফ্লাস্ক' বলেই সে পিছু নিল স্টারবাকের।

কোয়ার্টার-ডেকে একা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তৃতীয় আমীর ফ্লাস্ক। তারপর একটা হর্নপাইপে ফুঁ দিয়ে, ক্যাপ খুলে দ্রুত পা বাড়াল সামনে। শেষে গেলেও তাকেই আবার ফিরতে হবে সবচেয়ে আগে।

৩২

চমৎকার আবহাওয়ায় অন্যান্য নাবিকদের মতই পর্যায়ক্রমে আমারও এল মাস্ট-হেডে দাঁড়ানোর পালা।

আমেরিকার প্রায় সব হোয়েল-শিপ বন্দর ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে লোক তুলে দেয় মাস্ট-হেডে। হাজার হাজার মাইল অভিযান শেষে চার-পাঁচ বছর পর জাহাজ আবার একেবারে বন্দরে ঢুকে পড়তে বাড়তি আরেকটা তিমি পাবার আশা ত্যাগ করে মাস্ট-হেড থেকে নেমে আসে লোক।

খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সর্বপ্রথম মাস্ট-হেডে দাঁড়ানো শুরু করে মিশরীয়রা। তারপর যুগে যুগে অনেক বিখ্যাত মানুষও ওখানে দাঁড়িয়েছেন। নেপোলিয়ন, ওয়াশিংটন; নেলসন দাঁড়িয়েছেন মাস্ট-হেডে। ক্যাপটেন পীট তো বই লিখেছেন মাস্ট-হেডে দাঁড়াবার অভিজ্ঞতা নিয়ে। পীট ওখানে উঠতেন রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে। গুলি করে নারহোয়েল মারতেন।

এখন যারা মাস্ট-হেডে দাঁড়ায়, তারা যেন ধাতব মানুষ– লোহা কিংবা ব্রোঞ্জে তৈরি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা দাঁড়িয়ে থাকে একশো ফুট ওপরে, বৃষ্টি-বাদল-রোদ কিছুই তারা পরোয়া করে না, তিমি চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

৩৩

সাগরে পাইপ ফেলে দেয়ার ক'দিন পর সকালের নাস্তা সেরে ক্যাপটেন আহাব ডেকে এল। জাহাজের ক্যাপটেনরা সাধারণত পায়চারি করে এখানে, ঠিক যেমন গ্রাম্য কোন ভদ্রলোক নাস্তার পর পায়চারি করে বাগানে।

আহাব এখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। মেইনমাস্ট কিংবা বিনাকলের কাছে গিয়ে বাঁক নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তাগুলোও যেন বাঁক নিচ্ছে, চলার বেগে যেন বেড়ে যাচ্ছে চিন্তার বেগ।

'লক্ষ করেছ, ফ্লাস্ক?' ফিসফিস করে বলল স্টাব; 'ওর ভেতরের মুরগির বাচ্চাটা ঠোকর দিচ্ছে খোসায়। বাচ্চা ফুটবে বলে।'

সময় গড়িয়ে চলল। কখনও কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করল আহাব, আবার কখনও ডেকে এসে পায়চারি করতে লাগল।

একসময় দিন প্রায় শেষ হয়ে এল। হঠাৎ বুলওয়ার্কের পাশে থেমে জাহাজের সবাইকে এখানে উপস্থিত করতে স্টারবাককে আদেশ দিল আহাব।

'স্যার!' বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এল চীফ মেটের গলা দিয়ে। অত্যন্ত জরুরী কোন প্রয়োজন ছাড়া জাহাজের সবাইকে ডাকা হয় না।

'যা বলছি তা-ই করো,' গমগম করে উঠল আহাবের স্বর। 'সবাইকে হাজির করো এখানে। মাস্ট-হেড, তোমরাও নেমে এসো!'

সবাই এসে দেখল, ক্যাপটেনের মুখ থমথম করছে ঝড়-পূর্ব দিগন্তের মত।

BanglaBook.org

একবার বুলওয়ার্কের ওপর দিয়ে সাগর, একবার নাবিকদের দিকে তাকাতে তাকাতে অনবরত পায়চারি করছে আহাব, নাবিকদের মধ্যে যে ফিসফিসানি শুরু হয়েছে সেদিকে কোন লক্ষ নেই। ফ্লাস্কের কানে কানে স্টাব বলল, 'ক্যাপটেন বুঝি সবাইকে এখানে ডেকেছে পায়চারির নানারকম কৌশল দেখাতে।'

কিন্তু না, পায়চারির কায়দা দেখাবার জন্যে কাউকে এখানে ডেকে আনেনি ক্যাপটেন আহাব। ঝট করে থেমে সে বলল, 'যখন তোমরা কোন তিমি দেখতে পাও, তখন কি করো?'

'চিৎকার করে সংবাদটা জানিয়ে দিই সবাইকে!' সমবেত কণ্ঠে জবাব দিল নাবিকরা।

'বেশ!' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে কথাটা বলে নাবিকদের দেখতে লাগল আহাব, তার অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা নাবিকদের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে বোঝার চেষ্টা করছে।

'সংবাদ দেয়ার পর তোমরা কি করো?'

'নৌকো নামিয়ে ধাওয়া করি তিমিকে!'

'ধাওয়া শেষে ফিরে আসো কি নিয়ে?'

'হয় মরা তিমি নয়তো ভাঙাচোরা নৌকো নিয়ে!'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল আহাব, 'মাস্ট-হেডাররা আমার মুখে সাদা একটা তিমির কথা নিশ্চয় শুনেছ। এক আউন্সের এই স্প্যানিশ স্বর্ণমুদ্রাটা দেখতে পাচ্ছ সবাই?' চকচকে একটা মুদ্রা সে তুলে ধরল ওপরদিকে, 'এটা ষোলো ডলারের একটা মুদ্রা। দেখতে পাচ্ছ? মি. স্টারবাক, তোমার হাতুড়িটা দাও।'

জ্যাকেটের কোনা দিয়ে মুদ্রাটা ঘষতে লাগল আহাব, যেন ঔজ্জ্বল্য আরও বাড়াতে চায়। কণ্ঠে তার চাপা এক দুর্বোধ্য গুঞ্জন, যেন ওটা কোন মানুষের স্বর নয়, ভেতরের যে-জটিল যন্ত্রে মানুষ পরিচালিত হয়, সেই যন্ত্রই যেন তুলছে শব্দটা।

স্টারবাকের কাছ থেকে হাতুড়িটা নিয়ে মেইনমাস্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াল আহাব। এক হাতে হাতুড়ি আরেক হাতে মুদ্রাটা ওপরে তুলে ধরে বলল, 'তোমাদের মধ্যে যে ওই কোঁচকানো চোখ আর বাঁকা চোয়ালের তিমিটাকে এনে দিতে পারবে, যে এনে দিতে পারবে সেই সাদা তিমি যার লেজে রয়েছে তিনটে ফুটো, সে-ই পাবে এই এক আউন্সের স্বর্ণমুদ্রা!'

হৈ হৈ করে উঠল নাবিকের দল।

'মনে রেখো, 'তিমিটা সাদা,' আবার বলে উঠল আহাব। 'সাদা তিমি। যদি দেখতে পাও সাদা পানি, এমনকি পানির নিচে যদি চোখে পড়ে সাদা কোন বুট্টগদ, চেঁচিয়ে উঠো গলা ফাটিয়ে।'

অন্যান্যদের চেয়েও বেশি কৌতূহল এবং বিস্ময় নিয়ে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল ট্যাসটেগো, ডাগ্‌গু আর কুইকেগ; তিমির কোঁচকানো চোখ আর বাঁকা চোয়ালের উল্লেখে নড়েচড়ে উঠল ওরা।

'ক্যাপটেন আহাব,' বলল ট্যাসটেগো, 'এটাই তাহলে নিশ্চয় সেই সাদা তিমি,

BanglaBook.org

অনেকে যেটাকে মবি ডিক বলে ডাকে।'

'মবি ডিক?' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপটেন আহাব। 'তাহলে– তাহলে কি সাদা তিমিটাকে তুমি দেখেছ, ট্যাস?'

'পানিতে ডুব দেয়ার আগে তিমিটা কি অদ্ভুতভাবে লেজ নাড়ায়?' জানতে চাইল উৎসুক গে-হেডার।

'তার স্পাউটটাও কি অদ্ভুত, ক্যাপটেন আহাব?' জানতে চাইল ডাগ্‌গু।

'আর তার লেজের পেছনদিকে কি ঢুকে আছে তিনটে লোহা, ক্যাপটেন?' চোখ বড় বড় করল কুইকেগ।

'হ্যাঁ, কুইকেগ, হারপুন ভেঙে ঢুকে আছে তার ভেতরে; হ্যাঁ, ডাগ্‌গু, তার স্পাউটটা অদ্ভুত, অন্যান্য তিমির চেয়ে অনেক বড়; হ্যাঁ, ট্যাসটেগো, ডুব দেয়ার আগে সে অদ্ভুতভাবে লেজ নাড়ায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মবি ডিককেই দেখেছ তোমরা!'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে স্টাব আর ফ্লাস্কের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল স্টারবাক, কিন্তু তিমিটার নামের উল্লেখে যেন খুলে গেল রহস্যের সমস্ত দুয়ার। সে বলল, 'ক্যাপটেন আহাব, মবি ডিকের নাম আমি শুনেছি– এই মবি ডিকই কি আপনার পা কেটে নেয়নি?'

'কোথায় শুনলে তুমি একথা?' চেঁচিয়ে উঠল আহাব; একটু থেমে বলল, 'হ্যাঁ, স্টারবাক, ঠিকই শুনেছ তুমি। প্রিয় নাবিকেরা, তোমরাও শোনো– এই মবি ডিকই কেটে নিয়েছে আমার পা। হ্যাঁ, এই সেই অভিশপ্ত তিমি, যে আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, কর্মক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অকালে বুড়ো বানিয়েছে আমাকে!' দু'হাত ওপরে ছুঁড়ে দিল আহাব, কণ্ঠে ভর করল অস্বাভাবিক হিংস্রতা। 'কিন্তু আমিও ওকে ছাড়ব না। ধাওয়া করে যাব গুড হোপে, যাব হর্নে, যাব নরওয়ের মেইলস্ট্রোমে, প্রয়োজনে যাব নরকের লেলিহান অগ্নিশিখার পাশে। আর, এজন্যেই তোমাদের এই জাহাজে তুলেছি আমি। আমার সঙ্গে সাদা তিমিটাকে ধাওয়া করে যাবে তোমরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, যতক্ষণ না ওর নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে পানির বদলে কালো রক্ত! কী, তোমরা যাবে না আমার সঙ্গে? দেখে তোমাদের তো সাহসীই মনে হচ্ছে।'

'যাব, যাব!' চেঁচিয়ে উঠে উত্তেজিত বুড়োর আরও কাছে চলে এল নাবিক আর হারপুনাররা। 'খোঁজো সাদা তিমিকে, বর্শায় ধার দাও মবি ডিকের জন্যে!'

'ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। স্টুয়ার্ড, নিয়ে এসো গ্রগের পাত্র! এই যে, মি. স্টারবাক, তোমার মুখটা অমন ঝুলে পড়েছে কেন? সাদা তিমির পিছু নিতে চাও না? শিকার করতে চাও না মবি ডিককে?'

'নিশ্চয় চাই, ক্যাপটেন আহাব। এসব ব্যাপারে মৃত্যুর চোয়ালের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতেও ভয় পাই না আমি। কিন্তু সাগরে জাহাজ ভাসিয়েছি আমরা তিমি শিকার করতে, কারও প্রতিহিংসা চরিতার্থে সাহায্য করার জন্যে নয়। প্রতিহিংসা চরিতার্থ হলেই বা কত ব্যারেল তেল পাবেন, ক্যাপটেন আহাব? ন্যানটাকেটের বাজারে ওটা খুব বেশি দামে বিকোবে না।'

'লাভ-ক্ষতির কথা বলছ? পৃথিবীতে লাভ-ক্ষতিই সব নয়। তবু শুনে রাখো, যদি আমার ইচ্ছে পূরণ হয়, বড়সড় পুরস্কারই মিলবে।'

'ওই দেখো বুকে ঘুসি মারছে,' ফিসফিস করে বলল স্টাব, 'কিন্তু কেন? বুকটা বড়ই তবে ভেতরটা তো ফাঁপা মনে হচ্ছে।'

'একটা বোবা জন্তুর ওপর প্রতিহিংসা!' ধিক্কার দিল স্টারবাক। 'এই আবেগ সম্পূর্ণ অন্ধ! এ উন্মাদনা! বোবা কোন জিনিসের ওপর রাগ করা, ক্যাপটেন আহাব, নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'নাস্তিকতার কথা আমাকে বোলো না। সূর্য যদি অপমান করে, সূর্যকেও আমি আঘাত হানব। ঈর্ষা, রাগ কোন্ মানুষটার নেই? ওই সাদা তিমির মধ্যে রয়েছে অবর্ণনীয় একটা কিছু, আর সেটাকেই আমি ঘৃণা করি। এই ঘৃণার শেষ আমাকে দেখতেই হবে। এ-ব্যাপারে সবাই আমার সঙ্গে একাত্মতা প্রদর্শন করেছে। স্টারবাক, এদের দলে তুমিও যোগ দাও। সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে চারাগাছ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। স্টারবাক, কিছু একটা বলো। (একপাশে মুখ ঘুরিয়ে আপন মনে) হুঁ, মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। খোলাখুলি বিদ্রোহ ঘোষণা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে যাবার সাহস পাবে না।'

'ঈশ্বর আমাদের সবার দিকে লক্ষ রাখেন!' চোখ বুজে অত্যন্ত বিনয়ীভাবে বলল স্টারবাক।

আহাব কথাটা খেয়ালই করল না। চেঁচিয়ে বলল, 'স্টুয়ার্ড, কই, মদ নিয়ে এসো! গ্রগ, গ্রগ!'

স্টুয়ার্ডের হাত থেকে কানায় কানায় ভরা পিউটার নিয়ে হারপুনারদের দিকে ফিরল ক্যাপটেন আহাব, 'যার যার অস্ত্র নিয়ে এসো।' সবাই অস্ত্র আনলে তাদের নিয়ে নোঙরের কাছে এল সে।

'নাও, এবার হাত বদল করে খাও,' সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো নাবিকের দিকে পিউটার এগিয়ে দিল ক্যাপটেন আহাব।

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে তিন মেটের হাবভাব লক্ষ করছিল ক্যাপটেন আহাব। স্টাব আর ফ্লাস্ক মুখ ঘুরিয়ে আছে, স্টারবাক তাকিয়ে আছে নিচের দিকে।

'বৃথা চেষ্টা!' গর্জে উঠল আহাব। 'আমার প্রভাব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ? ভাল; হয়তো আমার আর আগের তেজ নেই, অজান্তে কখন ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গেছে বিদ্যুৎ। তবে সাবধান, অল্প বিদ্যুতেও কিন্তু মানুষ মরে। যাকগে,' ফিরল সে হারপুনারদের দিকে, 'তোমাদের ভেতর থেকেই আমি বেছে নেব সহযোগী। এবার অস্ত্রের হাতল খুলে ফেলো।'

ক্যাপটেনের নির্দেশ মত কাঠের হাতল খুলে, হারপুনের লোহার অংশটা হাতে দাঁড়িয়ে রইল তিন হারপুনার।

হারপুনের সকেট কানা পর্যন্ত ভরে দিয়ে ক্যাপটেন আহাব বলল, 'খাও! খাও আর শপথ করো, মৃত্যু দেখবে মবি ডিকের! মনে রেখো, মবি ডিককে শিকার করতে না পারলে ঈশ্বর আমাদের সবাইকে শিকার করবেন!'

তিমির বিরুদ্ধে আস্ফালন করতে করতে পাত্র খালি করে দিল তিন হারপুনার। ফ্যাকাসে মুখে অন্যদিকে চেয়ে শিউরে উঠল স্টারবাক। সবাইকে বিদায় করে দিয়ে কেবিনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল ক্যাপটেন আহাব।

BanglaBook.org

সেদিন নাবিকদের সঙ্গে আমিও ছিলাম, নাবিকদের সঙ্গে সঙ্গে গলা আমারও চড়ে যাচ্ছিল। নির্দিষ্ট ওই তিমিটার বিরুদ্ধে আহাবের অনন্ত প্রতিশোধ স্পৃহা আমার মধ্যেও জাগিয়ে তুলেছিল প্রতিহিংসা।

ইতিমধ্যে আহাব ছাড়া অন্যান্য জাহাজের আরও অনেকেই মবি ডিককে দেখেছে। পিছুও নিয়েছে। কিন্তু মবি ডিক প্রতিবারই সাফল্যের সঙ্গে এড়িয়ে গেছে তাদের, আর যাবার আগে কাউকে মেরে গেছে নয়তো জখম করেছে মারাত্মকভাবে। ধীরে ধীরে অতি হিংস্র এই তিমিটার ব্যাপারে একটা আতঙ্ক জন্ম নিয়েছে তিমি শিকারীদের মনে।

অবশ্য স্পার্ম তিমি জন্মগতভাবেই অন্য প্রজাতির তিমিদের তুলনায় হিংস্র। ওলাসেন আর পভেলসেন নামের দুই প্রকৃতিবিদ ঘোষণা দিয়েছেন– স্পার্ম তিমি কেবল অন্যান্য প্রাণীর কাছে আতঙ্কজনকই নয়, সে রীতিমত রক্তপিপাসু, বিশেষ করে মানুষের রক্ত। ব্যারন কিউভিয়ার তাঁর ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে লিখেছেন– স্পার্ম তিমিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মাছ, এমনকি হাঙরও দিগ্বিদিক্‌হারা হয়ে ছুটতে থাকে, আর এভাবে ছুটতে গিয়ে অনেক সময় পাথরে ধাক্কা লেগে প্রাণত্যাগ করে। এসব বই পড়ে তিমি শিকারীদের আতঙ্ক আরও বেড়ে গেছে।

সাদা কোঁচকানো কপাল আর সাদা কুঁজের কারণে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবেই তিমিটার নাম হয়ে গেছে– সাদা তিমি। অন্যান্য তিমির সঙ্গে এই রঙের পার্থক্যের জন্যেই এটার পিছু নিয়েছে বিভিন্ন তিমি শিকারী, কিন্তু সবাই ফিরেছে দুঃস্বপ্ন নিয়ে। মবি ডিকের এই ভয়ঙ্করত্ব দিনে দিনে কুসংস্কারের জন্ম দিয়েছে। একই সঙ্গে নাকি তাকে দেখা যায় নানা জায়গায়, তাই নাম হয়ে গেল– সর্বত্র বিরাজমান। হারপুন লেগেও জ্যান্ত পালিয়ে যাওয়ায় কিছু কিছু তিমি শিকারী আরও এক কাঠি এগিয়ে তার নাম রাখল– অমর। মানুষের তৈরি অস্ত্রে নাকি তার মৃত্যু অসম্ভব।

এরই মধ্যে মবি ডিকের মুখোমুখি হলো এক লোক। তার তিনটে নৌকো চিবিয়ে ছাতু করার পর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে ছুটে গেল মাত্র ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা ছুরি নিয়ে। লোকটার নাম ক্যাপটেন আহাব। কাছে যেতেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল তিমিটা, এক কামড়ে কেটে নিল একটা পা। পাগড়ি পরা কোন তুর্কী, মালয়ী কিংবা ভেনিশিয়ান এই কাজ করলে হয়তো এতটা বিদ্বেষ অনুভব করত না আহাব। যাই হোক, এই মারাত্মক দুর্ঘটনার পর থেকে বন্য এক প্রতিহিংসা পুষে রেখেছে আহাব। আর এই প্রতিহিংসা থেকেই সে আক্রান্ত হয়েছে মনোম্যানিয়ায়।

তবে এই মনোম্যানিয়া তার মধ্যে একদিনে বেড়ে ওঠেনি। ছুরি নিয়ে তিমির দিকে ছুটে গিয়েছিল সে জান্তব একটা আবেগ থেকে, ফলে পা কেটে নেয়ার সময় শারীরিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করেনি। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে মাসের পর মাস আহাবকে যখন হ্যামকে শুয়ে থাকতে হয়েছে, শরীরের পাশাপাশি রক্তক্ষরণ হয়েছে তার মনে। মাঝে মাঝে সাময়িক বিরতি ছাড়া আহাব পরিণত

হয়েছে বদ্ধ উন্মাদে। তখন ঘোরে ঝিম মেরে থেকেছে সে, জেগে উঠলেই ঘটেছে উন্মাদনার বিস্ফোরণ। শেষমেশ নাবিকরা বাধ্য হয়েছে তাকে বেঁধে রাখতে। এক সময় জাহাজ এসে পৌঁছেছে কেপ হর্নে। হঠাৎ করেই ঘোর কমে গেছে তার, আবার নাবিকদের সে দিতে শুরু করেছে স্বাভাবিক আদেশ। ক্যাপটেনের সুস্থতায় হাঁপ ছেড়েছে জাহাজের সবাই। আসলে ক্যাপটেন কিন্তু মোটেই সুস্থ হয়নি। স্বাভাবিকতার পোশাক পরে আহাব তখন আরও বড় উন্মাদ, তার জগৎ তখন কেবলই এক সাদা তিমির জগৎ। উন্মাদনা জিনিসটাই এমন। যখন সবাই ভাবে যে রোগী ভাল হয়ে গেছে, তখন সে সুস্থতার ছদ্মবেশে আরও বড় উন্মাদ।

মনোম্যানিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন একটা বিষয়ে উন্মাদ হয়ে ওঠে। আহাবও তা-ই হয়েছে, মবি ডিক ছাড়া আর কোন কথা সে ভাবতে পারে না। এবারে সে অভিযানে বেরিয়েছে একটামাত্র উদ্দেশ্যে– সাদা তিমিটাকে শিকার করতে। পুরানো বন্ধুরা ঘুণাক্ষরেও এ-কথা জানলে তাকে জাহাজ ভাসাতেই দিত না। তারা সবাই সুস্থ মানুষ, স্বাভাবিক হিসেব বোঝে। তারা আশা করে আছে, চার-পাঁচ বছর পর ফিরে আসবে পেকোড, ব্যাঙ্কে জমা পড়বে আরও একরাশ ডলার। কিন্তু কাউকে লাভ করিয়ে দেয়ার জন্যে ক্যাপটেন আহাব এবার জাহাজ নিয়ে বেরোয়নি, সে বেরিয়েছে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে।

সাদা সেই তিমির সন্ধানে বুড়ো এখন চষে ফেলতে চায় সারা পৃথিবী। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে বিশাল শরীর নিয়ে এখন তার সামনে ভেসে রয়েছে মবি ডিক। নাবিক বাছাইটাও সেরেছে সে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে। তার নাবিকদের মধ্যে রয়েছে দলত্যাগী, বিধর্মী, বিপথগামী, নরখাদক। এরকম মানুষরা সাধারণত মানসিকভাবে দুর্বল হয়, আর সেটাই আহাবের প্রয়োজন। কারণ, দুর্বলরা কখনও বিদ্রোহ করতে পারে না। যে-তিনজন মানুষ আহাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারত, তারাও কোন কাজে আসেনি। ভাল-মন্দের বোধ রয়েছে স্টারবাকের, কিন্তু এই গুণ কার্যকর করার পক্ষে সে একেবারেই অযোগ্য, স্টাব রয়েছে তার রসিকতা নিয়ে, আর ফ্লাস্ক মানুষ হিসেবে খুবই সাধারণ।

কিন্তু কিভাবে একা ক্যাপটেন আহাব পারল এতগুলো মানুষকে প্রভাবান্বিত করতে? তার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সবাইই যেন মনে হচ্ছে, সাদা ওই তিমি তাদের জন্মান্তরের শত্রু। ক্যাপটেন আহাবের ঘৃণা সঞ্চারিত হয়েছে তাদের মধ্যে, জ্বলে উঠেছে সবাই ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসায়। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব? বুঝি না। আমি বুঝি না। এসব বুঝতে হলে চাই ইসমাইলের চেয়ে অনেক গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। সুতরাং আপাতত নিজেকে ছেড়ে দিতে চাই আমি স্থান আর কালের হাতে। ছুটছে সবাই, ছুটছে প্রকাণ্ড এক তিমির খোঁজে– যার মধ্যে তারা দেখতে পাচ্ছে কেবল ওত পাতা এক মারাত্মক অশুভ সত্তা।

৩৫

আহাবের দৃষ্টিতে সাদা তিমিটা কেমন, তার একটা আভাস দিয়েছি; কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ওটা কেমন, তা এখনও বলা হয়নি।

কুইকেগকে সাহায্য করতে করতে এসব অদ্ভুত কথা ভাবছি, হঠাৎই কানে এল শব্দটা। তারপরই ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল ট্যাসটেগো। মাথা তুলে দেখি সামনে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে গে-হেডার, যেন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে নিয়তির আগমনবার্তা।

'ওই যে ডাকছে! ওখানে! ওখানে! ওখানে! ডাকছে! সে ডাকছে!'

'কোথায়? কোন্‌দিকে?'

'জাহাজের পেছনে, মাইল দুয়েক দূরে! পুরো এক ঝাঁক!'

ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল সারা জাহাজে।

ঘড়ির টিক টিক করে চলার মত শব্দ তোলে স্পার্ম তিমি, ফলে তার উপস্থিতি নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে হোয়েলম্যানরা।

'ওই যে লেজ!' আবার চেঁচাল ট্যাসটেগো, আর তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল তিমির ঝাঁক।

'তাড়াতাড়ি, স্টুয়ার্ড!' বলল আহাব। 'সময়! সময়!'

ছুটে গিয়ে ঘড়ি দেখে এসে নিখুঁত সময় জানাল স্টুয়ার্ড।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি আমরা। পেছনে ডুবেছে যখন খুব সম্ভব জাহাজের সামনে ভেসে উঠবে তিমিগুলো। আমাদের উপস্থিতির কথা জানতে পারেনি ওগুলো।

কিন্তু এই সময়ে কার যেন একটা বিস্ময়ধ্বনি শুনে চোখ ফেরাল সবাই। অবাক হয়ে দেখল, যেন বাতাস থেকে তৈরি হওয়া কুয়াশার মত পাঁচটা মূর্তি ঘিরে রয়েছে ক্যাপটেন আহাবকে।

৪১

ডেকের উল্টো পাশে দাঁড়ানো ভৌতিক মূর্তিগুলো খুলতে লাগল ওখানে বাঁধা নৌকোটা। স্টারবোর্ড কোয়ার্টারে থাকে বলে এটাকে ক্যাপটেনের নৌকো বলে। বোর দিকে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটা কালো। লম্বা, সাদা একটা ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে আছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। মাথায় একটা পাগড়ি। অন্য চারজন অতটা কালো নয়, চামড়ার রঙ অনেকটা বাঘের মত হলুদ। ফিলিপাইনের আদিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়।

জাহাজের সবাই যখন তাকিয়ে রয়েছে হতবাক হয়ে, সাদা পাগড়িঅলা লোকটার উদ্দেশে আহাব বলল, 'সব তৈরি, ফেদাল্লা?'

'তৈরি,' জবাব এল খসখসে গলায়।

'তাহলে নামাও। শুনতে পাচ্ছ, সবাই, নৌকো নামাও।'

নামিয়ে দেয়া হলো তিনটে নৌকো। সেগুলো পানির সংস্পর্শে আসতে না আসতেই পাঁচ মূর্তিসহ পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল ক্যাপটেনের নৌকো। স্টার্নে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে স্টারবাক, স্টাব আর ফ্লাস্ককে তাদের নৌকো নিয়ে বিরাট একটা জায়গা বেড় দিয়ে এগিয়ে যেতে বলল আহাব। কিন্তু তখনও তারা

BanglaBook.org

'যা-ইচ্ছে বলো, বন্ধু, কিন্তু আমি ভুল শুনিনি।'

'হুঁ, এতক্ষণে মনে পড়েছে। তুমিই তো সেই লোক, যে পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে বুড়ির উল বোনার শব্দ শুনতে পায়।'

'টিটকারি করছ? করো। শিগগিরই বোঝা যাবে, ওটা কিসের শব্দ। এই শব্দের কথা নিশ্চয় আমাদের মোঘলও জানে। এক সকালে স্টাবও ফিসফিস করে ফ্লাস্ককে বলছিল, বাতাসে সে কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছে।'

'চুপ, বালতি!'

৩৭

ক্যাপটেন আহাব সবাইকে দিয়ে শপথ করিয়ে নেয়ার পর ঝড় উঠেছিল রাতে। তারপর যদি ক্যাপটেনকে কেউ অনুসরণ করত, তাহলে দেখতে পেত কোঁচকানো একটা হলুদ চার্ট টেবিলে বিছিয়ে নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করছে সে। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গাগুলোতে পেন্সিলের দাগ টেনে চিহ্নিত করছে জাহাজের পথ। কখনও আবার পাশ থেকে টেনে নিচ্ছে লগ-বুক, লক্ষ করছে অতীতে কখন কোন্ জাহাজ ওই অঞ্চলে স্পার্ম তিমি মেরেছিল বা দেখেছিল।

এসব দেখছে ক্যাপটেন আহাব, ওদিকে জাহাজের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে দুলছে মাথার ওপর ঝোলানো ভারী পিউটার বাতি। ক্যাপটেনের মুখের ওপর স্থানান্তরিত হচ্ছে আলো-ছায়া, যেন অদৃশ্য কোন পেন্সিল দাগ টেনে পথ চিহ্নিত করছে তার কোঁচকানো কপালের চার্টে।

শুধু ওই রাতেই নয়, প্রত্যেক রাতে চার্ট দেখতে লাগল আহাব। প্রায় রাতেই সে মুছে ফেলল পেন্সিলের অনেক দাগ, বসাল নতুন নতুন দাগ। হিসেব করছে আহাব, চুলচেরা হিসেব করছে, কিভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে তার প্রতিহিংসার আগুন।

যাঁরা তিমি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁদের মনে হবে, মহাসাগরের এই অগাধ জলরাশির বিশাল বিস্তারে নির্দিষ্ট একটা তিমিকে কি খুঁজে বের করা সম্ভব! কিন্তু আহাবের কাছে এটা মোটেই অসম্ভব নয়। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় মহাসাগরের প্রতিটা জলস্রোত সে চেনে। জানে, কখন কোথায় ভেসে যায় তিমির খাবার। খাবারের পিছু পিছু যেতে তিমি বাধ্য। তাই সে বুঝতে পারে, কোন্ ঋতুতে কোন্ এলাকায় এসে উপস্থিত হবে স্পার্ম তিমি।

সব দিক চিন্তা করেই ন্যানটাকেট থেকে সে জাহাজ ভাসিয়েছে অনেক আগে। হাতে রেখেছে অতিরিক্ত ৩৬৫ দিন। এতে ধীরেসুস্থে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করতে পারবে সে।

৩৮

তিমি শিকারের ভয়ঙ্করত্ব সম্বন্ধে মানুষের ধারণা খুবই ভাসা ভাসা। অবশ্য পরিষ্কার ধারণা না থাকার কারণও রয়েছে। অন্যান্য সব দুর্ঘটনার মত তিমি

শিকারের দুর্ঘটনা সংবাদপত্র খুললেই পাওয়া যায় না। স্পার্ম তিমি সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত রয়েছে। প্রায় সবাই বলে যে স্পার্ম তিমি ভীষণ হিংস্র। আমার নিজের মত হলো, সবসময়ে না হলেও কখনও কখনও স্পার্ম তিমি সত্যিই ভয়ঙ্কর।

১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ন্যানটাকেটের ক্যাপটেন পোলার্ড তার জাহাজ 'এসেক্স' নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়েছিল। একদিন ফোয়ারা দেখে নৌকো নামিয়ে পিছু নিল এক ঝাঁক তিমির। কিছুক্ষণের মধ্যেই আহত হলো বেশ কয়েকটা তিমি। কিন্তু হঠাৎই একটা তিমি ঝাঁক ছেড়ে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করল তার জাহাজ। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে পানিতে ভাসমান তক্তা ছাড়া জাহাজটার আর কিছুই আস্ত রইল না। নাবিকদের নিয়ে অবর্ণনীয় কষ্ট করে কোনমতে বাড়ি ফিরল ক্যাপটেন পোলার্ড। পরে আরেকটা জাহাজের ক্যাপটেন হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে আবার গেল সে। এবারে জাহাজ চুরমার হয়ে গেল ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে। সাগরে যাবার সাধ তার আর কখনোই হয়নি।

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ন্যানটাকেটেরই আরেক জাহাজ– ইউনিয়নকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল এক তিমি। কিন্তু সে-দুর্ঘটনার বিশদ বিবরণ আমি পাইনি।

এবার বলব আঠারো-বিশ বছর আগের একটা ঘটনা। স্যাণ্ডউইচ আইল্যাণ্ডের ওয়াহু বন্দরে নোঙর করা এক ন্যানটাকেট জাহাজের পার্টিতে হোয়েল-শিপের ক্যাপটেনদের সঙ্গে খোশগল্প করছিল আমেরিকান এক যুদ্ধজাহাজের কমোডর। কথায় কথায় সে বলল, জাহাজের ক্ষতি করার মত শক্তি তিমির আছে বলে সে বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে তার জাহাজের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করার ক্ষমতা তিমির নেই। কয়েক সপ্তাহ পর তার ক্ষতির অসাধ্য জাহাজ নিয়ে ভ্যালপ্যারাইজোর উদ্দেশে রওনা দিল কমোডর। মাঝপথে এক তিমি ভেসে উঠে জাহাজকে এমন এক ধাক্কা লাগাল যে গন্তব্যে যাবার আশা ত্যাগ করে নিকটস্থ বন্দরে জাহাজ ভিড়াতে বাধ্য হলো সে মেরামত করার জন্যে।

ক্যাপটেন ল্যাংসডর্ফের অভিযানের উল্লেখটাও করতেই হয়। ক্যাপটেন ল্যাংসডর্ফ ছিল রাশিয়ার অ্যাডমিরাল ক্রোসেনস্টার্নের বিখ্যাত আবিষ্কার অভিযানের সঙ্গে জড়িত। নিজের বইয়ের সপ্তদশ অধ্যায়ে ল্যাংসডর্ফ লিখেছে:

'১৯ মে আমাদের জাহাজ রওনা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো। পর দিন ওখোটস্ক যাবার উদ্দেশ্যে এসে পড়লাম খোলা সাগরে। আবহাওয়া মনোরম এবং আকাশ পরিষ্কার থাকলেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ফলে আমরা লোমের পোশাক পরতে বাধ্য হলাম। কয়েক দিন বাতাস বইল খুব ধীরে। কিন্তু রওনা দেয়ার উনিশ দিন পর জোর একটা বাতাস উঠল উত্তর-পশ্চিম থেকে। অতিকায় এক তিমি জাহাজের গতিপথেই ভেসে ছিল পানির প্রায় সমতলে। তিমিটা যখন আমাদের চোখে পড়ল, তখন জাহাজ প্রায় তার ওপরে উঠে পড়েছে। অত কম দূরত্বে জাহাজ ঘোরাবার উপায় ছিল না, উঠেই পড়ল ওটা তিমির পিঠে। উঁচু হলো তিমি, পুরো জাহাজটা পানি ছেড়ে উঠে গেল অন্তত তিন ফুট উঁচুতে। জাহাজ ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছে ভেবে আমরা সবাই ছুটে বেরিয়ে এলাম ডেকে। তিমিটা তখন ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে অন্যদিকে। ক্যাপ্টেন ডী'উলফ তখনই পরীক্ষা করল যন্ত্রপাতি।

সৌভাগ্যের বিষয়, জাহাজের কোন ক্ষতি হয়নি।

অতিকায় আকারের কারণে তিমিকে নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। ষোড়শ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপলে প্রোকোপিয়াস নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট বাস করতেন। তাঁর লেখা ইতিহাস জনসাধারণের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। সেই ইতিহাসে তিনি লিখেছেন, একদিন সামুদ্রিক এক দানব এসে আস্তানা গেড়েছিল প্রোপন্টিস অর্থাৎ সী অভ মারমারায়। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেই দানব অনেক সামুদ্রিক যানকে ধ্বংস করেছে। দানবটা কোন্ প্রজাতির, সে-সম্বন্ধে কিছু লেখেননি প্রোকোপিয়াস। আমার যত দূর মনে হয়, তাঁর বর্ণিত সেই সামুদ্রিক দানব আসলে একটা স্পার্ম তিমি ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩৯

প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আহাব বদ্ধপরিকর। তাই তার সাহায্যের প্রয়োজন। সাহায্য সে পেয়েছেও, মবি ডিককে মারার জন্যে শপথ করেছে সব নাবিক। কিন্তু উন্মাদনা থাকলেও বোকা নয় আহাব। সে জানে, পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, তার মধ্যে মানুষই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বিগড়ে যেতে পারে। স্টারবাক আপাতত তার ইচ্ছে মেনে নিয়েছে বটে, যে-কোন সময় সে যে বেঁকে বসবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

আহাব জানে, মানুষকে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে দিতে হয়। কেবল একটা জিনিসে মানুষকে আবদ্ধ রাখলে তার মনে বিক্ষোভ জমে, আর বিক্ষোভ থেকেই বিদ্রোহ। শৌর্যে-বীর্যে পরিপূর্ণ যে-ক্রুসেডারদের নাম মানুষ সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারণ করে, তারাও পদব্রজে দু'হাজার মাইল পেরোবার সময় সিঁদ কেটেছে, পকেট মেরেছে, নজর নিয়েছে অনেকের বাড়ি থেকে।

সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে পেকোডের কারও স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মে বাধা দেয়নি সে। তবে মাস্ট-হেডারদের সে বলেছে, একটা পরপয়েজ দেখতে পেলেও সে-সংবাদ জানাতে যেন তারা ভুল না করে। এবং কড়া এই প্রহরা কাজে লাগতে খুব বেশি দেরি হলো না।

৪০

বিকেলটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন, গুমোট। ডেকে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে নাবিকরা। কারও কারও দৃষ্টি নিবদ্ধ সীসে-রঙা পানির ওপর। এক পাশে বসে বসে একটা মাদুর বুনছি আমি আর কুইকেগ।

অবশ্য বুনছে কুইকেগ, আমি ওকে এটা-সেটা এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করছি। শুধু বোনার খসখস শব্দ ছাড়া পুরো জাহাজ স্তব্ধ। ভোঁতা এই শব্দ তুলে যেন তাঁত বুনে চলেছে সময়, আমাকে ব্যবহার করছে তার মাকু হিসেবে।

কুইকেগকে সাহায্য করতে করতে এসব অদ্ভুত কথা ভাবছি, হঠাৎই কানে এল শব্দটা। তারপরই ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল ট্যাসটেগো। মাথা তুলে দেখি সামনে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে গে-হেডার, যেন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে নিয়তির আগমনবার্তা।

'ওই যে ডাকছে! ওখানে! ওখানে! ওখানে! ডাকছে! সে ডাকছে!'

'কোথায়? কোন্‌দিকে?'

'জাহাজের পেছনে, মাইল দুয়েক দূরে! পুরো এক ঝাঁক!'

ছুটাছুটি শুরু হয়ে গেল সারা জাহাজে।

ঘড়ির টিক টিক করে চলার মত শব্দ তোলে স্পার্ম তিমি, ফলে তার উপস্থিতি নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে হোয়েলম্যানরা।

'ওই যে লেজ!' আবার চেঁচাল ট্যাসটেগো, আর তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল তিমির ঝাঁক।

'তাড়াতাড়ি, স্টুয়ার্ড!' বলল আহাব। 'সময়! সময়!'

ছুটে গিয়ে ঘড়ি দেখে এসে নিখুঁত সময় জানাল স্টুয়ার্ড।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি আমরা। পেছনে ডুবেছে যখন খুব সম্ভব জাহাজের সামনে ভেসে উঠবে তিমিগুলো। আমাদের উপস্থিতির কথা জানতে পারেনি ওগুলো।

কিন্তু এই সময়ে কার যেন একটা বিস্ময়ধ্বনি শুনে চোখ ফেরাল সবাই। অবাক হয়ে দেখল, যেন বাতাস থেকে তৈরি হওয়া কুয়াশার মত পাঁচটা মূর্তি ঘিরে রয়েছে ক্যাপটেন আহাবকে।

৪১

ডেকের উল্টো পাশে দাঁড়ানো ভৌতিক মূর্তিগুলো খুলতে লাগল ওখানে বাঁধা নৌকোটা। স্টারবোর্ড কোয়ার্টারে থাকে বলে এটাকে ক্যাপটেনের নৌকো বলে। বোর দিকে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটা কালো। লম্বা, সাদা একটা ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে আছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। মাথায় একটা পাগড়ি। অন্য চারজন অতটা কালো নয়, চামড়ার রঙ অনেকটা বাঘের মত হলুদ। ফিলিপাইনের আদিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায়।

জাহাজের সবাই যখন তাকিয়ে রয়েছে হতবাক হয়ে, সাদা পাগড়িঅলা লোকটার উদ্দেশে আহাব বলল, 'সব তৈরি, ফেদাল্লা?'

'তৈরি,' জবাব এল খসখসে গলায়।

'তাহলে নামাও। শুনতে পাচ্ছ সবাই? নৌকো নামাও।'

নামিয়ে দেয়া হলো তিনটে নৌকো। সেগুলো পানির সংস্পর্শে আসতে না আসতেই পাঁচ মূর্তিসহ পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল ক্যাপটেনের নৌকো। স্টার্নে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে স্টারবাক, স্টাব আর ফ্লাস্ককে তাদের নৌকো নিয়ে বিরাট একটা জায়গা বেড় দিয়ে এগিয়ে যেতে বলল আহাব। কিন্তু তখনও তারা

মূর্তিগুলোর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যে, ক্যাপটেনের কথা ঠিকমত শুনতেই পেল না।

'ক্যাপটেন আহাব?' বলল স্টারবাক।

'ছড়িয়ে পড়ো, ছড়িয়ে পড়ো সবাই,' বলল আহাব; 'ফ্লাস্ক, তুমি আরও সরে যাও জাহাজের পেছনদিকে।'

'জ্বী, স্যার,' জবাব দিল ফ্লাস্ক। 'পেছনে সরে যাও!' আদেশ দিল নাবিকদের। 'ওখানে! ওখানে! হ্যাঁ। ছেলেরা, একেবারে সামনেই ডাকছে তিমি। পেছনে সরে যাও! আরও পেছনে!'

'হাঁ করে হলুদ লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকো না, আর্চি। নিজের কাজ করো।'

'তাকানোর প্রয়োজন নেই, স্যার। ওদের কথা তো আমি আগে থেকেই জানতাম। কিন্তু কাবাকো আমার কথা বিশ্বাস করেনি।'

'টানো, টানো, বাছারা আমার,' ঘুমপাড়ানি সুরে নাবিকদের বলে চলল স্টাব। 'প্রাণপণ টেনে মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলছ না কেন? কিসের দিকে তাকিয়ে আছ? ওই নৌকোর লোকগুলোর দিকে? ওই নতুন পাঁচজন এসেছে আমাদের সাহায্য করতে– কোত্থেকে এসেছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই– মাথা যত কম ঘামাবে তত বেশি আনন্দে থাকবে। দাঁড় টানো, আরও জোরে। হ্যাঁ, এই ভাবে। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ। এই দাঁড় টানার কোন জবাব নেই। বাহ্! বাহ্! থ্রী চিয়ারস্! তাড়াহুড়ো কোরো না। স্বাভাবিকভাবে টানো। জোরের সঙ্গে কিন্তু লম্বা করে। হ্যাঁ, এই তো! খবরদার! কেউ নাক ডাকবে না, ঘুমাবে না কেউ! এই দেখো!' কোমর থেকে একটা ছুরি টেনে নিল স্টাব। 'সবাই ছুরি বের করে দাঁতে কামড়ে ধরে দাঁড় টানো! হ্যাঁ, ঠিক এভাবে! এতক্ষণে একটা কাজের কাজ হয়েছে!'

নাবিকদের সঙ্গে এভাবেই কথা বলে স্টাব। হাবভাবে মনে হয়, সে বুঝি দাঁড় টানার সঙ্গে মিশে গেছে, আসলে মোটেই তা নয়। তবে তার নিজের অতি স্বাভাবিক দাঁড় টানা আর কথা বলার মধ্যে এমন একটা ঢং আছে যে সঙ্গীরা দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়

ইতিমধ্যে আহাবের নির্দেশ মেনে স্টারবাক এসে পড়েছে প্রায় স্টাবের নৌকোর পাশে নৌকো দুটো আরও কাছে আসতে স্টাব বলল:

'মি. স্টারবাক, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'বলো!' পাশ না ফিরেই বলল স্টারবাক।

'ওই হলুদ ছেলেগুলোর ব্যাপারে কি মনে হয়, স্যার?'

'চোরাভাবে আনা হয়েছে জাহাজ ছাড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে। বিশ্রী ব্যাপার, স্টাব! কিন্তু ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। যা হবার হবে, তোমার নাবিকদের দাঁড় টানতে বলো জোরে। সামনে রয়েছে এক ঝাঁক তিমি, সেজন্যেই আমরা নৌকো নামিয়েছি। এখন তিমির পিছু নেয়াই আমাদের কর্তব্য। কর্তব্য আর লাভ হাত ধরাধরি করে থাকে!'

'হুঁ, আমিও তা-ই ভেবেছি,' নৌকো দুটো আলাদা হয়ে যেতে আপনমনে

BanglaBook.org

বলল স্টাব। 'স্টুয়ার্ড অনেক আগেই সন্দেহ করেছিল। কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ব্যাটাদের। এসব কিছুর মূলে রয়েছে সেই সাদা তিমি। কিন্তু এতে আমার কিছু করার নেই। ছেলেরা, দাঁড় টানো! জোরে! আরও জোরে!'

লোকগুলোর ব্যাপারে আর্চি ঠিক সন্দেহই করেছে। এদের নিয়ে আরও নানারকম জল্পনা-কল্পনা হতে পারে। আমার শুধু মনে পড়ছে জাহাজে ওঠার আগে কুয়াশার মধ্যে দেখা সেই পাঁচ মূর্তি আর তাদের সম্বন্ধে বলা এলিজার গোলকধাঁধার মত কথাগুলো।

অন্যান্যদের ছেড়ে আহাবের নৌকো এগিয়ে গেছে অনেকটা। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তার পাঁচ নাবিকের শক্তি। যেন ইস্পাতের মানুষ, যন্ত্রের মত দাঁড় উঠছে আর পড়ছে। ফেদাল্লা ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বাংশের পোশাক খুলে ফেলেছে, সারা শরীরে তার অসংখ্য মাংসপেশি। কিন্তু তিমিগুলোর কোন চিহ্ন নেই, যেন চলে গেছে সাগরের গভীরে।

'সবাই নিজ নিজ দাঁড়ের দিকে লক্ষ রাখো!' চিৎকার করল স্টারবাক। 'কুইকেগ, উঠে দাঁড়াও!'

এক লাফে উঠে দাঁড়াল কুইকেগ, কড়া চোখে তাকিয়ে রইল নীল পানির দিকে। স্টারবাকও ঘন ঘন তাকাতে লাগল এদিক-সেদিক।

খানিকটা সরে স্থির হয়ে আছে ফ্লাস্কের নৌকো। লগারহেডের মাথায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে আশেপাশে তাকাচ্ছে ফ্লাস্ক।

'না, ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না,' একটু পর বলল সে।

'দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে ডাগ্‌গু বলল, 'আমি মাস্ট-হেড হতে রাজি আছি। উঠবেন, স্যার?'

'নিশ্চয়। ধন্যবাদ। তবে তুমি পঞ্চাশ ফুট লম্বা হলে খুব ভাল হত,' ডাগ্‌গুর দু'হাতের ওপর দু'পা রেখে তার কাঁধে উঠে পড়ল ফ্লাস্ক।

তিমিদের নিয়ে খুব একটা ব্যস্ত নেই স্টাব। তার ধারণা, নিয়মিত কিছু শব্দ করার পর ডুব দিয়েছে তিমিগুলো, আজ আর তাদের দেখা পাবার সম্ভাবনা নেই। বুড়ো আঙুল দিয়ে ঠেসে ধীরেসুস্থে পাইপে তামাক ভরল সে। কিন্তু ম্যাচ জ্বালতে না জ্বালতেই চেঁচিয়ে উঠল তার হারপুনার ট্যাসটেগো, 'তৈরি হও, তৈরি হও সবাই! পথ ছাড়ো!– ওই যে তিমি!'

সাধারণ কোন মানুষ হলে কিছুই টের পেত না। সবজেটে-সাদা পানির ওপর কেবল উঠেছে সামান্য একটু বাষ্প, কিন্তু ট্যাসটেগোর জন্যে সেটাই যথেষ্ট।

চারটে নৌকোই তীর বেগে ছুটল সেই ঈষৎ আলোড়িত পানি লক্ষ করে। কিন্তু বুট্টগদগুলো দ্রুত সরে যেতে লাগল আরও দূরে।

'জোরে, ছেলেরা, জোরে!' ফিসফিস করে বলল স্টারবাক। তার দুই চোখ কম্পাসের কাঁটার মত সামনের দিকে নিবদ্ধ। মাল্লারা একদম চুপ করে আছে। বেড়ে গেল নৌকোর গতি।

হঠাৎ ভেসে এল স্টারবাকের কণ্ঠ, 'উঠে দাঁড়াও!' হারপুন হাতে তড়াক করে উঠে পড়ল কুইকেগ।

'ওই যে কুঁজ! হ্যাঁ, ওটাই! তাড়াতাড়ি।' ফিসফিস করে উঠল স্টারবাক।

BanglaBook.org

শাঁ করে ছুটে গেল কুইকেগের হারপুন। কিসে যেন ধাক্কা লাগল নৌকো, আর তারপরেই যেন একটা ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল পানির নিচে। প্রচণ্ড শব্দ তুলে ছিঁড়ে গেল পাল, নৌকোর সবাই ছিটকে পড়ল পানিতে। হারপুনের স্রেফ আঁচড় লাগায় এই যাত্রা বেঁচে গেল তিমিটা।

সৌভাগ্যের বিষয়, নৌকোটার কোন ক্ষতি হয়নি। পানিতে পড়া দাঁড়গুলো তুলে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়লাম আমরা।

বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়ছিল, এবার গর্জন করতে করতে এসে পড়ল ঝড়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাদের নাস্তানাবুদ করে যখন ফিরে গেল, চারপাশ ঢেকে গেছে আঁধারে। একটা বাতি জ্বালিয়ে কুইকেগের হাতে দিল স্টারবাক। সেই বাতি নিয়ে চুপচাপ বসে রইল কুইকেগ।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে একসময় চোখে পড়ল ঊষার আলো। ঘুমের ঘোরে কখন যেন কুইকেগের হাত থেকে পড়ে ছাতু হয়ে গেছে বাতিটা। আলো আরও খানিকটা স্পষ্ট হতে কট কট করে একটা শব্দ এল কানে। কুয়াশা ফুঁড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল জাহাজ। নাবিকেরা ধরাধরি করে আমাদের তুলে ফেলল ডেকে। গতকাল ঝড়ের আভাস পেয়ে অন্য নৌকোগুলো যথাসময়ে ফিরে গিয়েছিল জাহাজে।

৪২

বিভিন্ন জিনিসের মিশ্রণে তালগোল পাকানো যে-বস্তুটিকে জীবন বলে, সেখানে কখনও কখনও আসে এমন কিছু মুহূর্ত আর ঘটনা, যখন পুরো পৃথিবীটাকেই মনে হয় মস্ত এক বাস্তব রসিকতা।

'কুইকেগ,' সব শেষে জাহাজে ওঠার পর বললাম আমি, 'বন্ধু, এই ধরনের ঘটনা কি অহরহই ঘটে?' গা মুছতে মুছতে কুইকেগ যেরকম ভঙ্গি করল, তার অর্থ– হ্যাঁ, অহরহই ঘটে।

ইতিমধ্যে অয়েল-জ্যাকেট পরে পাইপে টান দিতে শুরু করেছে মি. স্টাব। তার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, মি. স্টাব, আপনি তো প্রায়ই বলেন চীফ মেট মি. স্টারবাকের চেয়ে বিচক্ষণ হোয়েলম্যান আপনি জীবনে দেখেননি; তাহলে কি ধরে নেব ঝড়ের আভাস পেয়েও তিমির পিছু নেয়া একজন হোয়েলম্যানের চূড়ান্ত বিচক্ষণতার প্রকাশ?'

'নিশ্চয়। ঝড়ের আভাস পেয়েও আমি ফুটো হয়ে যাওয়া এক জাহাজ থেকে নেমে তিমির পিছু নিয়েছিলাম কেপ হর্নে।'

এবার ঘুরলাম পাশে দাঁড়ানো থার্ড মেটের দিকে। 'মি. ফ্লাস্ক, আমি অনভিজ্ঞ, কিন্তু তিমি শিকারে আপনার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। এটাই কি নিয়ম যে, দাঁড় টানতে টানতে নিজের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলবার উপক্রম করতে হবে?'

হাসল থার্ড মেট। 'আমি তো সোজা তিমির মুখের কাছে নৌকো নিয়ে যাবার সাহস রাখে, এমন নাবিকদেরই পছন্দ করি।'

BanglaBook.org

তিনজন পক্ষপাতহীন মানুষকে প্রশ্ন করে যে-জবাব আমি পেলাম, তার সারবস্তু হলো– তিমি শিকারে ভয়ঙ্করই স্বাভাবিক, এখানে নেতার নির্দেশে নির্দ্বিধায় গিয়ে ঢুকতে হবে মৃত্যুর চোয়ালে। প্রথম তিমির পিছু নেয়াতেই মারা যেতে পারতাম, যাইনি স্রেফ আমার মৃত্যু ছিল না বলেই।

৪৩

স্বাভাবিক মানুষের পক্ষেই যেখানে তিমির পিছু নেয়া ভীষণ বিপজ্জনক, সেখানে একটা পা না থাকা সত্ত্বেও আহাব কিভাবে সে-ঝুঁকি নেয়, এটা একটা প্রশ্ন। পেকোডের মালিকদের মনে এই প্রশ্ন উঁকি দেয়নি বলেই মনে হয়।

আহাব খুব ভালভাবেই জানে, তার বন্ধুরা বড় জোর মনে করবে, সে নিজে নৌকোয় যায় কাছ থেকে দলগুলোকে ভালভাবে পরিচালিত করতে। কিন্তু আসলে সে যায় তিমির মৃত্যু স্বচক্ষে দেখতে। তিমি তার শত্রু। ইতিমধ্যেই সে জানিয়েছে, তার সবচেয়ে বড় শত্রু মবি ডিককে সে মারতে চায় নিজ হাতে। একটা জিনিস আহাব অনেক আগেই চিন্তা করেছে। তিমির পিছু নিলে তাকে কেউ বাধা দেবে না বটে, কিন্তু সবসময় পাঁচজন নাবিক তাকে বরাদ্দ করতে বন্ধু বা মালিকদের কেউই রাজি হবে না। তাই নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই করেছে, পেকোডে পছন্দের নাবিক তুলেছে সবার অজান্তে। আর কী চেহারা সেই নাবিকদের! বিশেষ করে ফেদাল্লাকে দেখলেই তো শরীরের ভেতরটা কেমন শিরশির করে। ভাবলে অবাক হতে হয়, এই ধরনের লোককে আহাব দলে টেনেছে কিভাবে। হয়তো এদের ওপরেও আহাব বিস্তার করতে পেরেছে তার বিখ্যাত প্রভাব!

৪৪

কেটে গেল দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, তিমি শিকারের চারটে এলাকা পেরিয়ে গেল পেকোড– অ্যাজোরেস, কেপ দ্য ভার্দিস, রিও দে লা প্লাটা এবং সেন্ট হেলেনার দক্ষিণে ক্যারল গ্রাউণ্ড।

শেষ জায়গাটা পেরোবার সময় ঘটল এক ঘটনা। চাঁদনি রাত, ঢেউ ভেঙে পড়ছে রূপোর স্তূপের মত। হঠাৎ জাহাজের সামনেই উঠল রূপালী এক ফোয়ারা। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় ফোয়ারাটাকে মনে হলো স্বর্গীয়। চাঁদনি রাতে মেইনমাস্টে উঠে বসে থাকত বলে ফোয়ারাটা সবচেয়ে আগে চোখে পড়ল ফেদাল্লার। রাতে অবশ্য অনেক সময়েই তিমির দল দেখা যায়, কিন্তু খুব কম হোয়েলম্যানই তাদের পিছু নেয়। তখন ফেদাল্লার চিৎকারে সবাই ডেকে এসে ফোয়ারাটা দেখল। দেখে তাদের মধ্যে কোন আতঙ্ক জাগল না, বরং কেমন যেন একটা আনন্দই হলো। খানিক পর অদৃশ্য হয়ে গেল ফোয়ারাটা, সেই রাতে আর দেখা গেল না।

ধীরে ধীরে সবাই প্রায় ভুলেই গেল মাঝরাতের সেই ফোয়ারার কথা। তারপর

BanglaBook.org

হঠাৎ করেই ফোয়ারাটাকে আবার দেখা গেল। কিন্তু জাহাজ কাছে যেতেই অদৃশ্য হলো ফোয়ারা। রাতের পর রাত দেখা গেল এটাকে, চাঁদ কিংবা তারার আলোয় পড়ছে ঝির ঝির করে। কখনও কখনও দু'তিন রাত ধরে অদৃশ্য হয়ে রইল ফোয়ারা, তারপর ফিরে এল আবার রূপালী ওই ফোয়ারা যেন প্রলুব্ধ করতে চায় আমাদের।

নাবিকরা সাধারণত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়। কয়েকজন তো শপথ করে বলল, রূপালী এই ফোয়ারা তুলছে মবি ডিক। দু'চার দিন একটা ভয় ভয় ভাব গেল। রূপালী ফোয়ারাটা যেন সবাইকে নিয়ে যেতে চায় সর্বনাশের পথে।

৪৫

কেপ থেকে দক্ষিণ-পুবে, ক্রোজেটস্ থেকে বেশ খানিকটা দূরে চোখে পড়ল অ্যালবাট্রস নামের এক জাহাজ। প্রায় চার বছর সাগরে সাগরে ঘুরে জীর্ণ হয়ে গেছে জাহাজটা। মাস্ট-হেড থেকে আমার মনে হলো, ওটা যেন তীরে আটকা পড়া কোন সিন্ধুঘোটকের কঙ্কাল, দড়িদড়াগুলো যেন বরফে মোড়া গাছের ডাল।

'এই জাহাজ! সাদা তিমিটাকে দেখেছ?'

চেঁচাতে গিয়ে ক্যাপটেন আহাবের হাত থেকে কেমন করে যেন শিঙাটা পড়ে গেল সাগরে। ঠিক সেই সময়েই উঠল একটা ঝড়, নাহলে একটা নৌকো নামিয়ে হয়তো ওই জাহাজে গিয়ে উঠত আহাব। তা যখন হলো না, আবার চেঁচিয়ে উঠল সে। চেহারা দেখেই আহাব বুঝতে পেরেছিল যে জাহাজটা ন্যানটাকেটের, তাই বলল, 'শোনো! এটা পেকোড, সারা পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছে! এখন থেকে সব চিঠিপত্র পাঠাতে বোলো প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিকানায়! আগামী তিন বছরের মধ্যে যদি বাড়ি না ফিরি, তাহলে ঠিকানা হলো—

গত কয়েক দিন ধরে পেকোডের পিছু পিছু আসা এক ঝাঁক নিরীহ মাছ পিছু নিল অ্যালবাট্রসের।

'আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিস, তাই না?' চূড়ান্ত এক অসহায়তা ঝরে পড়ল আহাবের কণ্ঠ থেকে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই শোনা গেল চিরাচরিত সেই সিংহ গর্জন– 'কাণ্ডারী! পেকোডকে নিয়ে চলো সারা পৃথিবী বেড় দিয়ে!'

সারা পৃথিবী বেড় দিয়ে! কিন্তু মাঝে মাঝে শুধু নিদারুণ কষ্ট ভোগ ছাড়া এই অভিযান আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে? যদি এমন হত, আমরা চলেছি সলোমন দ্বীপপুঞ্জের চেয়েও অদ্ভুত কোন দ্বীপ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে, তাহলে পৃথিবী বেড় দেয়ার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু তা তো নয়, আমরা চলেছি এক প্রেতাত্মার পেছনে!

৪৬

আহাব কেন অন্য হোয়েল-শিপটাতে গেল না, তার একটা কারণ আমি দেখিয়েছি। কিন্তু ঝড় না আসলেও সে সম্ভবত জাহাজটাতে যেত না। কারণ, তার

BanglaBook.org

আসল প্রশ্নটার 'না' বাচক জবাব পেয়েছিল সে। সাদা তিমিটার সংবাদ দিতে না পারলে সেই জাহাজে পাঁচ মিনিটের জন্যে যাওয়াও পছন্দ করে না আহাব।

যদি 'দু'জন আগন্তুক পেরোতে শুরু করে নিউইয়র্কের জনশূন্য পাইন ব্যারেন্‌স্ কিংবা ইংল্যাণ্ডের স্যালিসবারি প্লেইন, মুখোমুখি দেখা হলে ইচ্ছে থাকুক বা না থাকুক অন্তত হাঁপ ছাড়ার খাতিরেও থামবে তারা কিছুক্ষণের জন্যে, কুশল জিজ্ঞেস করবে। তাহলে এই দুই জায়গার তুলনায় মহাসাগর কত বিশাল এলাকা, সেখানে দুই হোয়েল-শিপের দেখা হলে স্বাভাবিকভাবেই দুই ক্যাপটেনের নানারকম আলাপ করার ইচ্ছে জাগে।

যে-জাহাজটা বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছে, তার কাছ থেকে কেবল আসা জাহাজটা পেতে পারে তিমি শিকারের কোন এমন এলাকার সংবাদ যা তার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেতে পারে এই মুহূর্তে অনেক দূরে চলে যাওয়া তৃতীয় কোন জাহাজের চিঠি, যেগুলোর মধ্যে হয়তো রয়েছে তাদেরও বেশ কয়েকটা চিঠি। এছাড়াও অনেকদিন পর একই পেশার মানুষের দেখা পেলে খানিকটা খোশগল্প করার ইচ্ছে কার মধ্যে না জাগে?

এসব ক্ষেত্রে দেশ ভিন্ন হলেও ক্ষতি নেই, শুধু ভাষাটা অভিন্ন হলেই হলো। ইংরেজ আর আমেরিকানদের মধ্যে চালচলনের বেশ কিছুটা পার্থক্য আছে। ইংরেজদের মধ্যে কিছুটা লাজুকভাব আছে, আমেরিকানদের যা মোটেই নেই। আবার আমেরিকানরা যেমন খানিকটা অমার্জিত, ইংরেজরা মোটেই তা নয়, তারা আদব-কায়দার দিক থেকে বেশ দুরস্ত। তিমি শিকারী হিসেবে আমেরিকানদের তুলনায় ইংরেজরা দক্ষ নয়। আমেরিকান অনেক হোয়েল-শিপ এক দিনে যত তিমি মারে, বেশিরভাগ ইংরেজ হোয়েল-শিপের দশ বছর লাগে ওই পরিমাণ তিমি শিকার করতে। কিন্তু এত পার্থক্য সত্ত্বেও দুই জাহাজের দেখা হলে তাদের আলাপে কোনরকম বাধার সৃষ্টি হয় না।

দুটো হোয়েল-শিপের মুখোমুখি দেখা হলে আলাপ তারা করবেই। কিন্তু দুটো ব্যবসায়ী জাহাজ কথা না বলে চলে যাবে পাশ কাটিয়ে। কারণ, কথা বলার অর্থই হলো ব্যবসায়িক গোপনীয়তা কিছু না কিছু ফাঁস করে দেয়া। দুটো যুদ্ধ জাহাজের দেখা হলে আলাপ হয় ঠিকই, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নিয়ম-কানুনের জন্যে সে-আলাপে আর কোন রস থাকে না। দুটো জলদস্যু জাহাজের দেখা হলে একে অপরকে প্রথম প্রশ্ন করে– 'কত খুলি?'– ঠিক যেমন হোয়েলাররা বলে 'কত ব্যারেল?'। আর জবাব পাবার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় পরস্পরকে ছেড়ে। অপকর্ম করছে তা খুব ভালভাবে জানা থাকলেও কেউ কারও অপকর্মের সাক্ষী হতে চায় না।

দুটো হোয়েলশিপের দেখা হলে ক্যাপটেন দু'জন এক জাহাজে একত্রিত হয় এবং চীফ মেট দু'জন একত্রিত হয় অন্য জাহাজে। দুই হোয়েল-শিপের এই দেখা হওয়াটাকে গ্যাম বলে। অন্য ধরনের দুই জাহাজের দেখা হওয়ার ব্যাপারে কিন্তু এই শব্দটা প্রযোজ্য নয়। 'গ্যাম' শব্দটা রীতিমত অপরিচিতও বটে। ড. জনসন বা নোয়া ওয়েবস্টার কারও অভিধানেই আপনি পাবেন না এই শব্দ। তবে এই শব্দ অবশ্যই অভিধানভুক্ত হওয়া উচিত। অর্থটা আমি বলে দিচ্ছি:

গ্যাম (বিশেষ্য) সাধারণত তিমি শিকারের কোন এলাকায় দুই বা ততধিক হোয়েল-শিপের সামাজিক দেখা-সাক্ষাৎ; এই সাক্ষাতে এক জাহাজের নাবিক অন্য জাহাজে যায়।

৪৭

অ্যালবাট্রসের সঙ্গে দেখা হবার কিছু দিন পরেই আমাদের দেখা হলো আরেক জাহাজ– টাউন হোর সঙ্গে। নাবিকদের প্রায় সবাই পলিনেশিয়ান। স্বল্পকালীন গ্যামে পাওয়া গেল মবি ডিকের গরম সংবাদ। একদিন সূর্যোদয়ের ঠিক আগে ডেকঝাড় দিচ্ছিল টেনেরিফের এক বোকা লোক। হঠাৎ তার চিৎকারে সবাই ডেকে বের হয়ে দেখে, সামনেই পানি তোলপাড় করছে প্রকাণ্ড এক সাদা তিমি। সঙ্গে সঙ্গে নৌকো নামিয়ে পিছু নেয়া হলো। কিন্তু দানবটাকে কাবু করা তো দূরের কথা, উল্টো সে-ই গিলে ফেলল র‍্যাডলি নামের এক হারপুনারকে।

৪৮

শিল্পীরা তিমির অনেক ছবি এঁকেছে। আমি পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে চাই, এ-যাবৎ শিল্পীরা তিমির যত ছবি এঁকেছে, সেগুলোর সবই ভুল।

তিমির সবচেয়ে প্রাচীন ছবি পাওয়া যায় হিন্দু, মিশরীয় আর গ্রীক ভাস্কর্যে। ভারতের এলিফান্টা গুহায় তিমির ছবি রয়েছে। হিন্দুদের 'মৎস্য অবতার'-এ আঁকা হয়েছে তিমির ছবি। অবশ্য ছবিটা অর্ধেক মানুষ অর্ধেক মাছের– কোমরের ওপর থেকে মানুষ, নিচের দিকটা মাছ। কিন্তু শুধু এই লেজের ছবিটাও তিমির মত হয়নি, হয়েছে অ্যানাকোণ্ডার মত।

১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক ডাচ বইয়ে তিমির লেজ আঁকা হয়েছে মাছের লেজের মত খাড়াভাবে। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'গোল্ডস্মিথস্ এনিমেটেড নেচার'-এ অদ্ভুত ছবি আঁকা হয়েছে তিমি আর নারহোয়েলের। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে বার্নার্ড জারমেইনের হোয়েল বুকে ভুল ছবি আঁকা হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির তিমির। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেডারিক কিউভিয়ারের 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি অভ হোয়েলস্'-এ আঁকা স্পার্ম তিমির ছবিটা স্পার্ম তিমি হয়নি, হয়েছে একটা লাউ।

এখন কথা হলো, অন্যান্য প্রাণীর মত তিমিকে মডেল হিসেবে পাওয়া সম্ভব নয় যে দেখে দেখে তার নিখুঁত ছবি আঁকা যাবে। ভাটায় আটকা পড়া তিমি অবশ্য দেখেছে শিল্পীরা, কিন্তু অতিকায় শরীরের কারণে ওই অবস্থায় তিমির চেহারা ভালভাবে বোঝা অসম্ভব। অনেকে বলে, তিমির কঙ্কাল দেখে বোঝা যায়। মোটেই না। কঙ্কাল দেখে তিমির চেহারার আন্দাজ পাওয়া যায় না বললেই চলে।

তিমিকে ঠিকমত বুঝতে হলে, তার নিখুঁত চেহারা দেখতে চাইলে একটামাত্র

পথই আছে– যেতে হবে আপনাকে তিমি শিকার অভিযানে। কিন্তু সেখানে রয়েছে পদে পদে মৃত্যুর সম্ভাবনা। সুতরাং তিমির খাঁটি চেহারা দেখার কৌতূহল খুব একটা না থাকাই ভাল।

৪৯

গত অধ্যায়ে তিমির অঙ্কিত ছবির ব্যাপারে নানা ভুল-ভ্রান্তির কথা বলেছি। কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুল না হলেও তিমির অনেক ভাল ছবিও এঁকেছে লোকে।

স্পার্ম তিমির বেশ ভাল ছবি এঁকেছে বিয়েল। রাইট তিমির চমৎকার ছবি এঁকেছে স্কোরস্‌বাই, যদিও আকারে তা একেবারেই ছোট। আমার দেখা তিমির ছবির মধ্যে জনৈক গার্নারির আঁকা ছবিই শ্রেষ্ঠ। স্পার্ম তিমি আর রাইট তিমির আক্রমণের ছবি এঁকেছে সে। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটা নৌকোর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মাথা তুলেছে এক স্পার্ম তিমি, প্রাণভয়ে উল্টোপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একজন নাবিক। সব মিলিয়ে অ্যাকশনটা অপূর্ব। যদিও তিমির অ্যানাটমিক্যাল দিক দিয়ে বিচার করলে কিছুটা খুঁত রয়ে গেছে, আমি মাথা কুটলেও গার্নারির মত ছবি আঁকতে পারব না।

কে এই গার্নারি, খোঁজ নিয়েও বের করতে পারিনি আমি। তবে এটা ঠিক যে হয় সে তিমি শিকারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, নয়তো তিমির ব্যাপারে তাকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছে কোন জাত হোয়েলম্যান।

৫০

যদি কখনও লণ্ডনের টাওয়ার-হিলে যান, তাহলে আপনার দেখা হতে পারে এক ভিক্ষুকের সঙ্গে। হাতে তার আঁকা একখানা বোর্ড, যেটায় দেখা যাচ্ছে কি করুণভাবে একটা পা হারিয়েছিল সে। বোর্ডে তিনটে তিমি আর তিনটে নৌকোর ছবি। একটা নৌকো চিবিয়ে ছাতু করছে সামনের তিমিটা।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা ছাড়াও ন্যানটাকেট, নিউ বেডফোর্ড কিংবা স্যাগ বন্দরে পাওয়া যায় স্পার্ম তিমির দাঁতের ওপর খোদাই করা তিমি এবং তিমি শিকারের নানা চিত্র। খোদাইয়ের জন্যে ছোট ছোট অনেক রকম যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়, তবে নাবিকরা সাধারণত তাদের জ্যাক-নাইফই ব্যবহার করে।

আমেরিকান হোয়েল-শিপের ফোকাসলে প্রায়ই চোখে পড়ে কাঠের তিমি, কোন কোনটা হয় প্রায় নিখুঁত। গ্রাম্য পরিবেশে বাড়িতে পেতলের তিমি ব্যবহৃত হয় কড়া হিসেবে। প্রাচীন কোন বেল্ফ্রি পর্চায় এমনকি রয়েছে তিমির অনুকরণে নির্মিত ওয়েদারকক। এছাড়া চোখ খোলা রাখলে পাহাড়ী অঞ্চলে হঠাৎ চোখে পড়বে প্রস্তরীভূত তিমি।

৫১

ক্রোজেট্স্ থেকে উত্তর-পুবে যেতে যেতে আমরা এসে পড়লাম ব্রিটের বিস্তীর্ণ সব খেতে। হলুদ এই খুদে উদ্ভিদগুলো রাইট তিমির প্রধান খাদ্য। লীগের পর লীগ ব্রিট দেখে মনে হচ্ছে, পেকোড যেন ঢুকে পড়েছে পাকা সোনালি গমের খেতে।

দ্বিতীয় দিন চোখে পড়ল অনেক রাইট তিমি, হাঁ করে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন সকালবেলা ঘাস কাটতে বেরিয়েছে বাগানের মালী। ওগুলোর এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঘাস কাটার মতই শব্দ হচ্ছে, পেছনে পড়ে থাকছে রাশি রাশি কাটা ব্রিট।

ব্রিট খেতে খেতে রাইট তিমিগুলো যখন থামছে, মাস্ট-হেড থেকে তাদের মনে হচ্ছে নিষ্প্রাণ প্রস্তরখণ্ড। ভারতে অনেক আগন্তুক নাকি কালো মাটির ঢিবি মনে করে হাতিকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, তেমনি সাগরে আসা নতুন কেউ নিশ্চল তিমিকে বিশাল প্রস্তরখণ্ড ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারবে না।

৫২

রাশি রাশি ব্রিটের মাঝখান দিয়ে এগোলাম আমরা উত্তর-পুবের জাভা দ্বীপ অভিমুখে। ঝিরঝিরে চমৎকার বাতাস বইছে। চাঁদনি রাতে এখনও মাঝেসাঝে দেখা যাচ্ছে রূপালী সেই ফোয়ারা।

স্বচ্ছ এক সকাল। সোনালি সূর্য আঙুল উঁচিয়ে চুপ থাকতে বলছে সাগরকে, কানাকানি করতে করতে ছুটে যাচ্ছে ঢেউ। সেই মাস্ট-হেড থেকে হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়ল ডাগ্‌গুর।

দূরে পানি থেকে উঠল বিরাট একটা সাদা স্তূপ, বেশ খানিকটা ওপরে ওঠার পর ভেঙে পড়ল পাহাড় থেকে নামা ঝরনা-ধসের মত। পানির ওপর কিছুক্ষণ ঝকমক করল, তারপর ডুবে গেল ধীরে ধীরে। একটু পরেই আবার উঠল। জিনিসটাকে ঠিক তিমি মনে হলো না, নাকি ওটাই মবি ডিক? সাদা স্তূপটা আবার ডুবল, আবার উঠল, আর এবার উঠে এমন এক তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ল যে চমকে গেল সবাই। ডাগ্‌গু চেঁচাল– 'ওই যে! ওখানে! সাদা তিমি! সাদা তিমি!'

মৌমাছির ঝাঁকের মত নাবিকেরা ছুটে এল ডেকে। খালি মাথাতেই উপস্থিত হলো আহাব। ডাগ্‌গুর নির্দেশিত দিকে নিবদ্ধ তার প্রত্যাশী দুই চোখ, একটা হাত ওপরে ওঠানো যে-কোন মুহূর্তে নাবিকদের নৌকো নামাবার আদেশ দেয়ার জন্যে।

সাদা স্তূপটা চোখে পড়তেই আদেশ দিল ক্যাপটেন আহাব। চোখের পলকে নামানো হলো চারটে নৌকো। সবচেয়ে সামনে আহাবের নৌকো, তার পেছনে পেছনে অন্য তিনটে ছুটে চলল শিকারের উদ্দেশে। ডুবে গেল স্তূপটা। দাঁড়

BanglaBook.org

থামিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি রুদ্ধশ্বাসে, একটু পর যেখানে ডুবেছিল ঠিক সেখানেই ধীরে ধীরে আবার ভেসে উঠল জিনিসটা। মুহূর্তে মবি ডিকের কথা উধাও হয়ে গেল সবার মাথা থেকে, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম আমরা রহস্যময় সাগরের সবচেয়ে বড় রহস্যটির দিকে। ঝলসানো ক্রীম রঙের বিশাল এক মণ্ড, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক ফার্লং, মাঝখান থেকে অসংখ্য বাহু মোচড় খাচ্ছে এক দল অ্যানাকোণ্ডার মত, যেন দুর্ভাগা কোন প্রাণী ওটার আওতার মধ্যে গেলেই হয়। জিনিসটার কোন মুখ বা শরীরের সম্মুখভাগ নেই, কোন বোধ আছে বলেও মনে হয় না, পানির ওপর ফুঁসছে যেন আকারহীন জীবনের এক প্রেতচ্ছায়া।

মৃদু শব্দ করে পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল জিনিসটা। আলোড়িত পানির ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই স্টারবাক বলল, 'মবি ডিকের সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে তোকে দেখেই বেশি ভাল লাগল রে, সাদা ভূত!'

'ওটা কি, স্যার?' জিজ্ঞেস করল ফ্লাস্ক।

'দানব স্কুইড। খুব কম হোয়েল-শিপেরই একে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, আর যারা দেখেছে তাদের খুব কমই বন্দরে ফিরে সে-গল্প করতে পেরেছে।'

আহাব কিছুই বলল না। নিঃশব্দে ফিরে চলল পেকোডের দিকে, পেছনে পেছনে অন্য তিন নৌকো।

এক নজরে এত বড় একটা জিনিসকে ভালভাবে লক্ষ করা কঠিন। স্কুইড যারা দেখেছে, তাদের সবাই এক বাক্যে বলেছে যে মহাসাগরের প্রাণিকুলের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়, কিন্তু তাদের কেউই এটার সঠিক আকার আর স্বভাবের ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত দিতে পারেনি।

বিশপ পন্টোপ্পোডান যে অতিকায় ক্রাকেনের কথা বলেছেন, খুব সম্ভব সেটা আসলে স্কুইড। তবে তাঁর আকারের বর্ণনাটা অবিশ্বাস্য। যাই হোক, স্কুইড যে ক্যাটল মাছ গোত্রের প্রাণী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

BanglaBook.org

৫৩

তিমি শিকারের বিষয়টা ভালভাবে বুঝতে হলে হোয়েল-লাইন অর্থাৎ তিমি শিকারে ব্যবহৃত রশিটার কথা জানতেই হবে।

এই রশি তৈরি হয় উৎকৃষ্ট জাতের শণ থেকে। রশির ওপর দেয়া হয় আলকাতরার প্রলেপ। পরের দিকে আমেরিকায় তিমি শিকারে শণের রশির বদলে ব্যবহৃত হয় ম্যানিলা রোপ। শণের রশির মত অতটা টেকসই না হলেও ম্যানিলা রোপ অনেক বেশি শক্ত।

হোয়েল-লাইন মাত্র এক ইঞ্চির দুই তৃতীয়াংশ মোটা। প্রথম দেখায় কেউ ধারণাই করতে পারবে না যে রশিটা এত শক্ত। এটা তিন টন পর্যন্ত চাপ সহ্য করতে পারে। সাধারণত স্পার্ম তিমির জন্যে রশি লাগে দু'শো ফ্যাদমের চেয়েও খানিকটা লম্বা। যেটার সঙ্গে রশি প্যাঁচানো থাকে, সেই জিনিসটাকে বলে টাব।

ইংরেজ নৌকোয় টাব থাকে দুটো। আমেরিকান নৌকোয় একটা করে টাব থাকলেও তার ব্যাস প্রায় তিন ফুট।

৫৪

স্কুইড স্টারবাকের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর হলেও কুইকেগের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। 'ওই স্কুইডকে যখন দেখা গেছে,' বলল সে হারপুন ঝাঁকিয়ে, 'খুব শিগগিরই স্পার্ম তিমির দেখা পাওয়া যাবে।'

পর দিন কোন কাজ না থাকায় ঢুলতে লাগল নাবিকরা। এখন ভারত মহাসাগরের যে-এলাকা দিয়ে পেকোড যাচ্ছে, সেটা তিমি শিকারীদের হিসেবে 'প্রাণবন্ত অঞ্চল' নয়। অর্থাৎ, এদিকটায় রিও দে লা প্লাটা বা পেরুর উপকূলের মত পরপয়েজ, ডলফিন আর ফ্লাইং ফিশ দেখা যায় না।

এখন ফোরমাস্ট-হেডে প্রহরা দেয়ার পালা চলছে আমার। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দুলছি অলস বাতাসে, এছাড়া আর করার কী-ইবা আছে। একসময় মন চলে গেল শরীর ছেড়ে। কেমন একটা আচ্ছন্নতা পেয়ে বসল আমাকে। মেইন আর মিজেন মাস্ট-হেডে প্রহরারত নাবিক দু'জনও ঢুলছে। ঢুলছে নিচের নাবিকেরা, ঢুলছে ঢেউ, পুব ঢুলে পড়ছে পশ্চিমের দিকে, আর সবার মাথার ওপর ঢুলছে সূর্য।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম আমি। সামনে তাকাতেই দেখি, চল্লিশ ফ্যাদমেরও কম দূরত্বে ভেসে উঠেছে প্রকাণ্ড এক স্পার্ম তিমি। সূর্যের আলোয় আয়নার মত চকচক করছে শরীর, অলস ভঙ্গীতে ফোয়ারা ছাড়ছে তিমিটা। ইতিমধ্যে যেন অদৃশ্য কোন জাদুদণ্ডের স্পর্শে জেগে গেছে সমস্ত নাবিক, পুরো জাহাজে শুরু হয়ে গেছে ছুটাছুটি, চেঁচামেচি।

'নৌকো থামাও!' আদেশ দিল আহাব। তারপর নিজেই নিজের আদেশ পালন করতে দৌড়ে গেল সামনে।

নাবিকদের হঠাৎ চেঁচামেচিতে ভয় না পেলেও যেন একটু সজাগ হয়ে খুব ধীরে ধীরে সাঁতরাতে লাগল তিমিটা। আহাব আদেশ দিল, কেউ দাঁড় ব্যবহার করতে পারবে না, জোরে কথা বলতে পারবে না। সুতরাং নৌকোর গানেলে বসে নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুতগতিতে প্যাডেল মেরে এগোতে লাগলাম আমরা। একবার দানবটার লেজ পানি থেকে উঠে গেল প্রায় চল্লিশ ফুট ওপরে, তারপর ডুবল, ঠিক যেন অদৃশ্য হয়ে গেল একটা মিনার।

'ওই যে লেজ!' বলে পাইপ ধরাল স্টাব। আবার ভাসল তিমিটা, চলে এল তার নৌকোর কাছে। অবশেষে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে তিমি, সুতরাং রাখ-ঢাকের আর কোন প্রয়োজন নেই। প্যাডেল রেখে ঝপাঝপ দাঁড় টানতে লাগল সবাই, পাইপে টান দিতে দিতে তাদের উৎসাহিত করতে লাগল স্টাব।

তিমিটা সত্যিই বুঝতে পেরেছে, গতি সামান্য বাড়িয়ে সামনে এগোল সে।

'ওকে চমকে তোল, চমকে তোল! তাড়াহুড়োর কিছু নেই, যা করার যথেষ্ট

BanglaBook.org

সময় নিয়ে করো– কিন্তু চমকে দাও ওকে, ঠিক যেমন বজ্রপাতে চমকে ওঠে মানুষ। আরও জোরে, ট্যাসটেগো। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখো! মৃত্যু আর মুখ ভ্যাংচানো শয়তান দেখার মত করে চমকে তোল ওকে! ব্যস, ব্যস!'

'উঁ-হু! ওয়া-হী!' জবাবে আকাশে রণহুংকার ছুঁড়ে মারল গে-হেডার। আরও জোরে দাঁড় বাইতে লাগল নাবিকরা।

ট্যাসটেগোর বুনো চিৎকারের জবাব ভেসে এল ডাগ্‌গুর তরফ থেকে। 'কী-হী! কী-হী!' সামনে-পেছনে দুলছে সে খাঁচায় বন্দী বাঘের মত।

'কা-লা! কু-লু!' চিৎকার ছাড়ল কুইকেগও। ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদের উৎসাহিত করে চলল স্টাব। তর তর করে এগোল নৌকো, বেশ কিছুক্ষণ পর শোনা গেল বিশেষ সেই চিৎকার– 'ট্যাসটেগো, উঠে দাঁড়াও!' শাঁ করে ছুটে গেল হারপুন। নৌকো পিছিয়ে নেয়া হলো। প্রায় তখনই পাক খুলে বোঁ বোঁ করে ছুটতে লাগল হোয়েল-লাইন। রশিটাকে ধরে থাকতে থাকতে স্টাবের মনে হলো, হাতের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে দু'ধারী তলোয়ার।

'লাইন ভেজাও! লাইন ভেজাও!' টাবের পাশে বসে থাকা নাবিককে বলল স্টাব। রশিটা ভিজিয়ে দিল সে। নৌকো এখন ছুটছে আক্রমণোদ্যত হাঙরের মত। দ্রুত নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করে নিল স্টাব আর ট্যাসটেগো, নৌকোর ছুটন্ত অবস্থায় কঠিন এক কাজ ওটা।

বীণার তারের মত টান টান হয়ে গেছে রশি, নাবিকদের স্নায়ুও এখন রশির মত টান টান, নৌকোর বোতে ধাক্কা খেয়ে জলপ্রপাতের মত ছুটে যাচ্ছে পানি।

'টেনে ধরো– টেনে ধরো!' চেঁচাল স্টাব নাবিকদের উদ্দেশে। তারপর নৌকোয় হাঁটু গেড়ে বর্শা ছুঁড়তে লাগল তিমিটাকে লক্ষ্য করে। প্রত্যেকবার তিমির ভয়াবহ আলোড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে স্টাবের নির্দেশে নৌকো পিছিয়ে নেয়া হলো, আর নৌকো পেছাতেই আবার প্রস্তুত হলো সে বর্শা ছোঁড়ার জন্যে।

রক্তের স্রোত বইতে লাগল তিমিটার চারপাশে, তাতে সূর্যের বাঁকা আলো প্রতিফলিত হয়ে নাবিকদের সবাইকে পরিণত করল লাল মানুষে। স্পার্ম তিমিটা শরীর মোচড়াতে লাগল তীব্র যন্ত্রণায়।

'নৌকো এগোও! কাছে নিয়ে যাও! আরও কাছে!' নির্দেশ দিয়ে বিরাট লম্বা একটা বর্শা হাতে শেষ আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হলো স্টাব। নৌকো তিমির পাঁজরের কাছে আসতে বর্শাটা গেঁথে ঘোরাতে লাগল স্টাব, যেন খুঁজে ফিরছে হারিয়ে যাওয়া কোন সোনার ঘড়ি।

ভলকে ভলকে রক্ত বের করে দিয়ে খাবি খেতে লাগল তিমিটা, তারপর আস্তে আস্তে কাৎ হয়ে পড়ল একপাশে। ফেটে চৌচির হয়ে গেছে ওটার হৃৎপিণ্ড।

'তিমিটা মারা গেছে, মি. স্টাব,' বলল ডাগ্‌গু।

'হ্যাঁ,' মুখ থেকে পাইপ টেনে নিয়ে সাগরে ছাই ঝাড়ল স্টাব, তারপর চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকাল নিজের হাতে মারা পড়া তিমিটার দিকে।

BanglaBook.org

৫৫

গত অধ্যায়ের ঘটনা সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই আমি।

তিমি শিকারে সাধারণত জাহাজ থেকে নৌকো এগোবার সময় হেডসম্যান অর্থাৎ তিমির প্রকৃত শিকারী অস্থায়ীভাবে হাল ধরে থাকে, আর সবচেয়ে সামনের দাঁড় বায় হারপুনার। হারপুন যে ছুঁড়বে, তার হাতে প্রচুর শক্তি আর মাথাটা ঠাণ্ডা থাকা দরকার। কারণ, হারপুন যদিও বেশ লম্বা, ভারী অস্ত্রটাকে ছুঁড়তে হয় বিশ তিরিশ ফুট দূর থেকে। হারপুনারকে নৌকো ছোটার সময় শুধু দাঁড়ই ধরে থাকলে হয় না, সর্বক্ষণ চেঁচাতে হয়। পেশি টান টান হয়ে থাকা অবস্থায় একনাগাড়ে চিৎকার করা যে কি কষ্ট, তা যার এই অভিজ্ঞতা আছে, সে-ই শুধু জানে। আর এরকম প্রচণ্ড ক্লান্তিকর একটা কাজ করতে করতেই হারপুনারের কানে চিৎকার ভেসে আসে– 'উঠে দাঁড়াও! হারপুন ছোঁড়ো!' তখন দাঁড় নামিয়ে রেখে তাকে ঘুরে যেতে হয় অর্ধবৃত্তাকারে, তারপর ক্রচ থেকে হারপুন তুলে নিয়ে ছুঁড়তে হয় তিমি লক্ষ্য করে। এজন্যেই পঞ্চাশটা হারপুনের মধ্যে লক্ষ্যভেদ করে গোটা পাঁচেক। এজন্যেই অনেক জাহাজ মালিকের কাছে তিমি শিকারটা লাভজনক হয় না। তিমি শিকারের মূলে রয়েছে হারপুনার। আগেই যদি তার দম বের করে নেয়া হয়, প্রয়োজনের সময়ে সে দম পাবে কোথায়?

আবার হারপুন যদি লক্ষ্যভেদ করে, তিমি ছোটার সঙ্গে সঙ্গে হেডসম্যান আর হারপুনার নিজেদের জায়গা বদল করে। আমার মনে হয়, এটা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হেডসম্যানেরই থাকা উচিত নৌকোর সামনে, তারই ছোঁড়া উচিত হারপুন এবং বর্শা। এতে সময় কিছুটা বেশি লাগে বটে, কিন্তু এই কারণে তিমি শিকার ব্যর্থ হয় না। তিমি শিকারের ব্যর্থতার মূলে রয়েছে হারপুনারের ক্লান্তি।

BanglaBook.org

৫৬

কাণ্ড থেকেই গাছের শাখা জন্মে, আর শাখা থেকেই প্রশাখা। তেমনি বইয়ের বেলায় এক অধ্যায় জন্ম দেয় আরেক অধ্যায়ের।

গত অধ্যায়ে ক্রচ সম্বন্ধে বলেছি। এখন ক্রচ জিনিসটা কি, তার একটা ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন মনে করছি। ক্রচ হলো দু'ফুট লম্বা, খাঁজ কাটা অদ্ভুত দর্শন একটা লাঠি, যেটা বোর কাছে স্টারবোর্ড গানেলে ঢোকানো থাকে। ক্রচ ব্যবহৃত হয় হারপুনের কাঠের অংশটা ঠেস দিয়ে রাখার কাজে, যেন হারপুনার চাওয়ামাত্র অস্ত্রটা তুলে নিতে পারে। ক্রচে সাধারণত দুটো হারপুন রাখা হয়, তিমি শিকারীরা যাকে বলে প্রথম ও দ্বিতীয় লোহা।

দুটো হারপুনের সঙ্গেই জড়ানো থাকে হোয়েল-লাইন, যেন দুটোই ছোঁড়া যায় পর পর। কিন্তু প্রথম হারপুন বিদ্ধ হলে তিমি এত জোরে ছুটতে শুরু করে যে সাধারণত দ্বিতীয় হারপুন ছোঁড়ার সুযোগ হারপুনার পায় না। তবে দ্বিতীয়

হারপুনের সঙ্গেও যেহেতু লাইন জড়ানো থাকে, ওটা না ছুঁড়লেও লাইনের টানে একসময় ছিটকে পড়ে পানিতে, এবং সেই সময়টা ভালভাবে লক্ষ না রাখলে লাইনে প্যাঁচ লেগে ঘটতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা।

আর দ্বিতীয় হারপুন যদি তিমির গায়ে বিদ্ধ হয়, লাইন জড়িয়ে গিয়ে অনেক সময়েই সবগুলো নৌকায় একটা হৈচৈ ফেলে দেয়, এবং এই ক্ষেত্রে তিমি মারা না যাওয়া পর্যন্ত জড়ানো লাইন খুলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে আনা সম্ভব হয় না।

এবার মনে করুন, চারটে নৌকো পিছু নিয়েছে একটা মাত্র শক্তিশালী তিমির; প্রত্যেক নৌকোতেই যেহেতু একাধিক হারপুন থাকে, প্রত্যেকেই ছুঁড়তে পারে তাদের দ্বিতীয় হারপুন। তাহলে হয়তো দেখা গেল, তিমি ছুটছে তীর বেগে, আর অনেকগুলো হারপুন ঝুলছে তার গায়ে আলগাভাবে বিদ্ধ হয়ে। কল্পনা করুন, তখন এক নৌকোর রশির সঙ্গে আরেক নৌকোর রশি জড়িয়ে গেলে কি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। বিশদভাবে জিনিসগুলোর ব্যাখ্যা দিলাম যেন পরবর্তী অধ্যায়গুলো পড়তে কোনকিছু আপনাদের কাছে জটিল মনে না হয়।

৫৭

স্টাবের তিমিটা মারা গিয়েছিল জাহাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আমরা আঠারোটা মানুষ লেগে পড়লাম ওটাকে বাঁধার কাজে। তবে, তিমির মত অত বড় একটা জিনিস বাঁধা অল্প সময়ে সম্ভব নয়।

আঁধার নেমে এল, পেকোডে তিনটে বাতি জ্বেলে পথ দেখানো হলো আমাদের। কাছে যেতে বুলওয়ার্কের ওপর দিয়ে একটা বাতি ঝুলিয়ে দিল আহাব। তিমিটার ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখাল না সে। ফাঁকা চোখে একবার তাকিয়ে, তিমিটাকে রাতের মত বাঁধতে বলে চলে গেল কেবিনে।

তিমিটাকে প্রথম দেখার পর আহাবের উৎসাহ ভালই ছিল, কিন্তু এখন মৃত অবস্থায় দেখে হয়তো পেয়ে বসেছে একটা হতাশা। মনে হচ্ছে, মবি ডিক এখনও মরেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝনঝনানি উঠল পেকোডের ডেকে, শেকল দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো তিমিটাকে। এসবের পুরো দায়িত্ব সেকেণ্ড মেটের হাতে দিয়ে স্টারবাকও চলে গেছে ইতিমধ্যে।

'একটা স্টেক,' বলল স্টাব, 'ঘুমানোর আগে স্টেক খাব আমি। ডাগ্‌গু, যাও তো, ওটার গা থেকে একটা টুকরো কেটে নিয়ে এসো!'

মাঝরাতের দিকে রান্না শেষ হলো। আরাম করে খেতে বসল স্টাব। ইতিমধ্যে জুটেছে আরও ভোজন রসিক। এক পাল হাঙর এসে ছিঁড়তে শুরু করেছে তিমিটা। তাদের লেজের বাড়ি লাগছে জাহাজের গায়ে। উঁকি দিলে দেখা যাচ্ছে, ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা তিমিটার ওপর, একেক বারে কেটে নিচ্ছে মানুষের মাথার সমান একটা করে টুকরো।

প্রথমে হাঙরগুলোকে কোন গুরুত্বই দিল না স্টাব। কিন্তু পরে একসময় দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে ডাকল, 'রাঁধুনি! রাঁধুনি! বুড়ো ফ্লিসটা গেল কোথায়? এই, রাঁধুনি.

জলদি এদিকে এসো!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হ্যামকের আরাম ছেড়ে বুড়ো কৃষ্ণাঙ্গ পাচক এসে উপস্থিত হলো সেকেণ্ড মেটের পাশে।

'রাঁধুনি,' লাল একটা টুকরো মুখে পুরে বলল স্টাব, 'রান্নাটা একটু বেশি হয়ে যায়নি? বড্ড নরম হয়ে গেছে স্টেকটা। তোমাকে অনেক বার বলিনি, তিমির স্টেক সুস্বাদু করতে হলে খানিকটা শক্ত রাখতে হবে? ওই যে হাঙরগুলো, ওরাও শক্ত মাছ পছন্দ করে। শুনতে পাচ্ছ, কেমন হুটোপাটি শুরু করে দিয়েছে? যাও, ওদের গিয়ে বলো, খেতে মানা নেই, কিন্তু খেতে হবে চুপচাপ। ভদ্রভাবে। যাও, গিয়ে বুঝিয়ে বলো আমার কথা। এই নাও বাতি,' সাইডবোর্ড থেকে একটা বাতি নিয়ে পাচকের হাতে দিল সে।

গম্ভীর মুখে বাতিটা নিয়ে এগোল বুড়ো ফ্লিস। কথা শোনার জন্যে পা টিপে টিপে স্টাব গিয়ে দাঁড়াল তার পেছনে।

'প্রিয় প্রাণীগণ, তোমাদের জানানোর জন্যে আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে বিশ্রী এই গোলমাল বন্ধ করতে হবে। শুনতে পাচ্ছ? ঠোঁট চাটা বন্ধ করো! মাস্টার স্টাব বলেছেন, পেট পুরে খেতে কোন বাধা নেই তোমাদের। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, এই গণ্ডগোল থামাতেই হবে!'

'রাঁধুনি,' বুড়োর কাঁধে একটা থাবড়া মারল স্টাব– 'উঁহুঁ, কারও দোহাই দিও না। পাপীদের সুপথে আনার সময় শপথ করতে নেই!'

'তাহলে আপনিই বলুন,' যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'না, না, চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও।'

'প্রিয় প্রাণীগণ, তোমরা খুবই পেটুক। এত পেটুক হওয়া ভাল নয়। জাহাজে লেজ দিয়ে বাড়ি মেরো না। অবশ্য পেটুক হবার জন্যে তোমাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, জন্ম থেকেই পেটুক তোমরা। কিন্তু এটা একটু নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করো। তোমরা হাঙর, কিন্তু ভেতরের হাঙরটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই তোমরা পরিণত হবে ফেরেশতায়। শুনে রাখো, ফেরেশতারা নিয়ন্ত্রিত হাঙর ছাড়া আর কিছুই নয়। এই তিমির ওপর তোমাদের কোন অধিকার নেই, অধিকার রয়েছে অন্যের। তবু খেতে পারো তোমরা, কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, ভদ্রভাবে খাও। জানি, তোমাদের মুখ অন্যের চেয়ে বড়, কিন্তু মুখ বড় হলেও অনেকের পেট ছোট থাকে।'

'চমৎকার, ফ্লিস,' বলল স্টাব, 'চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও!'

'লাভ নেই, মাস্টার স্টাব, ব্যাটারা পেট না ভরা পর্যন্ত কিছুই শুনবে না। আর ভরলেই বা শুনবে কখন, তখন তো ওরা চলে যাবে ঘুমাতে।'

'বিশ্বাস করো, আমিও ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম। ওদের আশীর্বাদ করো, ফ্লিস। আমি খেতে যাই।'

'গণ্ডগোল করো তোমরা যত খুশি, আর খেতে থাকো যতক্ষণ ইচ্ছে। পেট ফেটে মরলে তখন বুঝবে!'

'এবার, রাঁধুনি,' খেতে খেতে বলল স্টাব, 'আগের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আমার কথা শোনো।'

BanglaBook.org

'শুনছি।'

'বেশ। এখন আমি আবার বলতে চাই সেই রান্নার কথা। তা, তোমার বয়স কত হয়েছে, রাঁধুনি?'

'আপনার কত মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল ফ্লিস।

'চুপ! বলো, বয়স কত হয়েছে?'

'সবাই বলে, প্রায় নব্বই,' বিড়বিড় করে উঠল বুড়ো।

'তাহলে কি প্রায় একশো বছর বাঁচা সত্ত্বেও রান্না তুমি শিখবে না? এবার বলো, তোমার জন্ম কোথায়?'

'হ্যাচওয়ের পেছনে, ফেরিতে, রোয়ানক যাবার সময়।'

'ফেরিতে? অদ্ভুত ব্যাপার! কিন্তু আমি জানতে চেয়েছিলাম, রাঁধুনি, তোমার জন্ম হয়েছে কোন্ দেশে।'

'বললামই তো– রোয়ানক,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল বুড়ো।

'তুমি এক কাজ করো, রাঁধুনি, তোমার দেশে ফিরে গিয়ে আবার জন্মগ্রহণ করো। এত বয়স হয়েছে, অথচ তুমি এখনও তিমির স্টেক রান্না করতে শেখোনি।'

'আর যদি কখনও রান্না করেছি,' গজরাতে গজরাতে ঘুরে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল বুড়ো।

'শোনো, শোনো,' ডাকল স্টাব পেছন থেকে। 'এই নাও। তুমি নিজেই খেয়ে বলো, স্টেকটা কেমন হয়েছে।'

শুকনো ঠোঁট স্টেকটায় সামান্য বুলিয়ে নিগ্রো বুড়ো বলল, 'এর চেয়ে ভাল স্টেক আমি জীবনে খাইনি; রসাল, খুব রসাল।'

'রাঁধুনি, জীবনে তুমি কখনও গির্জায় গেছ?'

'একবার গেছি। কেপ টাউনে।'

'বলছ, গির্জায় গেছ, অথচ এইমাত্র এত বড় একটা মিথ্যে কথা তুমি আমাকে বলতে পারলে? কোথায় যাবার আশা করো, রাঁধুনি?'

'বিছানায়,' বলতে বলতেই ঘুরে দাঁড়াল বুড়ো।

'থামো! আমি বলতে চাইছি, মরার পর তুমি কোথায় যাবার আশা করো। প্রশ্নটা ভয়ঙ্কর, রাঁধুনি, ভেবে-চিন্তে জবাব দাও।'

'এই কালো মানুষটা যখন মরবে,' সম্পূর্ণ বদলে গেল তার স্বর এবং মুখের ভাব, 'সে নিজে কোথাও যাবে না। ফেরেশতারা তাকে নিতে আসবে।'

'নিতে আসবে? কিভাবে? গাড়ি নিয়ে? কোথায় নিয়ে যাবে?'

'ওখানে,' ওপরদিকে আঙুল নির্দেশ করল ফ্লিস।

'অর্থাৎ, মরার পর তুমি মেইনমাস্ট-হেডে যাবার আশা করো? কিন্তু জানো তো, যত ওপরে যাবে তত ঠাণ্ডা লাগবে? মেইনমাস্ট, অ্যা?'

'আমি মোটেই এ-কথা বলিনি,' গম্ভীর হয়ে গেল ফ্লিস।

'বলেছ– ওখানে তুমি নিজেই দেখো, তোমার আঙুলটা কোন্‌দিকে ধরা আছে। তবে তুমি বোধ হয় স্বর্গে যাবার আশা করো, তাই না? স্বর্গে যাওয়া অত সহজ নয়। আমরা কেউ এখনও স্বর্গে যাইনি। যাক গে, বাদ দাও ওসব।

BanglaBook.org

মনোযোগ দিয়ে শোনো আমার কথা।'

'মনোযোগ দিয়েছি।'

'বেশ। তোমার রান্না করা তিমির স্টেক এতই বাজে যে সেটা আমি যত শিগগির সম্ভব অদৃশ্য করে দিয়েছি। ভবিষ্যতে আমার জন্যে স্টেক রান্না করার সময় বলে দেব, রান্নাটা ঠিক কিভাবে করতে হবে। নিজে ওস্তাদি করে আগেই যেন সব নষ্ট করে দিও না। এক হাতে স্টেকটা ধরবে, আরেক হাতে এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা তুলে নিয়ে স্টেকটাতে ছুঁইয়েই পরিবেশন করবে। বুঝতে পেরেছ? আর আগামীকাল তিমিটা কাটার সময় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওটার পাখনার ডগাগুলো নিয়ে আচার করতে দেবে। লেজের ডগারও আচার করবে। হ্যাঁ, এবার যাও।'

কিন্তু ধাপ তিনেক না যেতেই আবার তাকে ডাকল স্টাব।

'আগামীকাল রাতের খাবারে তিমির কাটলেট দেবে আমাকে। বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, এবার যাও। শোনো, শোনো! সকালের নাস্তায় দেবে তিমির চপ। খবরদার– ভুলো না যেন!'

'ঈশ্বরের দোহাই,' হ্যামকে শুতে শুতে বলল বুড়ো, 'সে তিমিকে খাবে না, তিমিই তাকে খাবে। যে-হাঙরের পাল এসেছে, মাস্টার স্টাব তাদের চেয়ে অনেক বড় হাঙর!'

৫৮

একটা স্পার্ম তিমিকে মেরে জাহাজের কাছে আনার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে কাটাকাটি শুরু করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে রাত নেমে এলে তো একেবারেই অসম্ভব। কারণ, তিমি কাটা সময়সাপেক্ষ কাজ। তখন প্রতি ঘণ্টায় দু জন করে তিমিটাকে পাহারা দিতে হয় সারা রাত।

তবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বেশির ভাগ সময়েই এই পাহারা কোন কাজে আসে না। মৃত তিমির রক্তের গন্ধে এসে হাজির হয় পালে পালে হাঙর। এবং ছয় ঘণ্টা পর যখন দিনের আলো ফোটে, কঙ্কাল ছাড়া তিমির আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সাগরের যেসব এলাকায় হাঙরের সংখ্যা কম, সেখানে তীক্ষ্ণ হোয়েল-স্পেড দিয়ে অনবরত খোঁচাতে থাকলে তাদের ভোজনের মাত্রা কিছুটা কমে আসে। কিন্তু এতে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত হয়, খোঁচা খেয়ে হাঙর আরও লোভী হয়ে ওঠে।

যাই হোক, রাতের খাবার সেরে পাহারার ব্যবস্থা করল স্টাব। কুইকেগ আর ফোকাসলের একজন নাবিক যখন ডেকে এল, হাঙরদের মাঝে শুরু হয়ে গেছে ভীষণ হুটোপাটি। তিনটে লণ্ঠন নামিয়ে হোয়েল-স্পেড দিয়ে পাগলের মত খোঁচাতে লাগল ওরা। সম্ভবত মাথাই হাঙরের একমাত্র মারাত্মক অঙ্গ। বেশ কয়েকটা হাঙর মারা গেল মাথায় খোঁচা খেয়ে। কিন্তু প্রত্যেক বার লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব হলো না দুই প্রহরীর পক্ষে। আর এতে করে হিংস্রতা আরও অনেক বেড়ে

BanglaBook.org

গেল হাঙরগুলোর। সঙ্গীদের বেরিয়ে পড়া নাড়ীভুঁড়িগুলো চিবিয়েই ক্ষান্ত হলো না, চিবাতে লাগল নিজের নাড়ীভুঁড়িও। হাঙরদের বুঝি দ্বিতীয় প্রাণ থাকে, নাহলে সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি খেয়ে ফেলার পরেও তারা বেঁচে থাকে কিভাবে! চামড়ার লোভে একটা হাঙরকে ডেকে তুলেছিল কুইকেগ, সেটার চোয়াল বন্ধ করতে গিয়ে ওর একটা হাত খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেল।

যন্ত্রণায় হাত ওপর-নিচ করতে করতে সে বলল, 'কুইকেগ কোন হাঙরকে থোড়াই পরোয়া করে।'

৫৯

গত রাত ছিল শনিবারের রাত। পর দিন যেন শুরু হয়ে গেল বিরাট এক সাবাথ! তবে কিনা এই সাবাথে শয়তান উপাসকদের বদলে যোগ দিল নাবিকরা। পেকোড পরিণত হলো একটা কসাইখানায়, নাবিকেরা কসাইয়ে। এখানে হঠাৎ কেউ এসে উপস্থিত হলে ভাববে, আমরা বুঝি দশ হাজার লাল ষাঁড় উৎসর্গ করছি সাগর দেবতার উদ্দেশে।

প্রথমে কাটার যন্ত্রের সঙ্গে বড় বড় ভারী ব্লক ওপরে তুলে শক্ত করে বাঁধা হলো লোয়ার মাস্ট-হেডে। নিচের ঝুলন্ত ব্লকের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো একশো পাউণ্ড ওজনের ব্লাবার হুক। তারপর হুক ছোঁড়ানোর জন্যে লম্বা স্পেড দিয়ে তিমির পার্শ্বদেশের দুই পাখনার সামান্য ওপরে ফুটো করল স্টারবাক আর স্টাব। তারপর ফুটো দিয়ে হুক ঢুকিয়ে বন্য চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে টানতে লাগল নাবিকেরা। প্রত্যেকটা টানে দুলে উঠল পুরো জাহাজ। অনেকক্ষণ পর কিছু একটা ছেঁড়ার শব্দ পাওয়া গেল, হুকের সঙ্গে উঠে এল ব্লাবারের একটা টুকরো। সূচনা হলো তিমি কাটার।

৬০

এবার দু'একটা কথা বলতে চাই তিমির চামড়া প্রসঙ্গে। এই চামড়া নিয়ে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু আমি আমার মতেই অটল থাকতে চাই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিমির চামড়াটা কোথায় থাকে? আমার মতে, ব্লাবারের ওপর যে দশ-বারো ইঞ্চি পুরু একটা আবরণ আছে, ওটাই তিমির চামড়া। এটা সত্যি যে, তিমির পুরো শরীরের ওপর স্বচ্ছ একটা স্তর আছে, কিন্তু এরকম অতিকায় একটা প্রাণীর চামড়া নিশ্চয় নবজাতক শিশুর চামড়ার চেয়েও পাতলা হতে পারে না। সুতরাং ব্লাবারকেই বলা উচিত তিমির চামড়া।

ব্লাবারের গরম কম্বল গায়ে জড়ানো থাকে বলেই তিমি যে কোন আবহাওয়ায় বসবাস করতে পারে। ভেবে দেখুন, ব্লাবার না থাকলে গ্রীনল্যাণ্ডে তিমির কি অবস্থা হত! এই পানিতে অন্য প্রজাতির মাছ দেখা যায় সত্যি, কিন্তু সেগুলো সবই

ফুসফুসহীন, ঠাণ্ডা রক্তের মাছ, তাদের নিজেদের পেটই একটা করে রেফ্রিজারেটর। কিন্তু তিমির রক্ত গরম, তার ফুসফুস আছে। এই রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তিমি মারা যাবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, গ্রীষ্মে বোর্নিওর নিগ্রোদের রক্ত যতখানি গরম থাকে, মেরু অঞ্চলের তিমির রক্ত তার চেয়েও গরম।

৬১

'শেকল টেনে নাও! মড়াটা ভেসে চলে যাক!' তিমি কাটার কাজ শেষ হয়ে গেছে। চামড়া ছাড়ানো মুণ্ডহীন তিমিটাকে এখন মনে হচ্ছে মার্বেল পাথরের সমাধি। ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল তিমিটা, ওটাকে ঘিরে তখনও হুল্লোড় করছে অতৃপ্ত হাঙরের পাল। নিশ্চল জাহাজ থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখা গেল তিমিটাকে। নীল আকাশের নিচে, শান্ত সাগরে ভাসতে ভাসতে একসময় ফুটকি হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল ওটা।

৬২

তিমির মাথা কাটা খুব কঠিন। কারণ যে জায়গায় মাথা যুক্ত হয়েছে শরীরের সঙ্গে, সেটাই শরীরের সবচেয়ে মোটা অংশ। মাথা যে কাটে তাকে কাটতে হয় ওপর থেকে এবং তার লক্ষ্যস্থল থাকে আট দশ ফুট নিচে। সুতরাং এরকম একটা মাথা দশ মিনিটে কাটতে সক্ষম বলে স্টাব গর্ব করতে পারে বৈকি।

প্রথমে মাথা কাটার পর শরীরের চামড়া ছাড়ানোর জন্যে তার দিয়ে সেটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয় স্টার্নে। বাচ্চা স্পার্ম তিমি হলে পরে মাথা তোলা হয় ডেকে, কিন্তু বড় তিমির বেলায় তা সম্ভব হয় না।

কাটাকুটি শেষ হতে দুপুর হয়ে গেল। খাবার জন্যে নাবিকেরা নিচে যাওয়ায় ডেক সম্পূর্ণ ফাঁকা। খানিক পর সেই নীরবতার মাঝে বেরিয়ে এল ক্যাপটেন আহাব, কোয়ার্টার-ডেকে কিছুক্ষণ পায়চারি করে এসে দাঁড়াল মাথাটার পাশে।

'জাহাজ দেখা যায়!' এসময় উল্লসিত স্বর ভেসে এল মেইনমাস্ট-হেড থেকে।

উল্লাস প্রকাশ পেল আহাবের স্বরেও, 'কোথায়?'

'স্টারবোর্ড বো থেকে মাত্র তিন পয়েন্ট দূরে, স্যার, ওটার বাতাস এসে লাগছে আমাদের গায়ে!'

৬৩

ভাল করে দেখে বোঝা গেল, ওটা একটা হোয়েল-শিপ। কিন্তু জাহাজটা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে সঙ্কেত দিল পেকোড।

BanglaBook.org

এখানে বলা দরকার, যুদ্ধজাহাজের মত আমেরিকান হোয়েল-শিপগুলোরও রয়েছে নিজ নিজ সঙ্কেত। এই সঙ্কেত জাহাজের নামসহ একটা বইয়ে ছেপে তার কপি দেয়া হয় প্রত্যেকটা জাহাজের ক্যাপটেনকে। ফলে সঙ্কেত দেখলে অনেক দূর থেকেও জাহাজ চিনতে কারও কোন অসুবিধে হয় না।

বেশ কিছুক্ষণ সঙ্কেত দেখানোর পর নতুন জাহাজটাও সঙ্কেত দেখাল। বই পরীক্ষা করে বোঝা গেল, জাহাজটা ন্যানটাকেটের, নাম– জেরোবোয়াম। জাহাজ দুটো কাছাকাছি হতে মই নামিয়ে দিল পেকোড। কিন্তু জেরোবোয়ামের ক্যাপটেন, মেহিউ, ইশারায় জানাল এসবের কোন প্রয়োজন নেই। তার জাহাজে মহামারী চলছে, তাই এই জাহাজে এসে রোগ ছড়াতে চায় না সে। অবশ্য ক্যাপটেন আসতে না চাইলেও আলাপে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলো না। নাবিকরা জাহাজ দুটোকে দাঁড় করিয়ে দিল একদম পাশাপাশি।

'আপনাদের মহামারীকে আমি ভয় পাই না,' বুলওয়ার্ক থেকে আহাব বলল ক্যাপটেন মেহিউয়ের উদ্দেশে, 'চলে আসুন এখানে।'

উঠে দাঁড়াল গ্যাবরিয়েল নামের এক নাবিক।

'ভাল করে ভেবে দেখুন। ভয়ঙ্কর প্লেগ!'

'গ্যাবরিয়েল, গ্যাবরিয়েল!' বলল ক্যাপটেন মেহিউ, 'তুমি বরং–' ঠিক এই সময়েই জাহাজের গায়ে এসে আছড়ে পড়ল একটা ঢেউ, গর্জনে চাপা পড়ে গেল ক্যাপটেনের বাকি কথা।

'আপনি সাদা তিমিটাকে দেখেছেন?' ঢেউ থিতিয়ে আসার পর জানতে চাইল আহাব।

'আপনার হোয়েল-বোট চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ডুবে যাবে! ভয়াবহ ওই লেজ থেকে সাবধান!'

'আহ্, গ্যাবরিয়েল, তুমি বরং–' কিন্তু ঢেউ আছড়ে পড়ায় এবারেও কথা শেষ হলো না ক্যাপটেন মেহিউয়ের। ঢেউয়ের মাতামাতির জন্যে বেশ কিছুক্ষণ দুই জাহাজের কেউই কথা বলতে পারল না। তারপর মবি ডিকের একটা গল্প শোনাল ক্যাপটেন মেহিউ।

বন্দর ত্যাগ করার অল্প দিন পরেই জেরোবোয়াম মবি ডিকের কথা জানতে পারে আরেক হোয়েল-শিপের কাছ থেকে। গ্যাবরিয়েল ক্যাপটেনকে সাবধান করে দেয়, দেখতে পেলেও সে যেন মবি ডিকের পিছু না নেয়। বছর দুই পর সত্যিই মবি ডিককে দেখতে পায় মাস্ট-হেডার। তিমিটার মুখোমুখি হবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে চীফ মেট মেসি। গ্যাবরিয়েল বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও বাধা দেয়নি ক্যাপটেন। সঙ্গে যাবার জন্যে পাঁচজন নাবিককে রাজি করিয়ে নৌকো নামিয়ে ঝটপট রওনা দিল মেসি। অনেকক্ষণ ধাওয়া করার পর একটা হারপুন লাগাতে পারল সে। ওদিকে মাস্ট-হেডে উঠে গ্যাবরিয়েল চেঁচাচ্ছে, শিগগিরই তাদের সর্বনাশ হবে। নৌকোর বোতে দাঁড়িয়ে মারণাঘাত হানার জন্যে উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে মেসি, হঠাৎ সাদা একটা বিশাল মূর্তি ভেসে উঠল তার সামনে। আত্মা খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হলো পাঁচ নাবিকের, প্রচণ্ড ধাক্কায় শূন্যে উঠে প্রায় পঞ্চাশ গজ ওপর থেকে সাগরে আছড়ে পড়ল হতভাগ্য মেট। নৌকো বা

BanglaBook.org

নাবিকদের চুল পরিমাণ ক্ষতি হলো না, কিন্তু পানির নিচ থেকে আর ভাসল না চীফ মেটের দেহ।

তিমি শিকারে এই ঘটনায় অবাক হবার মত কিছু নেই। অনেক সময়েই নিহত ব্যক্তি ছাড়া কারও কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু মেসির লাশ উদ্ধার করার পর দেখা গেল, শরীরের কোথাও কোন ক্ষতচিহ্ন নেই, অথচ মরে কাঠ হয়ে গেছে সে।

মেসির মৃতদেহ জাহাজে আনতেই শোনা গেল গ্যাবরিয়েলের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ– 'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!' তার সাবধানবাণী নাবিকরা শুনেছে। ফলে আরও বেড়ে গেল গ্যাবরিয়েলের প্রভাব। বর্তমানে তার ভবিষ্যদ্বাণীতে নাবিকেরা আতঙ্কিত হয়।

গল্প শেষ করে ক্যাপটেন মেহিউ জানতে চাইল, সাদা তিমিটাকে দেখতে পেলে সে পিছু নেবে কিনা। আহাব জবাব দিল, 'নিশ্চয়। পিছু নেব কালবিলম্ব না করে।'

জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে গ্যাবরিয়েল বলল, 'মনে রাখবেন নাস্তিকের কথা– মরে কাঠ হয়ে গেছে! ওই তিমিকে ধাওয়া করার আগে মনে করবেন নাস্তিকের পরিণতির কথা!'

বিচলিত হবার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না আহাবের মধ্যে। মেহিউকে উদ্দেশ করে সে বলল, 'ক্যাপটেন, এইমাত্র মনে পড়ল, চিঠির ব্যাগের কথা। ওখানে আপনার কোন্ অফিসারের নামে যেন একটা চিঠি আছে। স্টারবাক, যাও তো, ব্যাগটা নিয়ে এসো।'

প্রায় প্রত্যেক হোয়েল-শিপেই এরকম চিঠি থাকে, আর সে-চিঠি বিলি করা হয় নির্দিষ্ট জাহাজটার সঙ্গে চার মহাসাগরের কোথাও হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে। ফলে প্রাপকের হাতে চিঠি পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায়ই লেগে যায় দু'তিন বছর, এমনকি তার চেয়েও বেশি সময়।

শিগগিরই একটা চিঠি হাতে ফিরে এল স্টারবাক। বহু দিন ধরে পড়ে থাকায় সেটার চেহারা এখন অত্যন্ত মলিন।

'পড়তে পারছ না?' বলল আহাব। 'দেখি, আমাকে দাও। হুঁম, লেখাটা খুবই অস্পষ্ট।' পড়ার চেষ্টা করতে লাগল সে, ওদিকে স্পেডের মাথায় করে চিঠিটা এগিয়ে দেয়ার জন্যে ছুরি দিয়ে খামের এক কোণে ফুটো করতে লাগল স্টারবাক।

ইতিমধ্যে লেখাটা ধরতে পেরেছে আহাব। 'মি. হ্যার– হ্যাঁ, মি. হ্যারি– মেয়েলি হাতের লেখা মনে হচ্ছে– হ্যাঁ, মি. হ্যারি মেসি, জেরোবোয়াম জাহাজ। কিন্তু মেসি তো মারা গেছে!'

'আহা, বেচারি! স্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেহিউ, 'দিন, চিঠিটা আমাকে দিন।'

'না, চিঠিটা আপনিই রাখুন,' গ্যাবরিয়েল বলল আহাবকে, 'শিগগিরই আপনাকেও যেতে হবে মেসির পথে।'

'অভিশাপ দিতে দিতে তোর গলা বুজে আসবে!' চেঁচিয়ে উঠল আহাব। 'ক্যাপটেন মেহিউ, চিঠিটা নিন।' স্পেডে গেঁথে খামটা বাড়িয়ে ধরল সে। হঠাৎ

BanglaBook.org

যেন জাদুমন্ত্রবলে স্পেডের মাথা থেকে খুলে খামটা চলে গেল গ্যাবরিয়েলের হাতে। এক মুহূর্ত দেরি না করে খামটা ছুঁড়ে দিল সে, উড়তে উড়তে ওটা এসে পড়ল আহাবের পায়ের কাছে। তারপর গ্যাবরিয়েলের নির্দেশে দাঁড় তুলে নিল নাবিকেরা, দ্রুত দূরে সরে যেতে লাগল জেরোবোয়াম।

৬৪

তিমি কাটার সময় ব্যস্ততার চূড়ান্ত হয়। ছুটাছুটি, হইচই। কেউ সামনে দৌড়াচ্ছে তো কেউ পেছনে, এখনই এখানে সাহায্য দরকার তো এখনই সেখানে। এক জায়গায় স্থির থাকার কোন উপায়ই নেই। একইসঙ্গে যেন সবাইকে সব জায়গায় প্রয়োজন। এমনকি বর্ণনা দিচ্ছি বলে ছুটি নেই আমারও। আগেই বলেছি, হুক ঢোকানো হয় ব্লাবারের পাশ দিয়ে। কিন্তু মুখে বলা যত সহজ, অত বিশাল এক বপুতে হুক ঢোকানো তত সহজ নয়। এই কাজটা করে আমার বন্ধু কুইকেগ। হুক ঢোকানোর জন্যে সে নেমে যায় তিমির পিঠে। কিন্তু পরিস্থিতি অনেক সময় এমন দেখা দেয় যে চামড়া না ছাড়ানো পর্যন্ত ওখান থেকে উঠতে পারে না সে। তিমির শরীরের বেশির ভাগ অংশই ডুবে থাকে। কুইকেগকেও থাকতে হয় অনেকটা সেভাবেই, অর্ধেক পানির ওপরে অর্ধেক নিচে।

তিমির পিচ্ছিল পিঠে বসে থাকার ব্যাপারে কুইকেগকে সাহায্য করি আমি। ইটালির অরগান বাদকরা নৃত্যরত বাঁদরকে বেঁধে রাখে লম্বা একটা রশি দিয়ে। আমিও অমন একটা রশির সাহায্যেই পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করি কুইকেগকে, তিমি শিকারীরা এই রশিটাকে বলে 'মাঙ্কি রোপ'।

৬৫

স্পার্ম তিমিটার বিশাল মাথা বাঁধা রয়েছে পেকোডের পাশে। কিন্তু শুধু ওই মাথার দিকে তাকিয়ে থাকলে তো চলবে না, মানুষের জীবনে কাজেরশেষ নেই। তো, যতক্ষণ পর্যন্ত আর নজর দেয়া যাচ্ছে না মাথাটার দিকে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনা করা যাক, যেসব রশি দিয়ে মাথাটা বাঁধা হয়েছে, সেগুলো যেন ওটার ভার বইতে পারে।

গত রাত এবং আজ দুপুরের আগ পর্যন্ত ধীরে ধীরে এগোচ্ছে পেকোড। এখানে-সেখানে কিছু ব্রিটের ক্ষেত্র, রাইট তিমি থাকলেও থাকতে পারে। অবশ্য স্পার্ম তিমির চেয়ে অনেক নিচু জাতের এই তিমি মারার ইচ্ছে কারও নেই, পেকোডও রাইট তিমি শিকারে বেরয়নি, অথচ সবাইকে অবাক করে ঘোষণা দেয়া হলো যে পারলে আজ একটা রাইট তিমি মারা হবে।

রাইট তিমি চোখে পড়তেও দেরি হলো না। দুই নৌকো নামিয়ে ধাওয়া করল স্টাব আর ফ্লাস্ক। যেতে যেতে তাদের নৌকো এত দূরে চলে গেল যে মাস্ট-হেড

থেকেও চোখে পড়ে কি পড়ে না। হঠাৎ পানিতে উঠল তীব্র আলোড়ন। কিছুক্ষণ পর দুটো নৌকোই দেখা গেল পরিষ্কার, হারপুন বিদ্ধ হয়ে নৌকোসহ সোজা পেকোডের দিকে ছুটে আসছে তিমি। ভয়াবহ সঙ্ঘর্ষের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমরা। তবে টাবে তখনও প্রচুর লাইন থাকায় শেষ মুহূর্তে দুর্ঘটনা এড়াতে পারল স্টাব আর ফ্লাস্ক। জাহাজ পেরিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে সামনে গিয়ে বর্শা ছুঁড়ে তিমিটাকে কাবু করে ফেলল ওরা।

অবশেষে ঘন হয়ে এল রাইট তিমিটার ফোয়ারা, রক্ত বমি করতে করতে একপাশে কাৎ হয়ে নিশ্চল হয়ে গেল।

দুই নৌকোর হেডসম্যান যখন তিমিটাকে বেশ করে বাঁধছে, ছোটখাট একটা আলাপ হয়ে গেল দুই মেটের মধ্যে।

'বুঝতে পারছি না বুড়ো এই বিশ্রী জিনিসটা নিয়ে কি করবে,' বলল স্টাব তিমিটার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

'কি করবে?' বোতে অতিরিক্ত লাইন প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলল ফ্লাস্ক, 'কখনও শোনেননি, যে-জাহাজের স্টারবোর্ডে স্পার্ম তিমি আর লারবোর্ডে রাইট তিমির মাথা ঝোলানো হয়, সে-জাহাজ কখনও ডোবে না?'

'কেন?'

'অত ব্যাখ্যা করতে পারব না। ওই ফেদাল্লা ভূতটা বলছিল, আমি শুনে ফেলেছি। ব্যাটার হাবভাবে মনে হয় যেন জাদুবিদ্যার সবই জানে। কিন্তু ওর জাদুবিদ্যা পেকোডের কোন উপকারে আসবে বলে মনে হয় না। শয়তানটাকে আমার একেবারেই পছন্দ নয়। সামনের দাঁতটা দেখেছেন? মানুষের নয়, যেন সাপের দাঁত।'

'হারামজাদা ডুবে মরুক! আমি ওর দিকে তাকাই না। কিন্তু বিশ্বাস করো, গাঢ় অন্ধকার রাতে যদি ব্যাটাকে বুলওয়ার্কের পাশে একা পাই—। ব্যাটা ছদ্মবেশী শয়তান! লেজ দেখা যায় না কেন জানো? লুকিয়ে রাখে বলে। হ্যাঁ, লেজটা গুটিয়ে গুঁজে রাখে পকেটে!'

'আর ব্যাটা ঘুমায় জুতোর মধ্যে, তাই না? কোন হ্যামক নেই ওর। তবে একরাতে ঘুমাতে দেখেছি দড়িদড়ার মাঝখানে।'

'ঠিকই দেখেছ। দড়িদড়ার মাঝখানে তো ঘুমাবেই, ওখানে যে লেজ লুকিয়ে রাখার সুবিধে।'

'কিন্তু বুড়োর ওকে এত কি প্রয়োজন?'

'কোন লেনদেন বা চুক্তি করতে চায় মনে হয়।'

'চুক্তি? কিসের?'

'কেন দেখোনি, সাদা তিমিটার জন্যে বুড়ো কেমন উতলা হয়ে আছে? হয়তো আত্মার বদলে ফেদাল্লা তাকে এনে দেবে মবি ডিক।'

'কি বাজে বকছেন, এ তো অসম্ভব!'

'পারবে, পারবে, শয়তানরা সব পারে, অসম্ভবের কিছু নেই।'

'আচ্ছা, মি. স্টাব, ফেদাল্লা যদি সত্যিই শয়তান হয়, এখন ওর বয়স কত হয়েছে বলে মনে হয় আপনার?'

BanglaBook.org

'এই জাহাজে যত পেরেক আছে, তার চেয়েও বেশি। জানো না, শয়তানদের মৃত্যু নেই?'

'একটু আগেই বললেন, সুযোগ পেলে ধাক্কা দিয়ে ওকে ফেলে দেবেন সাগরে। মৃত্যুই যদি না থাকে, ফেলে দিয়ে কি লাভ?'

বাঁধার কাজ শেষে নৌকো দুটো এগোতে লাগল পেকোডের দিকে।

'আমি ব্যাটাকে ভালমত ভেজাতে চাই,' জবাব দিল স্টাব।

'ভিজলেও হামাগুড়ি দিয়ে আবার উঠে আসবে ও।'

'যতবার উঠবে ততবার ফেলে ফেলে ভেজাব।'

'কিন্তু ভিজতে ভিজতে ওরও যদি আপনাকে ভেজাবার কিংবা একেবারে ডুবিয়ে দেয়ার ইচ্ছে হয়?'

'তোমার কি ধারণা, ফ্লাস্ক, আমি ওকে ভয় পাই? ডোবাবার চেষ্টা করে দেখুকই না একবার। কি করব জানো? পকেটে হাত ঢুকিয়ে লেজটা বের করে, নোঙরের সঙ্গে জড়িয়ে এমন এক টান মারব যে পুরোটা একেবারে গোড়া থেকে ছিঁড়ে আসবে।'

'তারপর সেই লেজ দিয়ে আপনি কি করবেন, মি. স্টাব?'

'বিক্রি করে একটা চাবুক কিনব, আবার কি?'

'আপনি এতক্ষণ যা বললেন, সব ভেবেচিন্তে বলেছেন, মি. স্টাব?'

'ভেবে বলি বা না বলি, আমরা এসে পড়েছি জাহাজের কাছে।'

ইতিমধ্যে তিমিটাকে লারবোর্ডে বাঁধার জন্যে শেকল আর রশি নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে নাবিকরা।

'আপনাকে বলিনি,' ফিসফিস করে উঠল ফ্লাস্ক, 'রাইট তিমিটাকে ওরা স্পার্ম তিমির উল্টো পাশে বাঁধবে?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লাস্কের কথা সত্যি হলো। তবে নতুন মাথাটা উল্টো পাশে বাঁধায় পেকোড ভারসাম্য ফিরে পেল।

স্পার্ম তিমির মত রাইট তিমি কাটার সময়েও একই প্রক্রিয়া এবং একই ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। কেবল রাইট তিমির মাথা পুরোটাই কেটে নেয়া হয়, যেখানে স্পার্ম তিমির ঠোঁট আর জিভ আলাদাভাবে কেটে টেনে তোলা হয় ডেকে। কাটাকাটি শেষে স্পার্ম তিমির মত রাইট তিমির মুণ্ডহীন শরীরটাকেও সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হলো।

৬৬

এবার তিমির চেহারা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

তিমির মুখের অবস্থান খুবই অদ্ভুত, মুখটা রয়েছে মাথার সম্পূর্ণ নিচে। মনে মনে যদি কল্পনা করতে পারেন যে আপনার মুখটা রয়েছে চিবুকের নিচে, তাহলে তিমির মুখের কিছুটা ধারণা পাবেন। তিমির কোন নাক নেই। নাকের কাজ করে স্পাউটের ফুটো, আর সেটা রয়েছে মাথার ওপরে। আগেই বলেছি, তিমির চোখ

BanglaBook.org

আর কান রয়েছে মাথার অনেকটা পাশে। সামনে থেকে ধরলে মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পেছনে।

এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, সামনে থেকে তিমির মাথাটাকে মনে হয় আস্ত একটা দেয়াল। ওখানে হাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। হাড় পেতে হলে আপনাকে যেতে হবে কপাল থেকে অন্তত বিশ ফুট পেছনে। তিমির মাথার হাড়বিহীন এই অংশে চমৎকার তেল হয়। তিমির ব্লাবার যেমন চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে, মাথার চামড়া অতটা মোটা না হলেও সামনে থেকে এতই শক্ত যে শক্তিশালী মানুষের ছোঁড়া হারপুনও সেখানে লেগে ছিটকে আসে।

৬৭

স্পার্ম তিমির মাথাটাকে যদি একটা আয়তাকার নিরেট বস্তু ধরে নিয়ে পাশাপাশি দু'ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে যাবতীয় হাড় থেকে যাবে নিচের অংশে আর ওপরের অংশ হাড়বিহীন। এখন ওপরের এই হাড়বিহীন অংশটাকে যদি আবার পাশাপাশি দুটো ভাগ করেন, নিচের অংশের খাঁজে খাঁজে পাবেন তেল। দ্বিখণ্ডিত এই নিচের অংশটাকে বলে জাঙ্ক, আর ওপরের অংশটাকে কেস। এই ওপরের অংশটাকে মনে করা যেতে পারে গ্রেট হাইডেলবার্গ টান, এখানেই রয়েছে স্পার্ম তিমির জগদ্বিখ্যাত স্পার্মাসেটির বিশাল সঞ্চয়।

তিমির জীবিতাবস্থায় স্পার্মাসেটি থাকে তরলাকারে, কিন্তু মরার পর বাইরের আলো-বাতাসে ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে দানা বাঁধে। বড়সড় একটা তিমির কেসে সাধারণত পাঁচশো গ্যালন স্পার্মাসেটি থাকে, তবে অনিবার্য কারণবশত অনেক সময় এর কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়।

তিমির মাথাটা প্রকাণ্ড– এ-কথা বার বার বললেও তার কোন মাপ এখন পর্যন্ত আপনাদের দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। পূর্ণদেহী একটা তিমির দৈর্ঘ্য অল্পবিস্তর আশি ফুট, আর তার মাথা দেহের এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ মোটামুটি ছাব্বিশ ফুট।

৬৮

বিড়ালের মত ক্ষিপ্রগতিতে স্পার্ম তিমিটার মাথার ওপর উঠে পড়ল ট্যাসটেগো। হাতে তার একটামাত্র যন্ত্র, যাকে তিমি শিকারীরা বলে হুইপ। তবে জুত হয়ে বসার পর ডেক থেকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো খাটো হাতলঅলা একটা ধারাল কুড়াল। প্রাচীন বাড়ির দেয়ালে টোকা দিয়ে দিয়ে যেমন গুপ্তধনের সন্ধান করে মানুষ, ঠিক তেমনি সতর্কতার সঙ্গে ট্যাসটেগো সন্ধান করতে লাগল, কোন্ দিক দিয়ে গর্ত খুঁড়বে হাইডেলবার্গ টানে। সন্ধান শেষ হতে লোহার একটা বালতি সংযুক্ত করল হুইপের এক প্রান্তে, হুইপের আরেক প্রান্ত রইল ডেকের

BanglaBook.org

সাহায্যকারীদের হাতে। টানের ভেতরে বালতি নামিয়ে দিল ট্যাসটেগো, একটু পর আবার টেনে তুলল নাবিকদের ইশারা করে। কাঁচা দুধের মত পদার্থে ভর্তি বালতি নাবিকরা ঢালল আরেকটা বড় বালতিতে। এভাবে তুলতে তুলতে একসময় বড় বালতিটা ভরে গেল। শেষের দিকে ট্যাসটেগোকে স্পার্মাসেটি তুলতে হলো প্রায় বিশ ফুট নিচে থেকে।

আরও স্পার্মাসেটি তোলার পর ঘটল এক দুর্ঘটনা। ট্যাসটেগোর হাত ফসকে গিয়েছিল, নাকি বেশি পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল পায়ের নিচটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, বালতির মতই সে গিয়ে পড়ল হাইডেলবার্গ টানে।

লাফ দিয়ে তিমির মাথার ওপরে উঠল ডাগ্‌গু। সে কেবল ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখছে ট্যাসটেগোর অবস্থা, সেই সময় আরেক দুর্ঘটনা। বিরাট বিরাট যে দুটো হুকে মাথাটা ঝোলানো ছিল, তার একটা গেল ভেঙে। আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেল সমস্ত নাবিক। মাথার সম্পূর্ণ ভার এখন একটামাত্র হুকের ওপর। পেকোড দুলছে, যেন ধাক্কা খেয়েছে আইসবার্গে।

'নেমে এসো, নেমে এসো!' চেঁচাল সবাই ডাগ্‌গুর উদ্দেশে। কিন্তু সে ততক্ষণে বালতিটা নামিয়ে দিয়েছে ভেতরে, তবু যদি সেটা জড়িয়ে ধরে উঠে আসতে পারে ট্যাসটেগো।

'ঈশ্বরের দোহাই, নেমে এসো এখনই!' চিৎকার করে উঠল স্টাব, 'কী লাভ হবে ওই লোহার বালতি লোকটার মাথার ওপর নামিয়ে?'

'সাবধান! সরে যাও!' গর্জন ছাড়ল কে যেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় হুক ভেঙে স্পার্ম তিমির প্রকাণ্ড মাথাটা সশব্দে আছড়ে পড়ল সাগরে। একটা ট্যাকল আঁকড়ে ধরে কোনমতে নিজেকে রক্ষা করল ডাগ্‌গু। সবাই যখন ভাবছে, সলিল-সমাধি হয়ে গেল ট্যাসটেগোর, ঠিক তখনই খোলা তলোয়ার হাতে সম্পূর্ণ ন্যাংটো এক মূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। কুইকেগ! চোখের পলকে সবাই জমায়েত হলো জাহাজের প্রান্তে কিন্তু দু'জনের কারোই কোন চিহ্ন নেই। কয়েকজন নাবিক নেমে পড়ল নৌকো নিয়ে।

ঝুলতে ঝুলতে হঠাৎ চিৎকার ছাড়ল ডাগ্‌গু। বেশ খানিকটা দূরে নীল সাগরের নিচ থেকে ভেসে উঠেছে একটা বাহু। সবার মনে হলো, বাহুটা যেন ছিঁটকে উঠেছে কবরের ঘাস সরিয়ে।

'উঠেছে! উঠেছে! দু'জনেই উঠেছে!' আবার গলা ফাটাল ডাগ্‌গু। এক হাতে পানি কাটছে কুইকেগ, আরেক হাতে ধরে আছে ট্যাসটেগোর চুল। ঝটপট অপেক্ষমাণ নৌকোয় তুলে ওদের আনা হলো ডেকে। কিন্তু ট্যাসটেগোর জ্ঞান ফিরতে অনেক সময় লাগল, কুইকেগকেও খুব সুস্থ মনে হলো না।

তীক্ষ্ণধার তলোয়ারের কোপে হাইডেলবার্গ টানের তলাটা কেটে ফেলেছে কুইকেগ, তারপর লম্বা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ট্যাসটেগোকে বের করে এনেছে চুলের মুঠি ধরে।

প্রায় অবিশ্বাস্য এক জীবন ফিরে পেল ট্যাসটেগো। কিন্তু মরলেও সে-মৃত্যু হত মূল্যবান। ওহাইয়োর কোন মধু-সংগ্রাহক নাকি গাছের খাঁজে মধুর ভাণ্ডার দেখে বেশি ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ পা পিছলে ডুবে গিয়েছিল মধুতে। কুইকেগ উদ্ধার

BanglaBook.org

না করলে গে-হেডারটাও ডুবে থাকত দুধ-সাদা, সুগন্ধী স্পার্মাসেটিতে। এমন মৃত্যু ক'জনের ভাগ্যে জোটে?

৬৯

চেহারার দিক থেকে বিচার করলে স্পার্ম তিমি একটা ব্যতিক্রমী প্রাণী। নাক বলতে আমরা যা বুঝি, তা তার নেই। অথচ নাক মুখমণ্ডলের একটা কেন্দ্রীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চেহারার ভাল-মন্দের অনেকখানিই নির্ভর করে নাকের ওপর। মার্বেল পাথরে নির্মিত অপূর্ব কোন জুপিটারের নাকটা কেবল ভেঙে দিন, দেখুন, তার চেহারার কী গতি হয়! কিন্তু নাক না থাকলে জুপিটারের মূর্তির যা ক্ষতি, স্পার্ম তিমির বেলায় মোটেই তা নয়। বরং মনে হয়, নাক না থাকার ফলেই সে যেন বিশিষ্ট হয়েছে।

স্পার্ম তিমির কপালে রয়েছে অসংখ্য কুঞ্চন, যেন প্রাচীন কোন সাহিত্যিক লিখে রেখেছে মহাগ্রন্থ। কিন্তু কে করবে এর পাঠোদ্ধার! চ্যাম্পোলিয়ন হাইরোগ্লিফিকের পাঠোদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের মুখেও যে-রহস্য লুকিয়ে আছে, তার দুর্বোধ্যতা ঘোচাবে কে? তিরিশটা ভাষা জানা সত্ত্বেও স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্ যদি চাষার মুখের ভাষা পড়তে ব্যর্থ হন, সেখানে তুচ্ছ ইসমাইল কিভাবে আশা করতে পারে তিমির কপালের ভাষা পড়ার? যাক, মহাগ্রন্থের সংবাদটা জানালাম সবাইকে। সুযোগ পেলে চেষ্টা করে দেখবেন, পাঠোদ্ধার করতে পারেন কিনা।

৭০

স্পার্মাসেটি সম্পূর্ণ বের করে নেয়ার পর স্পার্ম তিমির খুলিটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করলে, অবাক হয়ে যাবেন মানুষের খুলির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে। পূর্ণবয়স্ক একটা স্পার্ম তিমির খুলির দৈর্ঘ্য অন্ততপক্ষে বিশ ফুট। নিচের চোয়ালটা খুলে ফেলুন, পাশ থেকে ওটাকে মনে হবে এয়ার-বেসে পড়ে থাকা এরোপ্লেনের মত। খুলির উপরিভাগের প্রান্তে রয়েছে বাটির মত একটা গর্ত। সেই গর্তের মেঝের নিচে রয়েছে দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য আর দশ ইঞ্চি গভীরতার একটা খোপ। ছোট্ট এই খোপেই থাকে দানব প্রাণীটার মগজ।

এবার দুটো কথা বলব স্পার্ম তিমির কুঁজ সম্বন্ধে। অসংখ্য ভার্টেব্রা রয়েছে তিমির শরীরে। যত দূর মনে হয়, অপেক্ষাকৃত বড় একটা ভার্টেব্রার ওপরই গড়ে উঠেছে কুঁজ। আমার মতে, স্পার্ম তিমির মধ্যে যে একটা অদম্য, অটল ভাব আছে, তা এসেছে উঁচু এই কুঁজ থেকে।

BanglaBook.org

পূর্বনির্ধারিত দিন এল। যথাসময়ে জাংফ্রাউ জাহাজের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের।

একসময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত তিমি শিকারী জাতি ডাচ আর জার্মানরা এখন তিমি শিকার প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে কালেভদ্রে এখন চোখে পড়ে তাদের জাহাজ।

দেখা করার জন্যে খুব আগ্রহ প্রকাশ পেল জাংফ্রাউয়ের। অনেক আগেই নৌকো নামিয়ে দিল তারা, স্টার্নের পরিবর্তে ক্যাপটেন এসে দাঁড়াল বোতে।

'ওর হাতে ওটা কি?' জার্মানটার ধরা একটা দোদুল্যমান বস্তুর দিকে নির্দেশ করল স্টারবাক। 'অসম্ভব! এ যে দেখছি একটা ল্যাম্প-ফীডার!'

'না, মি. স্টারবাক,' বলল স্টাব, 'ওটা একটা কফির পাত্র। ওটার পাশে যে আরেকটা পাত্র দেখছেন, তাতে রয়েছে গরম পানি। জার্মান ক্যাপটেন আসছে আমাদের সবাইকে কফি খাওয়াতে।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত, মি. স্টারবাক,' বলল ফ্লাস্ক, 'আসলেই ওটা একটা ল্যাম্প-ফীডার আর পাশেরটা তেলের টিন। জাহাজটার তেল ফুরিয়ে গেছে, তাই আমাদের কাছে চাইতে আসছে।'

স্টারবাক ভুল বলেনি। তিমি শিকারে বেরিয়ে তেল ফুরিয়ে যাওয়া সত্যিই একটা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এমন ঘটনাও ঘটে অনেক সময়। ক্যাপটেন ডেরিক ডী ডিয়ার তেল চাইতেই আসছে।

পেকোডের ডেকে আসতেই তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল ক্যাপটেন আহাব, হাতের টিনটার দিকে তাকিয়েও দেখল না। কিন্তু ভাঙা ভাঙা ভাষায় জার্মানটা বলল যে সাদা কোন তিমিকে সে দেখেনি কোথাও। তারপর জানাল, তাদের শেষ তেলের ফোঁটাটাও গত রাতে শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং তিমি শিকারীদের ভাষায় জাহাজটা এখন 'পরিষ্কার'। তবে জাহাজটার জাংফ্রাউ অর্থাৎ 'কুমারী' নামটা সার্থক হয়েছে।

তেল নিয়ে চলে গেল ডেরিক। কিন্তু জাহাজের পাশে যেতেই তিমি দেখা গেল দুই জাহাজের মাস্ট-হেড থেকেই। তেলের ব্যাপারে জার্মানটা এতই উদ্বিগ্ন হয়েছিল যে জাহাজে না উঠেই পিছু নিল তিমির।

তিমিগুলো ভেসেছে বাতাসের অনুকূলে। সবসুদ্ধ আটটা। শিগগিরই বিপদ টের পেয়ে এগোতে লাগল সামনে।

দলটার বেশ খানিকটা পেছনে পড়ে রয়েছে প্রকাণ্ড এক মদ্দা তিমি। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, ওটা এই দলেরই নাকি নিঃসঙ্গ। তিমিটার রঙ হলুদ, যেন জন্ডিস হয়েছে। তার ফোয়ারাও উঠছে থেমে, খুব ধীরে।

'তোমাদের কারও কাছে বেদনানাশক আছে?' বলল স্টাব, 'বেচারির পেট ব্যথা হয়েছে। যে-পেটের আয়তন আধ একর, তার ব্যথাটা কেমন হবে একবার ভাব। আর ওই যে, তিমিকে তোমরা কখনও এমন হাই তুলতে দেখেছ?'

তিমিটার ডানপাশের পাখনাটা নেই। হয়তো কোন লড়াইয়ে হারিয়েছে,

BanglaBook.org

কিংবা জন্ম থেকেই এমন।

'একটু অপেক্ষা করো, বুড়ো, তোমার আহত হাতের জন্যে একটা স্লিংয়ের ব্যবস্থা করছি,' হোয়েল-লাইন নির্দেশ করে নিষ্ঠুরভাবে বলল ফ্লাস্ক।

'দেখো, সে আবার তোমাকেই না স্লিং পরিয়ে দেয়,' বলল স্টারবাক। 'তাড়াতাড়ি এগোও, নাহলে জার্মানরা তিমিটাকে ধরে ফেলবে।'

দলের মধ্যে এই তিমিটাই সবচেয়ে বড়, রয়েছেও সবার পেছনে, তাই সবগুলো নৌকো ওটাকেই তাড়া করেছে। ডেরিকের নৌকোই সবার আগে। ব্যবধান যদিও দ্রুত কমে আসছে, পেকোডের নাবিকদের আশঙ্কা, জার্মানটা না আগেই হারপুন ছোঁড়ে। ওদিকে প্রথম হারপুন ছোঁড়ার ব্যাপারে ডেরিক নিশ্চিত, তাই মাঝেসাঝে অন্য নৌকোগুলোকে সে উপহাস করছে ল্যাম্প-ফীডার দুলিয়ে।

'অভদ্র, অকৃতজ্ঞ কুকুর কোথাকার!' বলল স্টারবাক, 'এমন এক জিনিস দেখিয়ে বিদ্রূপ করছে, যেটা আমিই ভরে দিয়েছি পাঁচ মিনিট আগে!'– তারপর ফিসফিসিয়ে উঠল নাবিকদের উদ্দেশে– 'জোরে! আরও জোরে!'

'শোনো সবাই,' স্টাব বলল তার নাবিকদের উদ্দেশে, 'আমি রাগ করি, তবে রাগে অন্ধ হওয়া আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু আজ ওই অকৃতজ্ঞ শয়তানকে চিবিয়ে খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। এমন একটা লোকের কাছে তোমরা হার মানতে চাও? ব্র্যাণ্ডি পছন্দ করো তোমরা? সবচেয়ে জোরে যে দাঁড় বাইতে পারবে, তার জন্যে রইল পুরো এক বোতল ব্র্যাণ্ডি!'

'ওহ্! কী ফেনা তুলছে ব্যাটা!' লাফাতে লাফাতে বলল ফ্লাস্ক– 'আর কুঁজটা দেখেছ? বুড়োর গায়ে একশো ব্যারেলের কম তেল হবে না। ওই অমূল্য সম্পদকে হেলায় হারাতে চাও তোমরা? কমপক্ষে ওটার মূল্য তিন হাজার ডলার– ব্যাঙ্ক!– একটা আস্ত ব্যাঙ্ক! ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যাণ্ড! হাত চালাও সবাই!'

মেটদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে পেকোডের তিন নৌকোকে নাবিকেরা এনে ফেলল জার্মানটার প্রায় কাছাকাছি। তবু ডেরিকের সঙ্গে তাঁরা পেরে উঠত না, যদি না তার এক নাবিক হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত। ডোবার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ডেরিক যখন ব্যস্ত, স্টারবাক, স্টাব আর ফ্লাস্কের নৌকো এসে পড়ল তার পাশে।

তিমিটা তখনও এগিয়ে চলেছে একই গতিতে, একইভাবে তার ফোয়ারা উঠছে থেমে থেমে। মাথার ওপর থেকে সাবধানী চিৎকার ছাড়ল সামুদ্রিক একটা পাখি, কিন্তু তিমিটার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

পেকোডের নৌকো পাশে এসে পড়েছে দেখে উঠে দাঁড়াল ডেরিকের হারপুনার। কিন্তু সে হাত তোলার আগেই লাফিয়ে উঠল কুইকেগ, ট্যাসটেগো আর ডাগ্‌গু। প্রায় একইসঙ্গে তিনটে হারপুন ছুটে গিয়ে বিদ্ধ হলো তিমির শরীরে। প্রচণ্ড টানে নৌকোগুলো লাফিয়ে সামনে এগোতেই ধাক্কা খেয়ে পানিতে ছিটকে পড়ল ডেরিক আর তার হতভম্ব হারপুনার।

'ভয় পেয়ো না, ননীর পুতুলেরা,' ছুটতে ছুটতেই চেঁচাল স্টাব, 'তোমাদের উদ্ধার করা হবে– আসার সময় কয়েকটা হাঙর দেখে এসেছি– ওরা আবার বিপদে পড়া ভ্রমণকারীদের খুব সাহায্য করে!'

হোয়েল-লাইন যেভাবে যেতে শুরু করেছিল, তাতে তিন হারপুনার ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল লাইনে শেষমেশ কুলাবে কিনা ভেবে কিন্তু খানিকটা গিয়েই থেমে গেল তিমিটা, যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে

তিমির সঙ্গে তিন নৌকোও নিশ্চল হয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনটে লাইন কাঁপতে শুরু করতেই স্টারবাক বলল, 'লক্ষ রাখো সবাই! তিমিটা নড়ছে, ওই যে উঠছে!'

হারপুন বিদ্ধ হতেই তিমির রক্তপাত শুরু হয়, কিন্তু দানব এই প্রাণীর শরীরে এতই রক্ত থাকে যে অনবরত রক্তক্ষয় সত্ত্বেও কাহিল হতে অনেক সময় লাগে। কাছে গিয়ে বর্শা ছুঁড়তে লাগল সবাই। যন্ত্রণায় রক্তের মাঝে ওল্টাতে লাগল তিমিটা, হঠাৎ চোখে পড়ল তার পাঁজরের কাছে ফ্যাকাসে একটা ফোলা জায়গা।

'চমৎকার জায়গা,' বলল ফ্লাস্ক, 'একটা গুঁতো দিই!'

'থামো,' বলল স্টারবাক, 'তার আর প্রয়োজন হবে না।'

কিন্তু ততক্ষণে ছুটে গেছে ফ্লাস্কের বর্শা। ফোয়ারার মত রক্ত বেরতে লাগল ক্ষতস্থান থেকে। একপাশে ধীরে ধীরে কাৎ হয়ে গেল তিমিটা, অসহায়ভাবে নড়তে লাগল পাখনা। ওটাই ছিল তার মারণাঘাত।

জাহাজের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে নাবিকেরা লক্ষ করল, তিমিটা ডুবে যেতে চাইছে। স্টারবাকের নির্দেশে রশি বাঁধা হলো বিভিন্ন দিক থেকে নৌকো তিনটে কাজ করতে লাগল বয়া হিসেবে।

এই তিমিটাকে কাটার পর ক্ষতস্থানটার কাছে পাওয়া গিয়েছিল মরচে ধরা একটা আস্ত হারপুন। কিন্তু এরকম হারপুন তিমির শরীরে প্রায়ই পাওয়া যায়। পাঁজরের কাছে জায়গাটা ফুলে ওঠার পেছনে নিশ্চয় অন্য কারণ ছিল। অবাক ব্যাপার হলো, তিমিটার ভেতরে পাওয়া গিয়েছিল পাথরের একটা বর্শা। এই বর্শা ছুঁড়েছিল কে? কখন? সম্ভবত এই বর্শা ছুড়েছিল কোন নর্থ-ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান আমেরিকা আবিষ্কারেরও আগে।

জাহাজ এলে তিমিটাকে তার পাশে বাঁধা হলো শেকল দিয়ে। কিন্তু খানিক পরেই সেটা ডুবু ডুবু হলো তিমির টানে। তাড়াহুড়ো করে শেকল কেটে রক্ষা করা হলো পেকোডকে। জাহাজ ভারসাম্য ফিরে পেলেও ডুবে গেল তিমিটা।

হাড় খুব ভারী এবং বেতো না হলে স্পার্ম তিমি সাধারণত ডোবে না। রাইট তিমির তুলনায় স্পার্ম তিমির ডোবার সম্ভাবনা বিশ ভাগের এক ভাগ। রাইট তিমির শরীরে হাড়ের পরিমাণ অনেক বেশি। কখনও কখনও শুধু তার হোয়েলবোনের ওজন হয় এক টনেরও বেশি। ডোবার পর অবশ্য আবার ভেসে ওঠে তিমি, তবে সেটা হয় গ্যাসের কারণে। গ্যাসে ফোলা তিমি পরিণত হয় এক ধরনের প্রাণী-বেলুনে। তখন বোধ হয় এক সারি যুদ্ধজাহাজের পক্ষেও তাকে ডোবানো সম্ভব নয়।

তিমিটা ডুবে যাবার পর বেশিক্ষণ হয়নি। পেকোডের মাস্ট-হেডার জানাল, জাংফ্রাউ আবার নৌকো নামাচ্ছে। এখন যে-ফোয়ারাটা দেখা যাচ্ছে, সেটা ফিনব্যাকের। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সাঁতরাতে পারে বলে আজ পর্যন্ত কেউ মারতে

BanglaBook.org

পারেনি ফিনব্যাক তিমি। অথচ তারই পিছু নিয়ে দেখতে দেখতে দৃষ্টিপথ থেকে উধাও হয়ে গেল জাংফ্রাউয়ের চারটে নৌকো।

৭২

জার্মান জাহাজ জাংফ্রাউ চলে যাবার ক'দিন পরেই এক দুপুরে তিমি দেখা গেল।

ধাওয়া করা হলো নৌকো নামিয়ে। সবার আগে স্টাব। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ট্যাস্টেগো একটা হারপুন লাগাতে পারল। কিন্তু তিমিটা এত জোরে ছুটতে লাগল যে হারপুন খোলে খোলে অবস্থা। ছুটন্ত তিমিকে বর্শা লাগানোও সম্ভব নয়। তাহলে উপায়?

উপায় একটা আছে। অভিজ্ঞ হোয়েলম্যানরা এই পরিস্থিতিতে যেভাবে বর্শা ছুঁড়ে তিমিকে ঘায়েল করে, তাকে বলে পিচপোলিং। ইস্পাত আর কাঠে নির্মিত বর্শাটা লম্বা হয় দশ থেকে বারো ফুট। বর্শার সঙ্গে যুক্ত থাকে ছোট একটা রশি, যেটাকে বলে ওয়ার্প (Warp)। এই ওয়ার্পের জন্যেই বর্শা ছুঁড়েও আবার ফেরৎ আনা যায়।

পিচপোলিংয়ের বর্শা হারপুনের চেয়ে লম্বা এবং হালকা। বেশি ভারী হওয়ার জন্যেই হারপুন দিয়ে পিচপোলিং হয় না।

সবসময় রসিকতা করে স্টাব, কিন্তু এখন তার মধ্যে রসিকতার চিহ্নমাত্র নেই। নৌকোর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, দৃষ্টি ধাবমান তিমিটার ওপর। তার হাত ওপরে উঠে গেল, পরমুহূর্তেই বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটে গেল বর্শা, বিরাট এক রূপালী বাঁক নিয়ে লক্ষ্যভেদ করল। তিমিটার স্পাউট দিয়ে পানির বদলে উঠল রক্তের ফোয়ারা।

'ব্যাটার ছিপি খুলে দিয়েছি!' মুহূর্তে স্টাব রূপান্তরিত হলো আসল স্টাবে। বার বার বর্শা ছুঁড়তে লাগল সে, বার বার সে বর্শা তার কাছে ফিরে এল শেকল লাগানো গ্রেহাউণ্ড কুকুরের মত। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল তিমিটা, ঢিল দেয়া হলো হোয়েল-লাইনে, তারপর স্টার্নে বসে, হাত মুড়ে দানবটার মৃত্যু দেখতে লাগল স্টাব।

BanglaBook.org

৭৩

হয়তো ছয় হাজার বছর– কিংবা কে জানে, হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর আগে থেকে অতিকায় তিমিরা তাদের ফোয়ারা ছাড়তে ছাড়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে মহাসাগরে। অথচ আজ পর্যন্ত মানুষ জানে না, কি ওঠে তার ফোয়ারা দিয়ে– পানি নাকি বাষ্প। এটা সত্যিই একটা ভাবনার বিষয়।

ফুলকাঅলা প্রাণীরা তাদের ফুলকার সাহায্যে শ্বাস নিতে পারে। ফলে হেরিং বা কড মাছের পক্ষে পানির ওপরে একবারও মাথা না তুলে বেঁচে থাকা সম্ভব। কিন্তু মানুষের মত ফুসফুস থাকায় তিমিকে ওপরে উঠতেই হবে। তিমি মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে পারে না, কারণ, একটা স্পার্ম তিমির মুখ থাকে পানির অন্তত আট ফুট

নিচে। তার চেয়েও বড় কথা, তিমির মুখের সঙ্গে শ্বাসনালীর যোগাযোগ নেই। সে শ্বাস নেয় স্পাউট দিয়ে, যে-অঙ্গটা রয়েছে তার মাথার ওপর।

মানুষের রক্তের সঙ্গে যদি বাতাস মিশিয়ে দেয়া যায়, তাহলে শ্বাস না নিয়েও সে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবে। এজন্যেই তিমি এক ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় একবারও শ্বাস না নিয়ে থাকতে পারে পানির নিচে। তিমির পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে এবং মেরুদণ্ডের পাশে রয়েছে সেমাইয়ের মত অসংখ্য শিরা, যেখানে রক্তের সঙ্গে বাতাস মিশে থাকতে পারে।

আগেই বলেছি, তিমি শ্বাস নেয় তার স্পাউট দিয়ে। এখন যদি ধরে নিই, তার স্পাউটে সবসময়ই কিছু না কিছু পানি থাকে, তাহলেই বোঝা যাবে যে কেন তিমি গন্ধ পায় না। অবশ্য স্পার্ম তিমির কোন ঘ্রাণকোষও নেই। থাকবার প্রয়োজনটাই বা কি? সাগরের অতলে কোন গোলাপ বা ভায়োলেট ফোটে না যে গন্ধ শুঁকবে।

এছাড়া শ্বাসনালী স্পাউটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে তিমির সত্যিকারের কোন স্বরও নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে তার গুমগুম শব্দ শুনে যদি আপনি বলেন, তিমি কথা বলে তার নাক দিয়ে, তাহলে আমার বলবার কিছু নেই।

স্পাউটের ভেতরটা অবিকল গ্যাস পাইপের মত। কিন্তু এই গ্যাস পাইপকে তিমি পানির পাইপ হিসেবেও ব্যবহার করে কিনা, সেটাই হলো কথা। হয়তো বলবেন, পানি আর গ্যাসের পার্থক্য বোঝা যাবে না? পৃথিবীতে সহজ জিনিসগুলো বোঝা সহজ নয়। আমি তো দেখেছি, সহজ জিনিসের মধ্যেই থাকে যতসব জটিলতা। আপনি একেবারে স্পাউটের ওপর অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েও স্পাউট সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে পারবেন না।

তিমির স্পাউট দিয়ে ঠিক কি ওঠে, তা দেখার জন্যে আজ পর্যন্ত কেউ সেখানে চোখ লাগিয়েছে বলে আমার জানা নেই। ব্যাপারটা নিরাপদও নয়। বাষ্প বা পানি যা-ই হোক, সেটা লেগে চোখ জ্বালা করতে পারে। একজন লোকের কথা জানি, যে স্পাউটের একেবারে কাছে গিয়েছিল। চিবুক আর বাহুর চামড়া উঠে গিয়েছিল বেচারির। তারপর থেকে হোয়েলম্যানরা স্পাউটকে বিষাক্ত ভাবে। অনেককে বলতে শুনেছি, তিমির ফোয়ারা সরাসরি চোখে লাগলে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। এই কথাটা আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং সুযোগ পেলেও স্পাউটের বেশি কাছে না যাওয়াই ভাল।

তাহলে এত আলোচনার পরেও দেখা যাচ্ছে, তিমির ফোয়ারা সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। আমরা কেবল অনুমান করতে পারি। তো, আমার অনুমান হলো, তিমির এই ফোয়ারা কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাথার ওপর কুয়াশার চাঁদোয়া সৃষ্টি করে অতিকায় প্রাণীগুলো ঘুরে বেড়ায় এক মহাসাগর থেকে আরেক মহাসাগরে।

BanglaBook.org

অ্যান্টিলোপের নরম চোখ আর পাখির রঙিন পালকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে কবিরা। কিন্তু আমি বলতে চাই তিমির লেজ সম্বন্ধে।

বড় আকারের একটা স্পার্ম তিমির লেজের মাপ হবে কমপক্ষে পঞ্চাশ বর্গফুট। যেখানটায় লেজ সবচেয়ে সরু, সেই জায়গাটাও মানুষের কোমরের সমান মোটা। এক ইঞ্চি পুরু ফ্লুক (FLUKE) দুটো পাখির ডানার মত দু'দিকে ছড়ানো।

উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার হলো, এক স্পার্ম তিমি আরেক স্পার্ম তিমির সঙ্গে লড়াইয়ে ব্যবহার করে মাথা আর চোয়াল, কিন্তু মানুষের সঙ্গে প্রধানত লেজ। এই লেজ সরাসরি কোন জিনিসের ওপর নেমে এলে তা আর আস্ত থাকে না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ বা নৌকো আসেনি, তিমির লেজের সরাসরি আঘাত সহ্য করতে পারে। তবে হোয়েলবোটে আঘাত সাধারণত পাশ থেকে পড়ে পিছলে যায়। ফলে বড়জোর কারও পাঁজর ভাঙে কিংবা খুলে যায় দু'একটা তক্তা।

তিমির লেজ আর হাতির শুঁড়– দুটোই খুব স্পর্শকাতর অঙ্গ। কিন্তু তাই বলে অঙ্গ দুটো কখনোই তুলনীয় হতে পারে না। কারণ, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান হাতিটাও তিমির কাছে একটা টেরিয়ার কুকুর মাত্র। তিমির লেজের কাছে হাতির শুঁড় শাপলার ডাঁটা। হাতির শুঁড়ের সবচেয়ে কঠিন আঘাত তিমির লেজের তুলনায় হাতপাখার বাড়ি। স্পার্ম তিমির লেজের প্রচণ্ড আঘাতে দাঁড়, নাবিক, এমনকি আস্ত নৌকো পর্যন্ত উড়ে চলে যায় জাদুকরের হাতের বলের মত।

তিমির রাজকীয় লেজ একটা দেখবার মত জিনিস। এক ভোরে দাঁড়িয়ে আছি পেকোডের মাস্ট-হেডে। চারদিক স্তব্ধ। আকাশ আর সাগরে সূর্য কেবল লাগিয়েছে লাল ছোপ। হঠাৎ দেখি, তিমির বিরাট এক দল পুবদিকে যেতে যেতে তাদের লেজগুলো তুলে ধরল ওপরে। মনে হলো, সবচেয়ে শক্তিমান প্রাণী যেন তাদের ভক্তি নিংড়ে দিচ্ছে ঈশ্বরের উদ্দেশে। রাজা জুবার বর্ণনাতেও পাওয়া যায়, সেকালের জঙ্গী মেজাজের হাতিরা নাকি শুঁড় ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকত ভোরের স্তব্ধ নীরবতায়।

৭৫

সরু, লম্বা মালাক্কা প্রণালী বার্মা থেকে দক্ষিণ-পুবে এগিয়ে গড়ে তুলেছে এশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তের দেশগুলো। লাইন ধরে চলে গেছে সুমাত্রা, জাভা, বালি আর তৈমুর। অন্য সব ছোট ছোট দ্বীপের সঙ্গে মিলে এই দ্বীপগুলো এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়াকে যুক্ত করেছে, সেইসঙ্গে প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জকে পৃথক করেছে ভারত মহাসাগর থেকে। এখানে রয়েছে বেশ কয়েকটা স্যালি-পোর্ট, যেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মালাক্কা আর সুন্দা প্রণালী। চীনগামী জলযানগুলো

প্রধানত সুন্দা প্রণালী দিয়েই চীন সাগরে আসে।

পেকোড এখন এগিয়ে চলেছে সেই প্রণালীগুলোর দিকেই। জাভা সাগরে পড়ে আহাব এগোতে চায় উত্তরে, সেখানে স্পার্ম তিমির কয়েকটা ক্ষেত্র দেখে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হয়ে জাপানের উপকূলে। যে-ঋতুতে জাপানে প্রচুর তিমি আসে, সে-সময়টা পার করে দিয়ে মবি ডিকের মুখোমুখি হবার জন্যে সে আবার উপস্থিত হবে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তে।

কিন্তু জাহাজ প্রণালীতে পড়তেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল। বিরাট একটা বৃত্ত রচনা করে ফোয়ারা তুলছে দলে দলে তিমি। তৎক্ষণাৎ নৌকো নামানো হলো পেকোড থেকে। কিন্তু ধাওয়া করার পর মাত্র একটা তিমি মারা পড়ল ফ্লাস্কের হাতে। কুইকেগ একটাকে হারপুনে গেঁথেছিল, কিন্তু সেটা খুলে গেল অনেকখানি দৌড়ে। তিমি শিকারে একটা প্রবাদ আছে– যত বেশি তিমি তত কম শিকার। সেটাই আজ সত্যি হলো।

৭৬

গত অধ্যায়ে বলেছি তিমির বিশাল এক দলের কথা। তবে বিশ বা পঞ্চাশটা তিমির ছোট ছোট দলও দেখা যায় অনেক সময়। এরকম দলকে বলে স্কুল। স্কুল দেখা যায় প্রধানত দুই ধরনের। কোনটায় থাকে শুধুই মাদি তিমি, আবার কোনটায় সমস্ত মাদিকে পরিচালনা করে একটা মাত্র মদ্দা।

লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, কোথাও কোন বিপদের আশঙ্কা টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে মদ্দাটা চলে যাচ্ছে দলের পেছনে, যেন এগোতে চায় সবাইকে আগলে নিয়ে। মদ্দা এই তিমি একজন বিলাসী ভদ্রলোক, পৃথিবীর জলরাশিগুলো হারেম সঙ্গে নিয়ে প্রদক্ষিণ করে বেড়ায় সে।

হারেমের ওপর থাকে তার তীক্ষ্ণ চোখ। অন্য কোথাও থেকে কোন মদ্দা এসে তার কোন রক্ষিতার কাছে ঘোরাঘুরি শুরু করলে ভয়ঙ্কর মেজাজে আক্রমণ করে সে। অনেক সময় রক্ষিতাদের মধ্যেও লড়াই বেধে যায় ভালবাসার ভাগাভাগি নিয়ে।

এই ধরনের দলকে জেলেরা যেহেতু স্কুল বলে, স্কুলের পরিচালক মদ্দাটাকে তারা বলে স্কুলমাস্টার। পরিচালকের এরকম নামকরণের পেছনে কোন বিদ্রূপ লুকিয়ে আছে কিনা, তা আমার জানা নেই।

তবে বয়স বাড়লে এই স্কুলমাস্টাররা যেমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে, সেটা বুড়ো সব স্পার্ম তিমিরই নিয়তি। তখন সে একেবারেই একা, সেই নিঃসঙ্গতায় তার সঙ্গী বলতে শুধুই প্রকৃতি।

মাদি তিমিদের যেমন স্কুল আছে, তেমনি স্কুল আছে মর্দাদের। সেসব স্কুলে থাকে খুবই বদমেজাজি সব মদ্দা, জেলেরা যাদের বলে 'ফরটি ব্যারেল বুল'। মারামারি, কামড়া-কামড়ি করে এরা কাটিয়ে দেয় জীবনের বেশ কয়েকটা বছর। তারপর বয়স একটু বাড়লে দলছুট হয়ে বেরিয়ে পড়ে হারেমের সন্ধানে।

মাদি আর মর্দাদের স্কুলের মধ্যে একটা চরিত্রগত পার্থক্য আছে। আপনি যদি কোন ফরটি ব্যারেল বুলকে আঘাত করেন, বাকি সবাই ছেড়ে চলে যাবে তাকে। কিন্তু কোন মাদিকে আঘাত করলে স্কুলের আর সব মাদি চলে আসবে তার কাছাকাছি, ঘিরে ধরবে, এমনকি প্রয়োজনে আহত হবে নিজেরাই।

৭৭

তিমি শিকারে এমন প্রায়ই ঘটে, কোন তিমিকে আহত করল এক জাহাজ আর মারল আরেক জাহাজ। ধরা যাক, সারাদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধাওয়া করে কোন জাহাজ একটা তিমিকে ধরে বেঁধে রাখল পাশে। কিন্তু রাতে ঝড়ে খুলে গেল তিমিটা, এবং পরে আসা একটা জাহাজ আরাম করে সেটাকে ধরে নিল। প্রশ্ন হচ্ছে, তিমিটা আসলে কার পাওয়া উচিত। এই ব্যাপারটা নিয়ে জাহাজে জাহাজে চূড়ান্ত বিরোধের সূত্রপাত হয়। বিরোধ ক্রমে আরও বাড়বে, যদি না পুরো ব্যাপারটাকে একটা আইনের আওতায় আনা যায়।

যত দূর জানি, তিমি সংক্রান্ত আইন পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত একবারই পাস হয়েছে। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে, হল্যাণ্ডে। এরপর আর কোন দেশ লিখিত আইন পাস না করলেও আমেরিকান তিমি শিকারীরা নিজস্ব আইনের আওতায় চলে। কিন্তু তাদের আইনের ধারা এতই কম যে অনায়াসেই একটা পেন্সের ওপর খোদাই করে রেখে দেয়া যাবে পকেটে।

ধারা ১, বাঁধা মাছ প্রথম যে-জাহাজ তাকে ধরবে, সে-ই পাবে।

ধারা ২, খুলে যাওয়া মাছ পরে যে-কেউ শিকার করতে পারবে!

৭৮

সন্দা প্রণালীতে তিমির সেই বিশাল দল দেখার এক কি দু'সপ্তাহ পরের কথা। পেকোড এগোচ্ছে, হঠাৎ সবার নাকে এসে ঝাপটা মারল বাজে একটা গন্ধ।

'বাজি ধরতে পারি,' বলল স্টাব, 'সেদিন আমাদের দেখা কোন তিমিকে মেরে এগিয়ে আসছে একটা জাহাজ।'

খানিক পরেই জাহাজ দেখা গেল দূরে। কাছাকাছি হতে পাশে বাঁধা একটা তিমি চোখে পড়ল, তিমি শিকারীরা এ ধরনের তিমিকে বলে ব্লাস্টেড তিমি। স্বাভাবিকভাবে মারা গিয়ে পানিতে ভাসমান তিমিকে ব্লাস্টেড তিমি বলে। জাহাজ আরও কাছে আসতে পতাকা দেখে বোঝা গেল, জাহাজটা ফ্রান্সের, আর তিমি একটা নয় দুটো। দ্বিতীয় তিমিটা প্রথমটার চেয়েও গন্ধ ছড়াচ্ছে। এটা একেবারে শুকনো, যেন মারা গেছে বদহজমে। এই জাতীয় তিমির তেলও খুবই কম পাওয়া যায়।

দুটো জাহাজ একদম পাশাপাশি এসে দাঁড়াল। স্টাব বলল, 'এই ফরাসীগুলোকে আমি খুব ভাল করে চিনি। এরা এক অদ্ভুত চিজ! কখনও নৌকো নামায় ব্রেকারকে স্পার্ম তিমির ফোয়ারা মনে করে, কখনও বন্দর ছাড়ার সময়েই

BanglaBook.org

জাহাজে তোলে বাক্স বাক্স চর্বির মোমবাতি। কারণ, শিকারে যা চর্বি পাওয়া যাবে তা দিয়ে যদি ক্যাপটেনের সলতে না ভেজে! প্রথম তিমিটার তেল যেরকম হবে, সেটা জেলখানায়, এমনকি ফাঁসির আসামীর সেলে জ্বালাবারও যোগ্য নয়। দ্বিতীয় তিমিটারও একই অবস্থা। তবে এটায় রয়েছে তেলের চেয়ে অনেক মূল্যবান এক পদার্থ– অ্যামবারগ্রিস। আমাদের বুড়ো সেই পদার্থের কথা ভেবেছে বলে মনে হয় না। আমি একবার চেষ্টা করে দেখব, ওটা সংগ্রহ করা যায় কিনা।' রওনা দিল সে কোয়ার্টার-ডেকের দিকে।

জাহাজটার হেড বোর্ডে গিলটি করা অক্ষরে বড় বড় করে লেখা রয়েছে– বুতোঁ দ্য রোজ অর্থাৎ রোজ-বাটন বা রোজ-বাড।

'কাঠের গোলাপ কুঁড়ি, অ্যাঁ?' নাকে হাত দিল স্টাব, 'বেশ, বেশ। তবে এই গোলাপের গন্ধটা যেন কেমন!'

ডেকের লোকদের সঙ্গে কথোপকথন এড়াবার জন্যে স্টারবোর্ডে চলে এল স্টাব, ব্লাস্টেড তিমিটার কাছে। হাত তখনও নাক থেকে সরেনি, বলল, 'কে আছ! গোলাপ কুঁড়িদের কেউ ইংরেজীতে কথা বলতে পারে?'

'হ্যাঁ,' বুলওয়ার্কের কাছ থেকে এগিয়ে এল গেঞ্জি পরা এক লোক। এই লোকটাই রোজ-বাডের চীফ মেট।

'বেশ। তাহলে বলুন, সাদা তিমিটাকে আপনারা দেখেছেন?'

'কী তিমি?'

'সাদা তিমি– একটা স্পার্ম তিমি– আপনারা ওটা দেখেছেন?'

'জীবনেও শুনিনি এরকম তিমির কথা।'

'খুব ভাল কাজ করেছেন। একটু অপেক্ষা করুন দয়া করে, আমি মিনিটখানেকের মধ্যেই আসছি।'

সংবাদের জন্যে কোয়ার্টার-ডেকের রেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আহাব। দু'হাত সিঙ্গার মত গোল করে মুখের সামনে ধরে স্টাব বলল, 'না, স্যার, না!' আহাব ফিরে গেল কেবিনে, স্টাব ফিরল ফরাসীটার কাছে।

সে তখন নাক কাপড়ে ঢেকে পাশে দাঁড়িয়েছে তিমিটার পাশে, হাতে বড়সড় একটা কাটিং-স্পেড।

'নাকে কি হয়েছে আপনার?' বলল স্টাব। 'ভেঙে গেছে?'

'ভেঙে গেলে তো বেঁচেই যেতাম, কিংবা আমার যদি কোন নাকই না থাকত!' গজগজ করতে লাগল হাতের কাজের ওপর বিরক্ত ফরাসীটা। 'কিন্তু আপনি আবার নাক ধরে আছেন কেন?'

'সে আর বলবেন না! মোমের নাক, ধরে না থেকে উপায় নেই। আবহাওয়া বেশ সুন্দর, তাই না? চারপাশে কেমন একটা বাগান বাগান গন্ধ। আমাদের এক গুচ্ছ ফুল দেবেন?'

'আপনি এখানে ঠিক কি চান বলুন তো?' রেগে গেল গেঞ্জি।

'আহা! রাগবেন না, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন– ঠাণ্ডা হয়েছে? হ্যাঁ, মাথা ঠাণ্ডা রাখাটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা। কাজ করার সময় তিমিগুলোকে বরফে ঢেকে নিলেই পারেন। না, থাক, আর রসিকতা নয়। আচ্ছা, মি. রোজ-বাড, এই ধরনের

BanglaBook.org

তিমিতে যে তেল হয় না, সেটা আপনাদের জানা নেই? সবসুদ্ধ এক জিল (Gill আড়াই আউন্স) তেলও তো পাবেন না।'

'সে আমার খুব ভালভাবেই জানা আছে। কিন্তু ক্যাপটেন বিশ্বাস করে না। এটাই তার প্রথম তিমি শিকার অভিযান। একটু চেষ্টা করে দেখুন না, আপনার কথা বিশ্বাস করতেও পারে। আর যদি কোনরকমে বিশ্বাস করে, আমিও এই যন্ত্রণা থেকে বেঁচে যাই!'

'আপনাকে রক্ষা করতে আমি যে-কোন কাজে রাজি, মাই ডিয়ার,' বলে স্টাব চলে এল ডেকে। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য। লাল ক্যাপ পরা নাবিকেরা ভারী ভারী ট্যাকল এনে জমা করছে তিমি দুটোকে কাটার জন্যে। তবে কাজ তারা যতটা না করছে, তার চেয়ে কথা বলছে বেশি, আর সেসব কথাতে রসিকতার ছোঁয়ামাত্র নেই। নাক যথাসম্ভব উঁচিয়ে রেখেছে তারা, আর কাজ ফেলে মাঝেসাঝেই মাস্ট-হেডের কাছে ছুটে যাচ্ছে তাজা বাতাসে শ্বাস নিতে। কেউ কেউ ভাবছে তাদের প্লেগ হতে পারে, তাই একটু পরপরই দড়ি শুঁকছে আলকাতরায় চুবিয়ে। অন্যেরা গন্ধের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘনঘন পাইপ টানছে, যেন ঘ্রাণ কোষগুলো সবসময় ভরে থাকে তামাকের গন্ধে।

অদ্ভুত দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে মনে মনে একটা পরিকল্পনা খাড়া করল স্টাব। চীফ মেটের সঙ্গে খানিক আলাপেই সে বুঝতে পারল, ল্যামবারগ্রিস সম্বন্ধে কিছুই জানে না লোকটা। ঠিক হলো, চীফ মেট দোভাষী হবার ভান করে, তিমিগুলোর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে, যা খুশি বলবে ক্যাপটেনকে। সুতরাং সাজিয়ে কথা বলার দায় স্টাবের নেই, সেও বলবে মুখে যা আসবে তা-ই।

কেবিন থেকে ক্যাপটেন বেরিয়ে আসতেই স্টাবের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল গেঞ্জি। দোভাষীর ভূমিকা নিতেও দেরি হলো না।

'তাহলে প্রথমে আমি কি বলব?' জানতে চাইল সে।

'বলুন,' তাকাল স্টাব ক্যাপটেনের দিকে, 'তাঁকে দেখে আমার বাচ্চাদের মত মনে হচ্ছে।'

'মঁসিয়ে, উনি বলছেন,' ক্যাপটেনের দিকে ফিরে গেঞ্জি বলল ফরাসী ভাষায়, 'গতকাল তাঁদের দেখা হয়েছিল এক জাহাজের সঙ্গে, যেটার ক্যাপটেন, চীফ মেট আর ছয় জন নাবিক মারা গেছে অদ্ভুত এক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে। জ্বরটা নাকি হয়েছিল তাদের জাহাজের পাশে বেঁধে রাখা এক ব্লাস্টেড তিমি থেকে।'

গল্পটা শোনার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠল ক্যাপটেন।

'এবার কি বলব?' চীফ মেট ফিরল স্টাবের দিকে।

'বলুন, আমার প্রথম কথাটায় তিনি যখন কিছু মনে করেননি, তখন আমি নিশ্চিত যে হোয়েল-শিপের ক্যাপটেন হবার উপযুক্ত উনি নন। তাই আমি তাঁকে একটা বেবুন বলে ঘোষণা করছি।'

'মঁসিয়ে, উনি ঘোষণা করছেন, শুকনো তিমি ব্লাস্টেড তিমির চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। সুতরাং প্রাণের যদি কোন মায়া আমাদের থেকে থাকে, তাহলে এই

BanglaBook.org

মুহূর্তে মাছ দুটোকে খুলে দেয়া উচিত।'

সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদের আদেশ দিল ক্যাপটেন তিমি দুটোর শেকল খুলে দেয়ার জন্যে।

'এবার?' ক্যাপটেন ফিরে আসতে জানতে চাইল গেঞ্জি।

'এবার– একটু ভাবতে দিন। হ্যাঁ, এবার বলতে পারেন যে আমি তাঁকে ঠকিয়েছি, বোধ হয় (মুখটা অন্য পাশে ঘুরিয়ে) আরেকজনকেও।'

'মঁসিয়ে, উনি বলছেন যে আমাদের কাজে লাগতে পেরে উনি খুশি হয়েছেন।'

এ-কথা শুনে ক্যাপটেন জানাল, সে আর মেট তার কাছে কৃতজ্ঞ। শেষে বুদোঁ পানের জন্যে সে দাওয়াত দিল স্টাবকে।

'ক্যাপটেন তাঁর সঙ্গে এক গ্লাস ওয়াইন খেতে বলছেন আপনাকে,' জানাল দোভাষী।

'ক্যাপটেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁকে বলুন, যেসব মানুষকে আমি ঠকাই, তাদের সঙ্গে ওয়াইন খাওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ। আসলে তাঁকে বলুন যে এবার আমাকে যেতে হবে।'

'মঁসিয়ে, নীতিগতভাবে উনি মদ খান না। তবে আপনি যদি জীবনে আর একটা দিনও মদ খেতে চান, উনি বলছেন, কালবিলম্ব না করে এই স্থান আপনার ত্যাগ করা উচিত।'

দেখতে দেখতে দূরে চলে গেল রোজ-বাড। পেকোডের আড়াল ব্যবহার করে নৌকো নিয়ে শুকনো তিমিটার কাছে এসে পৌঁছল স্টাব। ধারাল বোট-স্পেড দিয়ে তিমিটার পাশের পাখনার সামান্য পেছনে কাটল সে। উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল নাবিকেরা, যেন এখনই বেরিয়ে আসবে ওগুলন।

বেশ কিছুক্ষণ কাটাকাটির পর যখন কেবল হতাশ হতে শুরু করেছে স্টাব, ঠিক তখনই দুর্গন্ধকে ছাপিয়ে ভেসে এল একটা মিষ্টি গন্ধ।

'পেয়েছি, পেয়েছি!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে তিমির শরীরের কাটা জায়গা দিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল স্টাব।

পুরানো পনিরের মত মুঠো পরিমাণ জিনিস উঠে এল তার হাতে। নরম, হলুদ আর ছাইয়ের মাঝামাঝি রঙের এই জিনিসটাকেই বলে অ্যামবারগ্রিস। যে-কোন ড্রাগিস্ট এর একেক আউন্স কিনবে এক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। ছয় মুঠো অ্যামবারগ্রিস তুলল স্টাব, খানিকটা নষ্ট হয়ে গেল সাগরের পানিতে। তবু হয়তো আরও কিছুটা তোলা যেত, কিন্তু আহাব তাকে আদেশ দিল তক্ষুণি পেকোডে ফিরে আসার জন্যে। আদেশ মানতে বাধ্য হলো স্টাব। কারণ, রদমেজাজী আহাবের পক্ষে তাকে ফেলে চলে যাওয়াটাও তেমন বিচিত্র কিছু নয়।

৭৯

অ্যামবারগ্রিস একটা অদ্ভুত জিনিস। এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে ন্যানটাকেটে জনগ্রহণকারী ক্যাপটেন কফিনকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল

হাউস অভ কমন্সের বারে। কারণ, তখন এমনকি তার অনেক দিন পরেও মানুষ অম্বর আর অ্যামবারগ্রিস নিয়ে ধাঁধায় পড়ত। অ্যামবারগ্রিস বলতে ফরাসী ভাষায় যদিও ধূসর অম্বর বোঝায়, আসলে জিনিস দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। অম্বর সাগর উপকূল ছাড়াও পাওয়া যায়, কিন্তু অ্যামবারগ্রিস সাগর ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। অম্বর একটা শক্ত, স্বচ্ছ, ভঙ্গুর, গন্ধহীন জিনিস, যেটা ব্যবহৃত হয় পাইপের মাউথপিস, পুঁতি আর অলঙ্কার তৈরির কাজে। কিন্তু অ্যামবারগ্রিস নরম; সুগন্ধী, মোমের মত একটা জিনিস, যা দিয়ে প্রধানত তৈরি হয় পারফিউম, প্যাসটিল, দামী মোমবাতি, হেয়ার-পাউডার আর পমেড। তুর্কীরা এটা ব্যবহার করে রান্নায়। কোন কোন মদ ব্যবসায়ী সুগন্ধের জন্যে এর কয়েক ফোঁটা মেশায় ক্ল্যারেটের সঙ্গে।

কেউ কি কল্পনা করতে পারবে, অভিজাত নারী-পুরুষ যে-সুগন্ধী মেখে তৃপ্ত হয়, সেটা পাওয়া যায় রোগা তিমির ভেতরে! এই অ্যামবারগ্রিসের কারণেই তিমির বদহজম হয়। আর সেই অসুখ সারে কিভাবে, বলা কঠিন।

বলতে ভুলে গেছি, অ্যামবারগ্রিসের মধ্যে স্টাব পেয়েছিল গোল গোল, হাড়ের মত শক্ত জিনিস। প্রথমটায় সে ভেবেছিল, ওগুলো বোধহয় নাবিকদের ট্রাউজার্সের বোতাম। কিন্তু পরে দেখা গেল, ওগুলো আসলে স্কুইডের হাড়। খেয়ে হজম করতে পারেনি তিমিটা।

৮০

ফরাসী জাহাজ রোজ-বাডের সঙ্গে দেখা হবার অল্প ক'দিন পরেই পেকোডের নাবিকদের জীবনে ঘটল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

হোয়েল-শিপে তিমিকে ধাওয়া করার সময় সবাই নৌকোয় চলে যায় না। দেখাশোনার জন্যে কিছু কিছু লোক তখনও থেকে যায় জাহাজে, যাদের বলে শিপ-কিপার। এরাও নাবিকদের মতই শক্ত-সমর্থ। এমনি একজন শিপ-কিপার হলো নিগ্রো ছেলে পিপিন, যাকে সবাই পিপ বলে ডাকে।

কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে একটা বছর যেন তিনশো পঁয়ষট্টিটা চৌঠা জুলাই আর নববর্ষের দিনে ভরা। এই যে এখন লিখব, ছেলেটা ছিল চমৎকার, পড়ে যেন আবার হাসবেন না। কালোরও রয়েছে চমৎকারিত্ব। রাজাদের ক্যাবিনেটে চকচকে আবলুস কখনও দেখেছেন? যাক গে, কাহিনীতে ফিরে আসি।

অ্যামবারগ্রিস সংগ্রহ করতে গিয়ে স্টাবের নৌকোর এক নাবিকের হাত মচকে গিয়েছিল। ফলে সাময়িকভাবে তার স্থলাভিষিক্ত হলো পিপ।

প্রথম বার তিমিকে ধাওয়া করতে গিয়ে কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়লেও মোটামুটি কাজ চালিয়ে গেল পিপ। ব্যাপারটা লক্ষ করে তাকে সাহস জোগাল স্টাব। নাবিকটা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত পিপকে তার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বার ধাওয়া করতে গিয়ে নৌকো উঠে গেল তিমির প্রায় ওপরে। হারপুন খেয়ে তিমি ঘুরে গেল পিপের ঠিক নিচ দিয়ে। আতঙ্কে অস্থির হয়ে দাঁড় হাতে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিপ, আর ঠিক তখনই তিমি ছুটতে লাগল তীব্র

গতিতে। হোয়েল-লাইন পেঁচিয়ে গেল পিপের শরীরে।

বোতে দাঁড়িয়ে ছিল ট্যাসটেগো। কাপুরুষ ভেবে পিপকে সে সহ্যই করতে পারত না। তাই কোমর থেকে ছুরি বের করে, লাইনে ঠেকিয়েও ঘুরল সে স্টাবের দিকে, 'কাটব?' ওদিকে পিপের রক্তশূন্য মুখ বলছে– ঈশ্বরের দোহাই, কিছু একটা করো তোমরা! মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেল পুরো ঘটনাটা।

'কাটো!' গর্জে উঠল স্টাব। ফলে তিমিটা হাতছাড়া হয়ে গেলেও রক্ষা পেল পিপ।

একটু সুস্থ হতেই পিপকে অভিশাপ দিতে লাগল নাবিকরা। তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হলে নিজস্ব স্টাইলে হাসিমুখে পিপকে অভিশাপ দিল স্টাব। তারপর শুরু হলো উপদেশের পালা, যার মোদ্দা কথা– কোন অবস্থাতেই নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়া চলবে না। কিন্তু তিমি শিকারে এমন পরিস্থিতিরও মুখোমুখি হতে হয়, যখন নৌকোয় বসে থাকার চেয়ে লাফিয়ে পড়াটাই অনেক বেশি নিরাপদ। স্টাবের উপদেশ শেষ হলো এরকম আদেশের মধ্যে দিয়ে, 'নৌকোয় বসে থাকবে। যদি লাফ দাও, সত্যি বলছি, আমি তোমাকে তুলে নেব না। তোমার মত ছেলের জন্যে তিমি হারানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পিপ, আলাবামায় একটা তিমি তোমার চেয়ে ত্রিশ গুণ দামে বিক্রি হবে। কথাটা মনে রেখো, এবং লাফ দিয়ো না।' কথাগুলো বলে পরোক্ষভাবে স্টাব বোঝাতে চাইল, সঙ্গীকে ভালবাসলেও মানুষ একটা টাকা উৎপাদনকারী প্রাণী। মানুষের এই ঝোঁকের কাছে অনেক সময় সদাশয়তা হার মানে।

কিন্তু আমাদের সবার ভবিষ্যতের ভার তো ঈশ্বরের হাতে। আবার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিপ। ঘটনা প্রায় গত বারের মতই ঘটল, শুধু এবারে সে হোয়েল-লাইনে জড়িয়ে গেল না। চমৎকার দিন, মাথার ওপরে মেঘমুক্ত নীল আকাশ। পিপের আবলুস কালো মাথাটা ওঠানামা করতে লাগল লবঙ্গের মত। তিমির টানে তীরহীন সাগরে ছেলেটাকে ফেলে, মিনিট তিনেকের মধ্যে এক মাইল সামনে চলে গেল স্টাবের নৌকো।

শান্ত আবহাওয়ায় খোলা সাগরে সাঁতরানো কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু চারপাশের অন্তহীন একাকিত্ব যেন বুকে চেপে বসতে চায়।

স্টাব কি তাহলে নিগ্রো ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়েছিল নিয়তির হাতে? না। অন্তত তা সে চায়নি। সে ভেবেছিল, বাকি দুটো নৌকো নিশ্চয় পিপকে তুলে নেবে। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্যরকম।

পাশেই তিমি দেখে সেই নৌকো দুটোও শুরু করল ধাওয়া। ফলে আরও বেড়ে গেল ছেলেটার একাকিত্ব। পরে নেহাৎ ভাগ্যক্রমে তাকে উদ্ধার করে পেকোড। কিন্তু উদ্ধার পাবার পর থেকে হারিয়ে গেছে তার যাবতীয় উচ্ছলতা, এখন সে শুধু তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে। সবাই বলে, পিপ নাকি পাগল হয়ে গেছে।

শেষ কথা, স্টাবকে অযথা নিষ্ঠুর ভাববেন না। তিমি শিকারে এরকম ঘটনা অহরহই ঘটে।

BanglaBook.org

৮১

যে-তিমিটার জন্যে এত কাণ্ড, সেটা অবশ্য মারা পড়েছিল। যথাসময়ে সেটাকে ঝোলানো হয়েছিল পেকোডের পাশে এবং কাটাকাটিও করা হয়েছিল।

তিমি মারার পর কত কাজ থাকে। অনেকে শুধু বালতি টানাটানি করে। এক বালতি স্পার্মাসেটিতে ভরে গেলে সেটা সরিয়ে রেখে আনতে হয় আরেকটা বালতি। পরে এই ভরা বালতিগুলো আবার ঠিক করতে হয় ট্রাই-ওয়র্কসে যাবার আগে।

স্পার্মাসেটি কখনও কখনও জমে দলা দলা হয়ে যায়। তখন আমাদের কাজ সেই দলাগুলোকে টিপে টিপে আবার তরল আকারে নিয়ে আসা। বসে বসে সারা সকাল টিপতে টিপতে অনেক সময় সঙ্গীর আঙুলই টিপতে শুরু করি স্পার্মাসেটির দলা ভেবে।

এসব কাজের পাশাপাশি তিমি টুকরো করে প্রস্তুত করতে হয় ট্রাই-ওয়র্কসের জন্যে। মাঝরাতে নতুন কেউ তিমি কাটা দেখলে আঁতকে উঠতে পারে। পুরো জায়গাটা পরিণত হয় বিশাল এক কসাইখানায়। কাটার সময় স্পেডম্যান তিমির ওপর ওঠে খালি পায়ে, ফলে মাঝেমাঝেই তার পা হড়কে যায়। হয়তো ভাবছেন, এতে কখনও তার নিজের বা সঙ্গীর পায়ের আঙুল কেটে যায় কিনা। অভিজ্ঞ স্পেডম্যানদের খুব কম জনেরই পায়ের পাঁচটা আঙুল আস্ত থাকে।

৮২

তোলা নৌকো ছাড়াও আমেরিকান হোয়েল-শিপের আরেক বৈশিষ্ট্য হলো এর ট্রাই-ওয়র্কস। এটাকে দেখলে মনে হয়, ইটখোলা থেকে যেন তুলে আনা হয়েছে আস্ত এক ইটের পাঁজা।

ডেকে ফোরমাস্ট আর মেইনমাস্টের মাঝখানের জায়গাটা সবচেয়ে প্রশস্ত বলে সেখানেই স্থাপন করা হয় ট্রাই-ওয়র্কস। এর নিচের তক্তাগুলো এতই শক্ত যে পাঁচ ফুট উচ্চতার, দশ বাই আট ফুটের একটা ইট বা চুনসুরকির বোঝা বহন করতে পারে। ট্রাই-ওয়র্কসের ওপরটা ঢাকা এক হ্যাচওয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ ঢাকা। হ্যাচটা সরালেই চোখে পড়বে বিরাট দুই পাত্র, একেকটার ধারণ ক্ষমতা বেশ কয়েক ব্যারেল। যখন কাজ থাকে না, তখনও পাত্র দুটোকে রাখা হয় ঝকঝকে পরিষ্কার। রাতের পাহারার সময় বুড়ো অনেক নাবিক পাত্রে ঢুকে ঘুম দিয়ে নেয়। ট্রাই-ওয়র্কসে তিমিকে জ্বাল দেয়া হয় তিমিরই তেলে।

৮৩

পেকোডের ট্রাই-ওয়র্কস থেকে নেমে যদি ফোকাসলে যান, হঠাৎ করে মনে হবে, যেন হাজির হয়েছেন কোন রাজা-বাদশার আলোকিত সমাধিতে।

BanglaBook.org

ব্যবসায়ীদের জাহাজে তেল দুধের চেয়েও দুষ্প্রাপ্য। তারা কাপড় পরে আঁধারে, খায় আঁধারে, আঁধারে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খায়। কিন্তু তিমি শিকারীদের বসবাসই আলোর মাঝে। নিশ্ছিদ্র আঁধার রাতেও হোয়েল-শিপে আলো চোখে পড়বে আপনার।

হোয়েলম্যানরা আলো ব্যবহার করে স্বাধীনভাবে। তাদের হাতে হাতে প্রদীপ, হোক না তা পুরানো বোতল, শিশি, কিংবা এলের মগে তৈরি। তারা পোড়ায় সবচেয়ে খাঁটি তেল। এই তেলের গন্ধ অবিকল এপ্রিলের গ্রাস বাটার। খাঁটি তেল পাবার জন্যে নিজেই তেল সংগ্রহ করে তিমি শিকারী, ঠিক যেমন প্রেইরির কোন ভ্রমণকারী জুটিয়ে নেয় তার রাতের খাবার।

৮৪

তিমি মারার পর সেটাকে নিয়ে কি কি করা হয়, তার প্রায় সব বর্ণনাই দিয়েছি। এবার বলব শেষ কাজের কথাটা।

তেল জ্বাল দেয়া হলে সরিয়ে নেয়া হয় ট্রাই-ওয়র্কস, প্রকাণ্ড দুই পাত্র ঢুকে পড়ে হ্যাচে। তারপর গরম গরমই তেলগুলোকে ভরা হয় ছয় ব্যারেলের সব পিপেয়। মাঝরাতের মৃদু বাতাসে জাহাজ যখন অল্প অল্প দুলছে, হয়তো তখনই খুলে দেয়া হয় তার পেট। নাবিকেরা পিপে বয়ে এনে সেখানে সাজিয়ে রাখে। তেল ঠাণ্ডা হলে আবার বন্ধ হয়ে যায় জাহাজের পেট। নাবিকেরা বিশ্রাম নিতে যায়।

কাজ শেষের পরিষ্কার ডেক দেখলে ধারণা করা অসম্ভব যে এখানেই এত সব কর্মকাণ্ড হয়েছে। কিন্তু কাজ কি সত্যিই শেষ হলো নাবিকদের? মোটেই না। সকালের বাতাস উপভোগ করতে করতে হয়তো তারা কেবল জামার বোতাম লাগাচ্ছে, তখনই চিৎকার মাস্ট-হেড থেকে– ওই যে, ওই যে ডাকছে! সুতরাং নামাও নৌকো, ছোট তিমির পেছনে। সমাপ্ত হয়ে যাওয়া কাজ আবার শুরু করো গোড়া থেকে।

৮৫

'এই জাহাজ, সাদা তিমিটাকে দেখেছেন?'

মুখের সামনে হাত গোল করে চেঁচাল আহাব। পতাকা বলছে, জাহাজটা ব্রিটিশ। ক্যাপটেনের বয়স মোটামুটি ষাট, স্বাস্থ্যবান, সুন্দর চেহারা, দাঁড়িয়ে রয়েছে বোতে। পরনে জ্যাকেট, একটা হাতা পিঠের পেছনে উড়ছে।

'সাদা তিমিটাকে দেখেছেন?'

'এটা দেখেছেন?' জ্যাকেটের ভেতর থেকে বের করে, স্পার্ম তিমির হাড়ে তৈরি সাদা ধপ্‌ধপে একটা হাত দেখাল ভদ্রলোক।

'আমার নৌকো নামাও!' ছটফট করে উঠল আহাব।

নিজের জাহাজে আহাবকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল ভদ্রলোক। কিন্তু আহাবের আর তর সইছিল না। বলল, 'কোথায় দেখেছেন সাদা তিমিটাকে?– কত দিন আগে?'

'সাদা তিমিটাকে,' পুবদিকে হাত তুলল ভদ্রলোক, 'দেখেছি ওখানে। গত ঋতুতে।'

'হাত কেটে নিয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, হাত গেছে তিমিটার জন্যেই। আপনার পা-টাও বুঝি?'

'ঘটনাটা বলুন, কিভাবে কি হলো।'

'প্রথমে সাদা তিমিটার কথা আমরা জানতামই না। একদিন চার পাঁচটা তিমি দেখে পিছু নিয়ে একটাকে হারপুন লাগালাম। কিন্তু তিমিটা ছুটতে লাগল মাইলের পর মাইল। হাল প্রায় ছেড়ে দিয়েছে নাবিকেরা, হঠাৎ ভেসে উঠল প্রকাণ্ড এক তিমি, মাথা আর কুঁজ দুধের মত সাদা, সারা শরীর কোঁচকানো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটাই, ওটাই,' অস্থির হয়ে উঠল আহাব।

'পাখনার কাছে একটা হারপুন লেগে রয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার হারপুন! বলে যান!'

'সুযোগ দিলে তো বলবই,' রসিকতা করল ইংরেজ ক্যাপটেন। 'তিমিটা সোজা ছুটে এল হোয়েল-লাইন কাটার জন্যে। কিন্তু লাইন কামড়াতে গিয়ে কিছু একটা আটকে গেল তার মুখে। অন্য তিমিগুলো সরে গেছে ইতিমধ্যে। ভাবলাম, এই তিমিটাকেই ধরব। একেবারে পাশে এসে পড়েছিল ফার্স্ট মেট মি. মাউনটপ, লাফিয়ে গেলাম তার নৌকোয়। হারপুনটা কেবল ছুঁড়েছি, সাদা একটা মিনারের মত ওপরে উঠে গেল তিমিটার লেজ, পরমুহূর্তেই ভয়ঙ্কর বেগে নেমে এল আমাদের নৌকোর মাঝখানে। চোখের পলকে গুড়ো হয়ে গেল নৌকো, মেটসহ ছিটকে পড়লাম পানিতে। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যখন অস্থির, দ্বিতীয় হারপুনটার কাঁটা বিঁধে গেল আমার বাহুতে। তিমিটা ছুটতে লাগল সামনে। প্রচণ্ড টানে হারপুনের কাঁটা আমার বাহু ভেদ করে বেরিয়ে গেল কবজির কাছ দিয়ে। আঘাতটা কেমন ছিল, সে-সম্বন্ধে এবার বলবে জাহাজের সার্জন ডা. বাঙ্গার।'

'জখমটা ছিল বিশ্রী,' শুরু করল সার্জন, 'তাই ক্যাপটেন বুমার উপদেশ মেনে আমাদের বুড়ো স্যামিকে–'

'আমার জাহাজটার নাম স্যামুয়েল এনডারবাই,' ক্যাপটেন জানাল আহাবকে। 'হ্যাঁ, বলো, সার্জন।'

'বুড়ো স্যামিকে ক্যাপটেন নিয়ে গেলেন উত্তরে। ভীষণ গরম, তার মধ্যে রাতের পর রাত জাগতে হলো আমাকে। তবে ডায়েটের ব্যাপারে–'

'হ্যাঁ, ডায়েটের ব্যাপারে সার্জন ছিল নিষ্ঠুর। আমার তো মানে যাকে বলে– যাক গে, বলো, সার্জন।'

'বুঝতেই পারছেন,' সার্জন ঘুরল আহাবের দিকে, 'আমাদের ক্যাপটেন মাঝে মাঝে ইয়ারকি মারতে ভালবাসেন। কিন্তু আমি কড়া ধাতের মানুষ। এমনকি

কোনরকম–'

'আমাদের সার্জন পানিও খায় না,' বলল ক্যাপটেন বুমার, 'তাজা পানি দেখলেই তার জলাতঙ্ক হয়। হ্যাঁ, এবার ঘটনাটা বলো, সার্জন।'

'জখমটা ছিল সত্যিই বিশ্রী– দু'ফুটেরও বেশি লম্বা, কয়েক ইঞ্চি চওড়া। শেষমেশ কাটা ছাড়া উপায় রইল না। তবে মাছের হাড়ের হাত লাগানোর পরিকল্পনা ক্যাপটেনের সম্পূর্ণ নিজস্ব, ওটা উনি তৈরি করে নিয়েছেন ছুতোরকে দিয়ে। হয়তো কারও মাথা ফাটাতে চান। মাঝেমাঝে রাগে অন্ধ হয়ে যান উনি। এই দেখুন না–' হ্যাট খুলে মাথা দেখাল সার্জন, খুলির মাঝখানে একটা জায়গা উঁচু হয়ে আছে, তবে সেখানে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই– 'তা এই অবস্থা কিভাবে হলো, সেই কথা ক্যাপটেনই বলবেন।'

'না। ওটা আসলে জানে তার মা, জন্মেছেই তো অমন মাথা নিয়ে। আচ্ছা, বাঙ্গার, তোমার মত আরেকটা হাড় হারামজাদা পৃথিবীর আর কোথাও আছে? সত্যি, মরার পর তোমার দেহটা সংরক্ষণ করে রাখা উচিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেখাবার জন্যে।'

'সাদা তিমিটার কি হলো?' ক্যাপটেন আর সার্জনের রসিকতা দেখতে দেখতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল আহাবের।

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাদা তিমি,' বলল ক্যাপটেন বুমার, 'আগে ওটার নাম জানতাম না। পরে জেনেছি– মবি ডিক।'

'পরে আর কখনও দেখেছেন ওটাকে?'

'দু'বার।'

'হারপুন লাগাতে পারেননি?'

'সাধ মিটে গিয়েছিল। একটা বাহুই কি যথেষ্ট নয়?'

'বেশ,' মুখ গম্ভীর করে বলল ডা. বাঙ্গার্থ, 'ডান হাত তো দিয়েছেন, এবার বাম হাতটা টোপ দিয়ে দেখুন না, ফল পেতে পারেন। সত্যি, তিমিটাকে কিন্তু অন্তত আর একটা সুযোগ দেয়া উচিত আপনার।'

'ধন্যবাদ, বাঙ্গার,' বলল ক্যাপটেন, 'একবার ওটার পিছু নিয়েই সাধ মিটে গেছে। সাদা তিমি শিকার করার কোনরকম ইচ্ছে আমার নেই। জানি, ওটাকে মারতে পারলে খুব সুনাম হবে। এও জানি যে ওটার মাথায় রয়েছে প্রায় এক জাহাজ স্পার্মাসেটি। তবু আমার মনে হয়, তিমিটাকে বিরক্ত না করাই ভাল। আপনারও তা-ই মনে হয় না, ক্যাপটেন?'– আহাবের হাড়ের পা-টার ওপর দৃষ্টি বোলাল বুমার।

'তবু ওটাকে ধাওয়া করব। শেষ কবে তিমিটাকে দেখেছেন আপনি? কোন্ দিকে গেছে?'

আহাবের কাছে গিয়ে কুকুরের মত তার গা শুঁকল বাঙ্গার। 'আরে, এই লোকের রক্ত তো টগবগ করে ফুটছে– থার্মোমিটারটা নিয়ে এসো তো!' পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে এগিয়ে এল সার্জন।

'থামুন!' গর্জে উঠল আহাব, তারপরই ছুটে গেল বুলওয়ার্কের কাছে– 'নৌকোয় ওঠো সবাই! তিমিটা কোন্ দিকে গেছে?'

BanglaBook.org

'হায় ঈশ্বর!' প্রশ্নটা তাকে করা হয়েছে বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল ইংরেজ ক্যাপটেন। 'পুব দিকে,' এবার ফিসফিস করে ফেদাল্লাকে বলল, 'কি ব্যাপার? তোমাদের ক্যাপটেন পাগল নাকি?'

জবাবে ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল ফেদাল্লা, তারপর বুলওয়ার্ক টপকে নেমে গেল নৌকোয়।

আহাবেরও নামতে দেরি হলো না। বিদায় জানাতে চাইল বুমার, কিন্তু আহাব দাঁড়িয়ে আছে পেছন ফিরে। পেকোডের পাশে গিয়ে না পৌঁছা পর্যন্ত পাথরের মত মুখ করে রইল সে।

৮৬

ইংল্যাণ্ডের জাহাজটা ধীরে ধীরে উধাও হয়ে গেল দৃষ্টিপথ থেকে। জাহাজটার নামকরণ করা হয়েছে ব্যবসায়ী এবং বিখ্যাত হোয়েলিং হাউস এনডারবাই অ্যাণ্ড সন্সের মালিক স্যামুয়েল এনডারবাইয়ের নামানুসারে। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম তিমি শিকারের তোড়জোড় শুরু করে এনডারবাই। ন্যানটাকেটের কফিন আর মেসি অবশ্য তার অনেক আগেই (১৭২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে) তিমি শিকার শুরু করেছে, কিন্তু তারা যেত শুধু উত্তর আর দক্ষিণ আটলান্টিকে।

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'এমেলিয়া' নামে একটা জাহাজ বেরিয়ে পড়ে এনডারবাইয়ের তত্ত্বাবধানে। কেপ হর্ন ঘুরে তারা ফিরে আসে সফল শিকার সেরে। শিগগিরই আরও সব ইংরেজ আর আমেরিকান জাহাজ এমেলিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এভাবেই প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি শিকারীদের আনাগোনা শুরু হয়। এরপর এনডারবাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সম্ভবত আংশিক খরচে ব্রিটিশ সরকার আবিষ্কার অভিযানে পাঠায় 'র‍্যাটলার' নামের এক যুদ্ধজাহাজকে। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষামূলক এক আবিষ্কার অভিযানে জাপান যায় এনডারবাইয়ের নিজস্ব জাহাজ 'সাইরেন'। এভাবেই জাপানের বিরাট তিমি শিকার এলাকা মানুষের গোচরে আসে। সাইরেনের সেই বিখ্যাত অভিযানে ক্যাপটেন ছিল কফিন নামের এক ন্যানটাকেটার।

এনডারবাই হাউস যে আজ পর্যন্ত টিকে রয়েছে, এটা তাদের দারুণ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। তবে আসল এনডারবাই নিশ্চয় এখন তিমি শিকার করছে আরেক পৃথিবীর দক্ষিণ সাগরে।

মাঝরাতে একবার এনডারবাইয়ে গিয়েছিলাম আমি। চমৎকার গ্যাম ছিল সেটা। সত্যি, কোন দিন ভুলব না জাহাজটার অ্যাংলো-স্যাক্সন আতিথেয়তার কথা। নাবিকরা ছিল ফুর্তিতে টইটম্বুর। গ্যালনের পর গ্যালন ফ্লিপ পান করলাম আমরা। খেলাম গরুর মাংস, ঈষৎ শক্ত হলেও মন্দ ছিল না। মাংসের পর ডাম্পলিং।

শুধু এনডারবাই নয়, আর সব ইংরেজ জাহাজেও ছিল আতিথেয়তার চূড়ান্ত। ইংরেজ জাহাজে গেলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যেত রুটি, গরুর মাংস, মদের

ক্যান আর রসিকতা। অবশ্য ইংরেজ হোয়েল-শিপে ব্যবহার একটু আলাদা হওয়ারই কথা, তিমি শিকারে তারা হল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড আর ডেনমার্কের পূর্বসূরী।

তিমির চর্চা করতে করতে একবার পেয়ে গেলাম খুব পুরানো একটা ডাচ বই– ড্যান কুপম্যান। ভাবলাম, তিমি শিকারীদের সম্বন্ধে নিশ্চয় অনেক কথা পাওয়া যাবে এতে, বিশেষ করে অমূল্য তথ্য মিলবে কুপারদের বিষয়ে। প্রত্যেক হোয়েল-শিপেই কুপার থাকে। বইটা অনুবাদ করতে দিলাম আমার এক বিজ্ঞ অধ্যাপক বন্ধু ড. স্নডহেডকে। কিন্তু অনুবাদের পর দেখা গেল যে ড্যান কুপম্যান মানে ব্যবসায়ী। তবে বইটাতে মজার একটা তথ্য আছে। হল্যাণ্ডের ১৮০টা তিমি শিকার অভিযানে নেয়া খাদ্যের বিবরণ:

গরুর মাংস– ৪,০০,০০০ পাউণ্ড
শুয়োরের মাংস– ৬০,০০০ পাউণ্ড
মাছ– ১,৫০,০০০ পাউণ্ড
বিস্কুট– ৫,৫০,০০০ পাউণ্ড
নরম রুটি– ৭২,০০০ পাউণ্ড
মাখন– ২,৮০০ ছোট পিপে
উন্নতমানের পনির– ২০,০০০ পাউণ্ড
নিম্নমানের পনির– ১,৪৪,০০০ পাউণ্ড
জেনেভা– ৫৫০ অ্যাংকার (১ অ্যাংকার =৮$\frac{১}{২}$ গ্যালন)
বিয়ার– ১০,৮০০ ব্যারেল

বইটা লেখা হয়েছে দু'তিনশো বছর আগে। তখনকার দিনে অভিযানের সময়সীমা তিন মাস পেরোত না, আর একেকটা জাহাজে লোক থাকত ৩০ জন। তাহলে ১৮০টা অভিযানে সবসুদ্ধ লোক হয় ৫,৪০০ জন। সেই হিসেবে তাদের মাথা পিছু মাছ, পনির, জেনেভা জিন আর বিয়ার খাওয়া দেখলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

থাক, খাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করব না। ওই যে ইংরেজ তিমি শিকারীরা বলে না– যখন মন্দ ছাড়া কিছুই তোমার ভাগ্যে জুটবে না, তখন ভাল একটা ডিনার খাও।

BanglaBook.org

৮৭

হঠকারীর মত ক্যাপটেন আহাব স্যামুয়েল এনডারবাই থেকে নেমে আসায় তার নিজেরও কিছু ক্ষতি হয়েছিল। প্রথমত তাড়াহুড়ো করে নৌকোয় উঠতে গিয়ে ঝাঁকি লেগেছিল তার হাড়ের পায়ে, তারপর ঘুরে এক নাবিককে আদেশ দিতে গিয়ে এমন মোচড় লেগেছিল যে পা-টা প্রায় খুলে যাবার জোগাড়।

আর সব বিষয়ে আহাবের যত পাগলামিই থাকুক না কেন, পায়ের যত্ন সে সত্যিই নেয়। কারণ, পেকোড বন্দর ত্যাগ করার মাত্র ক'দিন আগে ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানা থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। কিভাবে যেন খুলে গিয়েছিল

পা-টা। রক্তারক্তি কাণ্ড। গুঁতো লেগে কুঁচকিতে সৃষ্ট ক্ষত সারতে অনেক সময় নিয়েছিল।

একটা ব্যাপার রহস্যাবৃত। কেন পেকোড ছাড়ার বেশ কিছু দিন আগে থেকে ছাড়ার পরেও অনেক দিন আহাবকে ডেকে বের হতে দেখা যায়নি। ক্যাপটেন পেলেগ যদিও এই ব্যাপারে কারণ দর্শিয়েছে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। তার বের না হবার পেছনে দুর্ঘটনাটা অবশ্যই ছিল। তবে যতটা না শারীরিক, তার চেয়ে বেশি আঘাতটা ছিল মানসিক। কিন্তু আঘাত যেমনই হোক, তার মধ্যেও বাস্তব ভোলেনি আহাব। ছুতোরকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আদেশ দিয়েছিল নতুন আরেকটা পা বানাবার। আহাবের আদেশে আলস্য ছেড়ে উঠতে হয়েছিল কামারকে। নিখুঁত পা তৈরি করতে লোহার যেসব জিনিসের প্রয়োজন, সরবরাহ করতে হবে তাকে।

৮৮

অন্যান্য সব হোয়েল-শিপের ছুতোরের সঙ্গে পেকোডের ছুতোরের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। ছুতোর বলতেই আমাদের সামনে যে কাঠ নিয়ে কর্মরত মানুষের ছবি ভেসে ওঠে, হোয়েল-শিপের ছুতোর কিন্তু শুধু সেই জিনিস নয়। সে সকল কাজের ওস্তাদ। ভাঙাচোরা নৌকো মেরামত, অস্বস্তিকর দাঁড়ে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা, খুলে পড়া মাস্তুল দাঁড় করিয়ে দেয়া, ডেকে বুল্‌স্ আই বসানো সহ আরও অনেক রকম কাজে পারদর্শী হতে হয় তাকে।

তার নানারকম কাজের জায়গা কিন্তু একটাই — ভাইস-বেঞ্চ। লম্বা, অমসৃণ একটা বেঞ্চ সেটা, ওপরে বসানো লোহা এবং কাঠের বিভিন্ন আকারের ভাইস। একমাত্র জাহাজের পাশে তিমি ঝুলিয়ে রাখার সময় ছাড়া বেঞ্চটা শক্ত করে বাঁধা থাকে ট্রাই-ওয়র্কসের পেছনে।

কোন নাবিকের হাত মচকে গেছে? লোশন লাগিয়ে দেবে ছুতোর; নিজের নৌকোর প্রত্যেকটা দাঁড়ের ওপর সিঁদুর-রঙা তারা ভালবাসে স্টাব? বানিয়ে দেবে ছুতোর; কোন নাবিক কানে হাঙরের হাড়ের দুল পরতে পছন্দ করে? কান ফুটো করে দেবে ছুতোর; দাঁত ভীষণ ব্যথা করছে? তার জন্যেও রয়েছে ছুতোর।

দাঁত টেনে তুলতে তার কিছু মনেই হয় না। মানুষের দাঁত আর তিমির আইভরি তার চোখে সমান।

৮৯

এনডারবাই থেকে ফেরার সময় পায়ে মোচড় খাওয়ায় সতর্ক হয়ে গিয়েছিল আহাব। তাই ছুতোরকে আদেশ করেছিল পা-টাকে আরও নিখুঁতভাবে তৈরি

BanglaBook.org

করতে। এখন ভাইস-বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে সেই পা নিয়ে ব্যস্ত ছুতোর বিড়বিড় করছে আপন মনে:

'এই যে ফাইল আর ওই যে হাড়। যেটা নরম হওয়া উচিত সেটা শক্ত, আর যেটা শক্ত হওয়া উচিত সেটা নরম। আরেক বার চেষ্টা করে দেখি। এই তো, এখন বেশ ভাল কাজ হচ্ছে (হ্যাঁচ্চো)– হাড়ের গুঁড়ো হলো (হ্যাঁচ্চো)– এটা হচ্ছে গিয়ে (হ্যাঁচ্চো)– হ্যাঁ, এটা (হ্যাঁচ্চো)– ঈশ্বর! এই হারামজাদা হাড়ের গুঁড়ো আমাকে কথাই বলতে দেবে না দেখছি। জ্যান্ত কোন গাছ কাটলেও এত গুঁড়ো ওড়ে না (হ্যাঁচ্চো)– পায়ের মাপ নেয়ার জন্যে মোঘলকে সংবাদ দিতে হবে। আরে, কী সৌভাগ্য! বুড়ো তো দেখি এদিকেই আসছে।'

ধীরে ধীরে ভাইস-বেঞ্চের কাছে এসে দাঁড়াল ক্যাপটেন আহাব। 'কাজ কেমন এগোচ্ছে?' গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'ভালই, স্যার। যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনার পায়ের মাপটা আরেক বার নিতে চাই।'

'তা নাও, কিন্তু এত হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো কিসের?'

'স্যার, হাড়ে খুব গুঁড়ো।'

'এ-থেকে একটা শিক্ষা নাও। মরার পর কেউ যেন তোমাকে লোকালয়ে কবর না দেয়। হাড়ের গুঁড়ো নাকে ঢুকে মানুষজন হাঁচি তুলতে তুলতে মরবে। যাকগে, পায়ের কাজ শেষ হতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'বোধ হয় আর ঘণ্টাখানেক, স্যার।'

আহাব চলে যাবার পর দ্রুত হাতে কাজ সারতে সারতে আবার শুরু হলো ছুতোরের বিড়বিড়ানি:

'মোঘলকে সবচেয়ে ভাল চেনে স্টার্ব, এজন্যে একটা শব্দই ব্যবহার করে তার সম্বন্ধে– অদ্ভুত। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, বুড়ো হলো অদ্ভুত, অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত। না, বেশি কথা বলব না, কাজে ভুল হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

৯০

প্রতিদিনের মত পাম্প করে বাড়তি পানি বের করে দিচ্ছিল পেকোড। কিন্তু পানির সঙ্গে মিশে আছে প্রচুর তেল। ঘটনা গুরুতর, নিচের পিপেগুলোতে নিশ্চয় বিশ্রী কোন ফুটো হয়েছে। স্টারবাক গেল রিপোর্ট করতে।

পেকোড তখন দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এগোচ্ছিল ফরমোজা আর বেসি দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশে। স্টারবাক দেখল, দ্বীপপুঞ্জগুলোর একটা ম্যাপ সামনে মেলে বসে আছে আহাব।

'কে?' পায়ের শব্দ কানে যেতে পেছন না ফিরেই বলল আহাব। 'ডেকে যাও! ভাগো এখান থেকে!'

'ক্যাপটেন আহাব, ভুল করছেন। আমি স্টারবাক, স্যার। তেলের পিপে ফুটো হয়ে গেছে, মেরামতের জন্যে বার্টন ওপরে তোলা প্রয়োজন।'

'আমরা এখন প্রায় জাপানের কাছাকাছি। এই সময় বার্টন ওপরে তুলে এক সপ্তাহ দেরি করতে চাও?'

'কাজটা না করলে এক বছরে সংগ্রহ করা তেল এক দিনে নষ্ট হয়ে যাবে, স্যার।'

'আমি ওসবের কথা বলছি না। ভাবছিও না। দূর হও! ফুটো হতে দাও ওটাকে। আমার নিজেরই সারা শরীরে ফুটো। বিরাট এই জাহাজের কোথায় ফুটো হয়েছে, তা কি এখন খুঁজে বের করা সম্ভব? আর বের করা যদি যায়ও, কে মেরামত করবে এই ঝড়ের মধ্যে? বার্টন ওপরে তুলতে আমি দেব না, স্টারবাক।'

'মালিকেরা কি বলবে, স্যার?'

'ন্যানটাকেটে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাক মালিকেরা। আহাব ওদের থোড়াই কেয়ার করে। কৃপণ এই মালিকগুলোর কথা তুলে তুমি প্রায়ই আমাকে খোঁচাও, স্টারবাক। কিন্তু শুনে রাখো, জাহাজের সবকিছুর আসল মালিক হলো তার কমাণ্ডার। যাও– ডেকে যাও!'

'ক্যাপটেন আহাব,' চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল চীফ মেটের, 'আমার জায়গায় অন্য কোন লোক হলে তার বিরক্তি গোপন করে রাখত না। বিরক্তি প্রকাশ করতে পেরে সে খুশি হত।'

'শয়তান! এখনও ডেকে যাও বলছি!'

'না, স্যার, এখনই নয়। আচ্ছা, ক্যাপটেন আহাব, আমাদের সম্পর্ক কি আরেকটু ভাল হতে পারে না?'

র‍্যাক থেকে একটা মাস্কেট নামিয়ে সেটা স্টারবাকের দিকে তাক করল আহাব। 'ঈশ্বর একজনই আছে, সে পৃথিবী শাসন করে, আর ক্যাপটেন একজনই আছে যে পেকোড শাসন করে। ডেকে যাও!'

এক মুহূর্তের জন্যে চীফ মেটের মুখ দেখে মনে হলো যেন সত্যিই গুলি খেয়েছে। ধীরে ধীরে উঠে কেবিনের দরজার কাছে গিয়ে সে বলল, 'আপনি রেগে গেছেন, স্যার, আমাকে অপমান করেননি। তবে একটা কথা শুনে রাখুন। স্টারবাকের জন্যে আপনার সাবধান হবার কিছু নেই, তবে আহাব যেন সাবধান হয় আহাবের কাছ থেকে।'

'সে সাহস দেখায়, তবে কথা মান্য করে, একে বলে সতর্কতাপূর্ণ সাহসিকতা!' স্টারবাক চলে যাবার পর বিড়বিড় করতে লাগল আহাব। 'কিন্তু ওটা কি বলল– আহাব যেন সাবধান হয় আহাবের কাছ থেকে– নিশ্চয় কথাটার গূঢ় কোন অর্থ আছে!' অসচেতনভাবে মাস্কেটটাকে কিছুক্ষণ লাঠি হিসেবে ধরে পায়চারি করল সে, তারপর বন্দুকটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এল ডেকে।

স্টারবাকের কাছে গিয়ে শান্ত স্বরে বলল সে, 'তুমি খুবই ভাল মানুষ, স্টারবাক!' তারপর নাবিকদের দিকে চেয়ে গলা চড়াল, 'বার্টন ওপরে তোল, মূল গুদাম ভাঙতে হবে।'

আহাব এই কাজ স্টারবাককে সম্মান দেখিয়ে করল কিনা, অনুমান করা কঠিন। হয়তো মুহূর্তের জন্যে তার মধ্যে ঝলকে উঠেছিল সততা। তবে এটা তার

BanglaBook.org

চালও হতে পারে। হয়তো ভেবেছে, জাহাজের প্রধান অফিসারকে না চটানোই ভাল। যা-ই হোক, তার আদেশ পালিত হলো।

৯১

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, তেলের পিপেগুলো যেমন রাখা ছিল তেমনি আছে। তাহলে ফুটো হয়েছে নিশ্চয় আরও ভেতরে কোথাও। পানি, রুটি, গরুর মাংস, তক্তা, হুপ ওপরে তুলতে তুলতে খালি হয়ে গেল জাহাজের পেট।

এই সময় দিন রাত কাজ করতে করতে জ্বরে পড়ল আমার পুরানো বন্ধু কুইকেগ। হ্যামকে শুইয়ে দেয়া হলো ওকে। যতই দিন গেল খারাপ হতে লাগল ওর অবস্থা। শরীর শুকিয়ে কাঠ, চোখ ঢুকে গেল কোটরে। সাধারণ মানুষ হলে অনেক আগেই মারা যেত, কিন্তু ও যেন টিকে রইল বন্য এক প্রাণশক্তির জোরে। দিনের পর দিন মৃত্যুপথযাত্রী লোকের পাশে বসে থাকার মধ্যে দারুণ আতঙ্কের কি যেন একটা আছে। সে-আতঙ্ক নামহীন, অবর্ণনীয়। সত্যি বলতে কি, মানুষের খাঁটি আতঙ্কের বর্ণনা আজ পর্যন্ত কেউ দিয়ে যেতে পারেনি। যে-মৃত্যু সবাইকে সমান করে দেয়, তার নিখুঁত চিত্র আঁকা সম্ভব শুধু পরলোকের কোন লেখকের পক্ষে।

ধূসর এক সকালে কুইকেগ বলল, ন্যানটাকেটে ও দেখে এসেছে গাঢ় রঙের এক কফিন। হোয়েলম্যানরা মারা গেলে নাকি অমন কফিনেই রাখা হয়। যদিও ওর দেশে মৃতদের ভাসিয়ে দেয়া হয় ক্যানুতে করে, ও চায় ওর মৃতদেহ অমন একখানা কফিনেই থাকুক। তারাদের দ্বীপ বলে মনে করে নরখাদকরা। তাই ক্যানুতে মৃতদেহ রেখে ওরা ভাবে, ভাসতে ভাসতে অবশ্যই ওটা এক দিন পৌঁছে যাবে তারার দ্বীপপুঞ্জে।

কুইকেগের শেষ ইচ্ছে পালিত হলো অবিলম্বে। নিখুঁতভাবে মাপ নিয়ে গাঢ়-রঙা কাঠের এক কফিন তৈরি করে ফেলল ছুতোর। জীবিত মানুষের মত মুমূর্ষুরাও অনেক সময় অত্যাচারী হয়। কফিনের কাজ শেষ হতে কুইকেগ জেদ ধরল, এই মুহূর্তে ওকে দেখাতে হবে কফিনটা। যেহেতু আর মাত্র ক'দিন পরেই ও অত্যাচার করবে না, পালিত হলো ওর এই ইচ্ছেটাও।

'আহা! বেচারিকে মারা যেতে হবে আর মাত্র ক'দিনের মধ্যেই,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এক নাবিক।

হ্যামকে শুয়ে একদৃষ্টে কফিনটার দিকে তাকিয়ে রইল কুইকেগ। তারপর আনতে বলল ওর হারপুন। কাঠের হাতলটা খুলে নিয়ে হারপুনের লোহার অংশের সঙ্গে নিজের দাঁড়টা ও রাখতে বলল কফিনে। এরপর ওর অনুরোধে কফিনে একে একে সাজিয়ে দেয়া হলো বিস্কুট, পানির ফ্লাস্ক, শক্ত মাটি ভর্তি একটা ব্যাগ। কাপড়ে তৈরি একটা বালিশও রাখা হলো কফিনের মাথার দিকে। এবার কুইকেগ কফিনে শুয়ে দেখতে চাইল, জিনিসটা ওর জন্যে আরামদায়ক হবে কিনা। কয়েক মিনিট স্থির শুয়ে থাকার পর ও আনতে বলল ইয়োজোর মূর্তি। মূর্তিটাকে দু'হাতে

BanglaBook.org

জড়িয়ে ধরে বুকের ওপর রেখে ও লাগিয়ে দিতে বলল কফিনের ডালা। অবশেষে নিজের ভাষায় ও জানাল, 'রারমাই'– অর্থাৎ, কাজ চলবে। তারপর আবার শুইয়ে দিতে বলল হ্যামকে।

কফিন তৈরি যখন শেষ, মৃত্যুর যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন, ঠিক তখনই উন্নতি লক্ষিত হলো মুমূর্ষু কুইকেগের স্বাস্থ্যে। সবাইকে অবাক এবং আনন্দিত করে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল ও। সবাইকে বলল, 'তীরে গিয়ে একটা কাজ করা বাকি রয়ে গেছে, তাই এখন আমি মরতে চাই না।'

নাবিকেরা বলল, 'ইচ্ছেমত বুঝি বাঁচা মরা যায়?'

কুইকেগ জবাব দিল, 'নিশ্চয়। কেউ যদি মরতে না চায়, ঝড়-তুফান, এমনকি তিমিও তাকে মারতে পারবে না।'

মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে উঠে বসল কুইকেগ, খেতে লাগল গোগ্রাসে। তারপর একদিন লাফিয়ে উঠে হারপুন নাচাতে নাচাতে বলল, আবার তিমির সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত ও।

এখানেই নগরবাসী একজন মানুষের সঙ্গে বর্বরের পার্থক্য। কঠিন অসুখে পড়লে একজন সভ্য মানুষের সুস্থ হতে যেখানে লাগে ছ'মাস, সেখানে কোন বর্বরের লাগে এক বেলা। কফিনটাকে কুইকেগ সিন্দুক হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানারকম বিচিত্র চিহ্ন খোদাই করতে লাগল কফিনটায়।

৯২

বেসি দ্বীপপুঞ্জকে পাশ কাটিয়ে অবশেষে আমরা এসে পড়লাম প্রশান্ত মহাসাগরে। হাজার হাজার লীগ এই নীল জলরাশি পুবদিকে বিস্তৃত। যারা জানে না তারা বুঝবে না, কত গভীর রহস্য সাগর লুকিয়ে রাখে তার হৃদয়ে। অনন্তকাল ধরে বয়ে চলা এই জলরাশি ধরে আছে চার মহাদেশের উত্থান-পতনের ইতিহাস। শান্ত বিকেলে ডেকে একা দাঁড়িয়ে কান পাতুন, ফিসফিস করে অতীত শোনাবে তার বিচিত্র সব গোপন কথা।

কিন্তু ক্যাপটেন আহাব সেসব কথা শোনার ধার ধারে না। প্রশান্ত মহাসাগর তার কাছে ঘৃণিত সেই সাদা তিমিটার বিচরণক্ষেত্র। কোয়ার্টার-ডেকে পায়চারি করতে করতে সে ভাবে, দিগন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া ওই জলরাশির মাঝেই সাঁতরে বেড়াচ্ছে মবি ডিক। আর ভাবতে ভাবতে ঠোঁট চেপে বসে সাঁড়াশির মত, উপচে পড়া ছোট নদীর মত ফুলে ওঠে কপালের শিরা। ঘুমন্ত আহাবের চিৎকার ভেসে আসে সবার কানে– 'স্টার্নে যাও! শাদা তিমিটা ছাড়ছে রক্তের ফোয়ারা!'

৯৩

আহাবের নতুন পা তৈরির ব্যাপারে ছুতোরকে সাহায্য করার পরেও পার্থ, মানে

পেকোডের কামার ডেক থেকে তার হাপর সরাল না। প্রত্যেকদিনই কেউ না কেউ আসে ছোটখাট কাজ নিয়ে। হয়তো হারপুনের ডগাটা বাঁকা হয়ে গেছে বা বোট-স্পেডটা আরেকটু ধার করতে হবে কিংবা পাল্টাতে হবে নৌকোর কোন জিনিস। অনেক সময় হোয়েলম্যানরা ঘিরে ধরে তাকে, অধৈর্য চোখে দেখে অন্যের জিনিস মেরামতির কাজ। কিন্তু কামারের কখনও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, সবার জিনিসই একে একে মেরামত করে ক্লান্তিহীনভাবে। অবিরাম ওঠে আর নামে তার হাতুড়ি, স্ফুলিঙ্গ উড়ে যায় হাপর থেকে। পরিশ্রম করে চলে পার্থ, যেন পরিশ্রমই তার জীবন, ভারী হাতুড়ির প্রত্যেকটা বাড়ি যেন তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

কামারের বর্তমান বয়স প্রায় ষাট। এক দিন প্রিয়তমা স্ত্রী-সন্তানসহ তারও ছিল শান্ত গৃহকোণ। কিন্তু ভাগ্যে তা সয়নি। চোর বাড়িতে সিঁদ দেয়ার পর খারাপ হয়ে গেল তার অবস্থা। পরিস্থিতি একসময় এমন হলো যে বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য হলো সে। তারপর হঠাৎ করেই একদিন মারা গেল স্ত্রী, একের পর এক সন্তানরা অনুসরণ করল মাকে। গৃহহীন, পরিবারহীন লোকটা এখানে সেখানে ঘুরতে লাগল উদ্‌ভ্রান্তের মত।

সেসময় হয়তো মনে মনে মৃত্যুকামনাই করেছিল পার্থ, কিংবা বলা যেতে পারে, অমন একটা জীবনের জন্য মৃত্যুই ছিল একমাত্র নিয়তি। কিন্তু দুইয়ে দুইয়ে সবসময় চার হয় না। মৃত্যু এল না তাকে উদ্ধার করতে। এর মধ্যেই এক রাতে স্বপ্ন দেখল সে, হাজার হাজার মৎস্যকন্যা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে, 'মনমরা হয়ে থেকো না, এসো আমাদের মাঝে। এখানে তুমি খুঁজে পাবে জীবনের এক নতুন অর্থ।'

সেই ভোরে ঘুম ভাঙা কামার মনে মনে বলল– হ্যাঁ, যাব, যাব আমি তোমাদের মাঝে। তারপর থেকেই পার্থ ঘুরে বেড়াচ্ছে এক মহাসাগর থেকে আরেক মহাসাগরে।

BanglaBook.org

৯৪

মুখে জটপাকানো দাড়ি, শার্ক-স্কিনের একটা অ্যাপ্রন গায়ে পার্থ দাঁড়িয়ে আছে হাপর আর নেহাইয়ের মাঝখানে। এখন দুপুর, তার এক হাতে ধরা পাইক হেডটা জ্বলন্ত কয়লার মধ্যে ঢোকানো। পুরানো একটা চামড়ার ব্যাগ হাতে নিয়ে খানিকটা পেছনে এসে দাঁড়াল আহাব। অবশেষে লোহাটা আগুন থেকে বের করে পিটতে লাগল পার্থ।

'সবসময় তুমি এসব নিয়েই আছ, অথচ তোমার গায়ে কোন পোড়ার দাগ নেই।'

'আগুনের আঁচ আমার সয়ে গেছে, ক্যাপটেন আহাব। যার সারা গা-ই ঝলসানো, তাকে পোড়ানো সহজ নয়।'

'সে না হয় হলো, কিন্তু এত দিনে তোমার তো অন্তত পাগল হবার কথা, কামার। বলো, এখনও কেন পাগল হওনি তুমি? পাগল না হয়ে তুমি টিকে আছ

কিভাবে? ঈশ্বর কি তোমাকে এতটাই ঘৃণা করে যে পাগল হওয়াও তোমার পক্ষে সম্ভব নয়?– যাকগে, কি তৈরি করছ এখন?'

'একটা পাইক-হেড, স্যার। এটায় খাঁজ আর কাটা দাগ রয়েছে।'

'দোষগুলো তুমি সারিয়ে ফেলতে পারবে, তাই না?'

'আশা করি, স্যার।'

'ধাতু যত কঠিনই হোক, আমার মনে হয়, তার কাটা দাগ আর খাঁজ তুমি সারিয়ে তুলতে পারবে।'

'আমারও তা-ই মনে হয়, স্যার, যে-কোন কাটা দাগ বা খাঁজ– কেবল একটা ছাড়া।'

'তাহলে শোনো,' দ্রুত এগিয়ে এসে পার্থের দু'কাঁধে হাত রাখল আহাব; 'শোনো, তুমি কি আমার এই দাগটাও সারিয়ে তুলতে পারবে? বলো, পারবে?' ভ্রূর ওপরের দাগটা দেখাল সে। 'যদি পারো, খুশি মনে আমি মাথা পেতে দেব তোমার নেহাইয়ের ওপর।'

'স্যার, এই মাত্র ওই দাগটার কথাই আমি বলেছি। ওটা ছাড়া আর সব দাগ সারাতে পারব।'

'হ্যাঁ, কামার, এই দাগ কেউ সারাতে পারবে না, এটা সারানো সম্ভব নয়! মানুষ চামড়ার ওপরের দাগটাই শুধু দেখতে পায়, আসলে এটা চলে গেছে খুলির গভীরে। যাকগে, তোমার পাইক-হেডের কাজ বন্ধ করো। আমাকে একটা হারপুন তৈরি করে দাও। এমন হারপুন, যেটা বিদ্ধ হলে একশো শয়তানও আর খুলতে না পারে। অমন হারপুন তৈরি করতে যে-জিনিসের প্রয়োজন, তাও আমি নিয়ে এসেছি। এই যে,' চামড়ার ব্যাগটা দেখাল সে, 'এখানে রয়েছে রেসের ঘোড়ার নাল।'

'রেসের ঘোড়ার নাল, স্যার? তাহলে ঠিক জিনিসই এনেছেন।'

'হ্যাঁ, এখন হারপুন তৈরি শুরু করো। আমি আগুনে ফুঁ দিচ্ছি।'

আহাবের নির্দেশে বারো শিকঅলা একটা হারপুন তৈরি করতে লাগল পার্থ। ফোরকাসল থেকে দেখতে পেয়ে ফিসফিস করে স্টাব বলল, 'দুই শয়তান মিলে ওখানে করছেটা কি?'

শিকগুলো জোড়া দেয়ার পর পানিতে ডোবাতেই গরম ধোঁয়া ঝাপটা মারল ক্যাপটেন আহাবের মুখে।

'ছ্যাঁকা দিতে চাও নাকি?' মুখ বিকৃত করল আহাব।

'না, স্যার। একটা কথা আমার বার বার মনে হচ্ছে। হারপুনটা কি আপনি তৈরি করছেন সাদা সেই তিমিটার জন্যে?'

'হ্যাঁ, সাদা সেই শত্রু! এবার কাঁটা তৈরি করো, আমার রেজরগুলো নিয়ে এসেছি সেজন্যে।'

'না, স্যার, আপনার রেজর আমি নিতে চাই না।'

'নাও, নাও, ওগুলোর কোন প্রয়োজন নেই আমার। এখন আমি শেভ করি না, করবও না– যত দিন না– যাকগে, কাজ শুরু করো।'

অবশেষে এক সময় তৈরি হয়ে গেল আহাবের মনের মত হারপুন।

BanglaBook.org

৯৫

পেকোড এগিয়ে চলল জাপানী তিমি শিকার এলাকার অভ্যন্তরে। নাবিকেরাও ব্যস্ত হয়ে উঠল মাছ শিকারে। শান্ত, চমৎকার আবহাওয়ায় বারো, পনেরো, আঠারো, এমনকি বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত ধাওয়া করা হলো তিমিকে। কখনও কখনও ডুব মারা তিমির ভেসে ওঠার অপেক্ষায় থাকতে হলো ষাট থেকে সত্তর মিনিট।

সূর্যের আলোও এখন অনেকটা নরম। এরকম শান্ত আবহাওয়ায় সাগরে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে কেমন যেন স্বপ্নের মত একটা ব্যাপার আছে। সাগরের ওপরের এই রূপ দেখলে আমরা ভুলে যাই যে মসৃণ চামড়ার আড়ালেই থাকে বাঘের হৃৎপিণ্ড; মনে করতে চাই না, মখমল-নরম থাবার আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে হিংস্র নখর।

কিন্তু নিস্তরঙ্গ এই সুন্দর সাগর অন্য সবার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও আহাবের মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই।

৯৬

আহাব হারপুন তৈরি করার কয়েক সপ্তাহ পর একটা জাহাজের দেখা পেয়ে আবার খুশি হয়ে উঠলাম সবাই।

জাহাজটা ন্যানটাকেটের, নাম ব্যাচেলর। খোল স্পার্মাসেটিতে ভরিয়ে সঙ্গে আসা অন্য জাহাজগুলোকে পেছনে ফেলে ফিরে চলেছে বাড়ির পথে।

মাস্ট-হেডে দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যাট পরা তিন নাবিক, একটা হোয়েল-বোট ঝুলছে স্টার্ন থেকে, এছাড়া শেষ মারা তিমিটার নিচের চোয়ালও উঁকি দিচ্ছে।

পরে জানা গেছে, অতুলনীয় সাফল্য পেয়েছে ব্যাচেলর। একই সঙ্গে আসা অন্যান্য জাহাজগুলো মাসের পর মাস একটা তিমিও পায়নি। কিন্তু ব্যাচেলরকে অতিরিক্ত পিপে কিনতে হয়েছে স্পার্মাসেটি রাখার জন্যে। খোল ছাড়াও ডেক, এমনকি ক্যাপটেন আর অফিসারদের স্টেট-রুম বোঝাই করতে হয়েছে স্পার্মাসেটির পিপেতে। ফোকাসলে নাবিকেরা তাদের সিন্দুক বোঝাই করেছে স্পার্মাসেটিতে, স্টুয়ার্ড ভরেছে তার কফির পাত্র, হারপুনাররা ভরেছে তাদের হারপুনের সকেট। মোট কথা, ক্যাপটেনের প্যান্টের দুই পকেট ছাড়া ব্যাচেলরের প্রায় সবকিছুই এখন স্পার্মাসেটিতে ভরা।

আনন্দে ভরপুর জাহাজটা যতই এগিয়ে এল, ভেসে আসতে লাগল তাদের ঢাকের শব্দ। ট্রাই-পট্স্ ঘিরে দাঁড়িয়ে পাগলের মত ঢাক বাজাচ্ছে ব্যাচেলরের নাবিকরা। পরনে তাদের ব্ল্যাক-ফিশের চামড়ার অদ্ভুত পোশাক। ফোকাসলে ধেই ধেই করে নাচছে কয়েকজন, সঙ্গে তাদের পলিনেশীয় দ্বীপ থেকে আনা জলপাই-রঙা সব মেয়ে। ফোর-মাস্ট আর মেইন-মাস্টের মাঝখানে ঝুলছে কারুকাজময় একটা নৌকো, সেখানে তিমির হাড়ে তৈরি ধনুক নিয়ে আনন্দে আত্মহারা তিন

BanglaBook.org

নিগ্রো।' প্রায় সবাই আনন্দে মগ্ন, কেবল কয়েকজন নাবিক ব্যস্ত ট্রাই-ওয়র্কস খোলায়।

কোয়ার্টার-ডেকে বীরের মত দাঁড়িয়ে নাবিকদের এই আনন্দ-অনুষ্ঠান উপভোগ করছে ক্যাপটেন।

আহাবও সব দেখছে তার জাহাজের কোয়ার্টার-ডেকে দাঁড়িয়ে। কিন্তু দুই ক্যাপটেনের মেজাজে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একজন ঘটে যাওয়া ঘটনায় আনন্দমুখর, আরেকজন ঘটতে যাচ্ছে এমন ঘটনার চিন্তায় রীতিমত বিষণ্ন।

'চলে আসুন, চলে আসুন এখানে।' হাতে ধরা গ্লাস আর বোতল শূন্যে তুলে চেঁচাল ব্যাচেলরের ক্যাপটেন।

'সাদা তিমিটাকে দেখেছেন?' জানতে চাইল আহাব।

'না, শুধু ওটার কথা শুনেছি,' হাসিমুখে জবাব দিল ব্যাচেলরের ক্যাপটেন। 'আমার বিশ্বাস হয় না, অমন কোন তিমি আছে।'

'আপনাকে তো আনন্দে একেবারে ভরপুর দেখছি। চালিয়ে যান। তা, কোন লোকজন হারাতে হয়েছে?'

'তেমন উল্লেখ করার মত কিছু নয়– দু'জন আইল্যাণ্ডার– ব্যস। চলে আসুন এখানে। আপনার চিন্তা দূর করে দেব!'

'বোকার হদ্দ!' বিড়বিড় করল আহাব; তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'আপনার তো ভরা জাহাজ, চলেছেন বাড়ির দিকে, কিন্তু শূন্য জাহাজ নিয়ে আমি চলেছি বাড়ি থেকে দূরে। সুতরাং যে যার পথে যাওয়াই ভাল। পাল সব তুলে দাও, জাহাজ আরও জোরে ছুটুক!'

দেখতে দেখতে দূরত্ব বেড়ে গেল পেকোড আর ব্যাচেলরের। মুখ কালো হয়ে গেল পেকোডের নাবিকদের। যাত্রীরা ভেবেছিল, ব্যাচেলরে উঠে অনেক দিন পর একটু ফুর্তি করবে।

BanglaBook.org

৯৭

জীবনে কখনও কখনও সৌভাগ্যবান কারও ছোঁয়ায় নিজের ভাগ্যের পালেও বাতাস লাগে। আমাদের অনেকটা সেরকমই হলো। ব্যাচেলরের সঙ্গে দেখা হবার পর দিনই তিমির দেখা পেলাম আমরা, মারাও পড়ল চারটে। একটা তিমি মারল স্বয়ং আহাব।

সেদিন চারটে তিমি মারা পড়েছিল চার জায়গায়। একটা বহু দূরে বাতাসের অনুকূলে, একটা বাতাসের প্রতিকূলে, একটা জাহাজের সামনে, আরেকটা পেছনে। তিনটে তিমি সন্ধ্যার আগেই নিয়ে আসা হলো জাহাজের পাশে, কিন্তু দূরেরটা ভোর হবার আগে আনা সম্ভব হলো না।

দূরের এই তিমিটাই মেরেছে আহাব। জাহাজে ফিরতে না পেরে সারারাত থেকে যেতে হলো নৌকোয়। একসময় মনে হলো, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু

কামার তার দু'চোখের পাতা এক করেনি। কান পেতে সে শুনছে তিমির আশেপাশে আনাগোনা করা হাঙরের শব্দ।

একসময় আহাব বলল, 'আবার সেই স্বপ্নটা দেখলাম।'

'কফিনের? আমি তো বলেছি, কফিন আপনার কপালে জুটবে না।'

'সাগরে কারই বা জোটে?'

'তবে এই যাত্রায় দু'টো কফিন আপনি দেখবেন। একটা পার্থিব কারও তৈরি নয়, আরেকটার কাঠ এসেছে আমেরিকা থেকে।'

'হ্যাঁ, এমন কথা অবশ্য বলেছিলে তুমি। অদ্ভুত লাগবে সেই দৃশ্য! তবে দৃশ্যটা আমরা শিগগির দেখতে পাব বলে মনে হয় না।'

'বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, ওই দুই কফিন না দেখা পর্যন্ত আপনার মৃত্যু হবে না।'

এরপর কথা শেষ হয়ে গেল দু'জনের। অনেকক্ষণ পর পুবাকাশে ফুটল ভোরের ধূসর আলো। ধীরে ধীরে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠল নাবিকেরা, তিমিটাকে নিয়ে এল পেকোডের পাশে।

৯৮

সময় এসে গেল। নাবিকেরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে অপেক্ষা করে রইল, কখন আদেশ আসে। অবশেষে এক দুপুরে আদেশ দিল ক্যাপ্টেন আহাব। পেকোড ধীরে ধীরে ঘুরে গেল নিরক্ষরেখার দিকে।

রঙিন কোয়াড্রান্ট চোখে লাগিয়ে বসে থাকে আহাব। নিখুঁতভাবে সূর্যের অবস্থান আন্দাজ করে কোর্স সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বিড়বিড় করে আপন মনে।

দূর থেকে সবকিছু লক্ষ করে স্টারবাক। একদিন সে স্টাবকে বলল, 'আগুনের সামনে বসে থেকে আমি দেখেছি, জ্বলতে জ্বলতে কিভাবে ছাই হয় কয়লা। মানুষের জীবনও অনেকটা এরকমই, ভেতরে তার যত আগুনই থাক, শেষ পরিণতি ছাইয়ে রূপান্তরিত হওয়া!'

'তা ঠিক,' বলল স্টাব, 'তবে ছাই হলেও সেটা সাগর-কয়লার ছাই, কাঠ-কয়লার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। আহাবও আপনার মতই বিড়বিড় করে। নানা কথা লুকিয়ে রয়েছে তার মনে, রয়েছে নানা সঙ্কল্প। হয়তো তার পথটাই ঠিক। যে-খেলা শুরু করেছে, শেষমেশ সেই খেলা খেলতে খেলতেই মরণ আসবে!'

৯৯

শান্ত আবহাওয়ার আড়ালেই অনেক সময় লুকিয়ে থাকে ঝড়। পেকোডকে আঘাত হানল ঝড়ের শ্রেষ্ঠ ঝড়– টাইফুন। কালো হয়ে গেল চারপাশের আকাশ, ছিঁড়ে গেল পেকোডের পাল। ডেকের এক ধারে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে স্টারবাক দেখছে, জাহাজের আরও কি ক্ষতি হয়। ছেঁড়া-ফাড়া পালের দড়ি ঠিক করার জন্যে নাবিকদের নির্দেশ দিচ্ছে স্টাব আর ফ্লাস্ক। আহাবের নৌকো তোলা রয়েছে অনেকখানি ওপরে, কিন্তু ঝড় সেটাকেও রেহাই দেয়নি। ঢেউগুলো আঘাত হানছে নৌকোর তলায়।

'না, কাজ ভাল হচ্ছে না, মি. স্টারবাক,' বলল স্টাব, 'তবে কিনা সাগরকে থামানো কঠিন। অন্তত আমার তো সে-সাধ্য নেই। দেখেছেন, একেকটা ঢেউ লাফ দেয়ার আগে কত দূর পর্যন্ত দৌড়ে যায়? আমার কিন্তু ডেকের এই জায়গাটুকু হলেই যথেষ্ট। সেজন্যেই প্রাচীন গানে আছে—' গলা ছেড়ে গান ধরল স্টাব।

'থামো, স্টাব,' ধমকে উঠল স্টারবাক, 'এখন গান গাইতে দাও টাইফুনকে। তুমি যদি সাহসী লোক হও, তাহলে চুপচাপ থাকো।'

'আমি সাহসী লোক নই। আমি একটা কাপুরুষ, তাই তো সাহস বজায় রাখার জন্যে মাঝে মাঝে গান গাইতে হয়। না, মি. স্টারবাক, গলা কেটে না ফেলা পর্যন্ত গান আমি থামাব না।'

'পাগল! শোনো, মবি ডিকের পিছু নেয়ার জন্যে পেকোড এখন সোজা এগিয়ে চলেছে ঝড়ের দিকে। নাও, এবার ইচ্ছে হলে গান ধরো আবার।'

'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

স্টাবের কথা খেয়াল না করে স্টারবাক বলে চলল, 'সময় আছে, এখনও সময় আছে। জাহাজের কোর্স বদলালে এখনও রক্ষা পাওয়া সম্ভব।'

গাঢ় অন্ধকারের মাঝে কার যেন এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া গেল।

'কে?'

'পুরানো বজ্র,' জবাব দিল আহাব।

'আলো জ্বেলে দাও, আলো জ্বেলে দাও!' হাঁক ছাড়ল স্টারবাক।

নাবিকেরা দৌড়ে দৌড়ে ক্ষীণ আলোর ব্যবস্থা করল। সে-আলোয় ডাগ্‌গুকে মনে হলো স্বাভাবিকের তিন গুণ লম্বা। ঝিকমিক করে উঠল ট্যাসটেগোর দাঁত, কুইকেগের উল্কিগুলোকে মনে হলো শয়তান উপাসকদের কোন চিহ্ন।

'পবিত্র আত্মা আমাদের রক্ষা করুক। শুনুন, মি. স্টারবাক, মেইন-মাস্টের গায়ে জ্বলজ্বলে ওই আলোটা দেখতে পাচ্ছেন? আমার মনে হয় ওটা একটা ভাল লক্ষণ।'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি,' ফিসফিস করে বলল স্টারবাক, 'ওই আলোয় যেন অপার্থিব কিছু একটা আছে।'

'পবিত্র আত্মা আমাদের রক্ষা করুক!' বলল স্টাব।

মেইন-মাস্টের নিচে, আহাবের ঠিক সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে কামার। ওপরে দড়িদড়ায় ঝুলছে নাবিকেরা। যে দু'চারজন নাবিক ডেকে রয়েছে, তাদেরও দৃষ্টি ওপরদিকে নিবদ্ধ।

'হ্যাঁ,' বলল আহাব, 'দেখো সবাই ওপরের ওই আলো। ওই আলোই দিক নির্দেশ করছে সাদা তিমিটার। আলোর কাছ থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দাও কেউ, সাদা তিমিটার হৃদস্পন্দন অনুভব করে দেখি!'

BanglaBook.org

এক হাতে নামিয়ে দেয়া দড়ি ধরে, কামারের কাঁধে পা দিয়ে খানিকটা ওপরে উঠল আহাব। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আগুনের আত্মা, একসময় তোমার পুজো করেছি আমি। পুজো করতে গিয়ে ঝলসে গেছে শরীর, সে-দাগ এখনও মিশে যায়নি। তবে তোমার শক্তি এখন ভর করেছে আমার ভেতরে।'

'নৌকো! নৌকো!' চেঁচিয়ে উঠল স্টারবাক, 'আপনার নৌকোর দিকে লক্ষ রাখুন, ক্যাপটেন!'

আহাবের নতুন হারপুনটা রাখা আছে তার হোয়েল-বোটের ক্রুচে। কিন্তু ঢেউয়ের ধাক্কায় খুলে পড়েছে চামড়ার ঢিলে আবরণ। আহাবের একটা বাহু চেপে ধরে স্টারবাক বলল, 'এই যাত্রা অশুভ। ঈশ্বরের দোহাই, এখনও ফিরে চলুন বাড়ির পথে।'

ঝট করে হারপুনটা তুলে নিল আহাব। কেউ তাকে বাধা দিলে বিনা দ্বিধায় গেঁথে ফেলবে, হুমকি দিল।

ভয়ে পিছিয়ে গেল স্টারবাক। জ্বলজ্বলে চোখে আহাব বলল, 'আমার সঙ্গে সাদা তিমিটাকে মারতে যাবে বলে শপথ করেছ। সে-শপথ তোমরা ভাঙতে পারো না!'

১০০

হালের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল আহাব, ধীরে ধীরে স্টারবাক এসে দাঁড়াল ঠিক তার সামনে।

'মূল পালটা নামিয়ে ফেলতে হবে, স্যার। ঝড়ে আবার ঢিলে হয়ে গেছে দড়ি। নামাতে বলব, স্যার?'

'খবরদার, কোনকিছু নামানো নয়।'

'স্যার, শুনুন, স্যার, দয়া করে শুনুন।'

'হুঁ, বলো।'

'নোঙরগুলো নড়ছে, ওগুলো তুলে ফেলব?'

'খবরদার! কোনকিছু নড়াবে না, কোন জিনিস তুলবে না। বাতাস একটু জোরে বইছে সত্যি, কিন্তু ভয় পাবার কারণ এখনও ঘটেনি। সামান্য কিছুতেই অহেতুক ছুটাছুটি– পাল নামাব, স্যার? যত্তসব কাপুরুষ! মানুষ অল্পেই অস্থির হয় পেটের অসুখ করলে। যাও, ওষুধ খাও এক্ষুণি!'

১০১

পরদিন সকালে ঝড়ের বেগ কমে এলেও সাগরে এখনও উঠছে বড় বড় ঢেউ। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ছুরির ফলার মত আলো ছড়াচ্ছে সূর্য। এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আছে আহাব, মাঝে মাঝে সূর্যের তির্যক আলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন

BanglaBook.org

অনুমানের চেষ্টা করছে।

হঠাৎ হালের কাছে এগিয়ে এসে জানতে চাইল আহাব, পেকোড এখন কোন্‌দিকে চলেছে।

'পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব, স্যার,' ভয়ে ভয়ে জবাব দিল কাণ্ডারী।

'মিথ্যুক!' কাণ্ডারীকে একটা ঘুসি লাগাল আহাব। 'সকালে জাহাজ পুবে গেলে সূর্য পেছনে থাকে কিভাবে?'

আহাবের কথা চমকে দিল জাহাজের সবাইকে। আরে, তাই তো, এ-ব্যাপারটা তো কেউই লক্ষ করেনি।

বিনাকলের কম্পাস দেখার জন্যে ঝুঁকে পড়ল আহাব, পেছনে স্টারবাক। কম্পাসের দু'টো কাঁটাই আটকে আছে পুবমুখো হয়ে। অর্থাৎ, পেকোড এখন নিঃসন্দেহেই চলেছে পশ্চিমে।

একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে বুড়ো বলল, 'বুঝেছি! এরকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। মি. স্টারবাক, গত রাতের বিদ্যুৎ ঝড়ে কম্পাস নষ্ট হয়ে গেছে। এই ধরনের ঘটনার কথা নিশ্চয় শুনেছ তুমি।'

'তা শুনেছি, স্যার, কিন্তু ঘটতে দেখিনি কখনও,' বিষণ্ণ মুখে জবাব দিল স্টারবাক।

জাহাজ দারুণ বিদ্যুৎ ঝড়ে পড়লে কম্পাস অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। কখনও নষ্ট হয় নির্দিষ্ট কোন কম্পাস, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিনাকলের কম্পাসটা বিকল হলে জাহাজের একটা কম্পাসও আর সচল থাকে না।

তবে আহাব উন্মাদ হোক আর যা-ই হোক, জাহাজের কাজে তার মত পারদর্শী লোক খুব কমই আছে। বর্শার ইস্পাতের মাথাটা খুলে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মেরামত করে ফেলল বিনাকলের কম্পাস।

বিস্ময়ে চুপ মেরে গেল সবাই, আর ক্যাপটেন আহাবের মুখে ফুটে উঠল দারুণ গর্ব।

১০২

নিয়তির যাত্রায় ভাসমান পেকোড চলেছে তো চলেইছে। অনেক দিন হলো কোন লগ লাইন ব্যবহার করা হয়নি। পরীক্ষা করার জন্যে একদিন বেশকিছু লাইন পেঁচিয়ে হাতে নিল আহাব।

লক্ষ করতে করতে এক ম্যাংক্স নাবিক সাহস করে শেষমেশ বলল, 'ওই লাইনে আর কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না, স্যার। রোদে পুড়ে আর পানিতে ভিজে ওগুলো একেবারে শেষ হয়ে গেছে।'

'বুড়ো মিয়া, তুমিও তো দীর্ঘ দিন রোদে পুড়ছ আর পানিতে ভিজছ, কিন্তু তাই বলে তুমি কি শেষ হয়ে গেছ? যাকগে, তর্ক বাদ দিয়ে এখন এই লাইনগুলো একটু ধরো।'

'ধরছি, স্যার। আপনি ঠিকই বলেছেন, বুড়ো মানুষদের তর্ক করা শোভা পায়

না। ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে তর্ক করা উচিতও নয়।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'আইল অভ ম্যান।'

'চমৎকার! তাহলে ওই দ্বীপ থেকেই সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছ তুমি।'

'আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছি কিনা তা জানি না, স্যার। তবে ওই দ্বীপেই আমার জন্ম।'

লগ টেনে তোলা হলো, টান টান হয়ে গেল লাইন। টলতে লাগল বুড়ো ম্যাংক্স নাবিক।

'শক্ত করে ধরে রাখো!'

হঠাৎ পটাং করে ছিঁড়ে গেল লাইন।

'কোয়াড্রান্ট আমি আছড়ে ভেঙেছি, কম্পাস বিকল হয়েছিল, এখন পাগলা সাগর ছিঁড়ে ফেলল লগ-লাইন। কিন্তু আহাব সব মেরামত করতে পারে। তোমরা দড়িটা জোড়া দাও, আর ছুতোরকে ডেকে বলো আরেকটা লগ তৈরি করে দিতে।'

'ওই যে চলে যাচ্ছে ক্যাপটেন। তার হিসেবে কোথাও অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি। কিন্তু আমার তো মাথা ঘুরছে। আরে, পিপ যে, আমাদের সাহায্য করতে এসেছ, অ্যাঁ?'

'পিপ? পিপ বলে কে ডাকল? পিপ তো ঝাঁপিয়ে পড়েছে হোয়েল-বোট থেকে। তারপর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রশিটা উঠতে চাইছে না কেন, পানির নিচ থেকে নিশ্চয় টেনে ধরেছে পিপ। তাড়াতাড়ি তুলে নাও রশিটা, তুলতে অসুবিধে হলে কেটে দাও হ্যাচেট দিয়ে। জাহাজে আর কোন কাপুরুষকে দেখতে চাই না আমরা। ক্যাপটেন আহাব! স্যার! পিপ আবার জাহাজে উঠতে চাইছে!'

'দূর, যত্তসব পাগলামি!' ধমকে উঠল ম্যাংক্স নাবিক পিপের একটা হাত ধরে, 'ভাগ্ এখান থেকে!'

'বড় গাধা সবসময়ই ছোটদের ধমকায়,' বিড়বিড় করতে করতে এগোল আহাব। 'ছাড়ো ওর হাত! পিপ কোথায়, বাছা?'

'স্টার্নে, স্যার। ওই দেখেন!'

'তাহলে তুমি কে?'

'বেল-বয়, স্যার। এই কে কোথায় আছ, পিপ কাপুরুষকে দেখেছ কেউ? খুঁজে দাও, খুঁজে দাও; পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।'

'ওহ্, ছেলেটা আমার মনের গভীরে খোঁচা দিয়েছে। শোনো সবাই, যত দিন আহাব বেঁচে আছে, পিপ থাকবে তার কেবিনে।'

'এটা কি? মখমলের মত নরম,' আহাবের একটা হাত তুলে নিয়ে দেখতে লাগল সে মনোযোগ দিয়ে। 'আহ্, এরকম একটা জিনিস নাড়ার সুযোগ পেলে পিপ বোধহয় হারিয়ে যেত না। স্যার, আমার মনে হচ্ছে, এটা একটা রশি যা দিয়ে দুর্বল মন বেঁধে রাখা যায়। পার্থকে ডাকুন, আপনার হাতের সঙ্গে আমার হাতটা জোড়া লাগিয়ে দিক। আমি এটাকে আর ছেড়ে দিতে চাই না।'

BanglaBook.org

'ওরে, যদি ভয়ঙ্কর কোন বিপদ না আসে, আমিও ছাড়তে চাই না তোর হাত। চল্, আমার কেবিনে চল্। কোন সম্রাটের চেয়ে কেবিনে তোকে নিয়ে যেতেই বেশি ভাল লাগবে আমার!'

'চলল দুই পাগল একসঙ্গে,' বিড়বিড় করতে লাগল ম্যাংক্স নাবিক। 'একজন সবল পাগল, একজন দুর্বল। কিন্তু এই লাইনকে এখন জোড়া দেবে কে, এটা কি জোড়া দেয়ার অবস্থায় আছে? এর চেয়ে বদলে নতুন লাইন লাগানো অনেক ভাল। যাই, এই বিষয়ে মি. স্টাবের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

১০৩

পেকোড ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে নিরক্ষরেখার দিকে। চারপাশের প্রকৃতি সম্পূর্ণ শান্ত। হাবভাবে মনে হচ্ছে, এটা যেন কোন বিপদের পূর্বাভাস।

একসময় এদিক-সেদিক চোখে পড়ল পাথুরে কয়েকটা খুদে দ্বীপ। ফ্লাস্কের নেতৃত্বে পাহারাদাররা একরাতে হঠাৎ শুনতে পেল অপার্থিব এক আর্তনাদ, যেন গোঙাচ্ছে প্রেতাত্মার দল। কান খাড়া হয়ে গেল সমস্ত নাবিকের, কিন্তু গোঙানি বন্ধ হলো না। খ্রিস্টান এবং অপেক্ষাকৃত সভ্য নাবিকেরা বলল, চিৎকার করছে মৎস্যকুমারীরা। কথাটা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল তাদের সারা শরীর। সবচেয়ে বয়স্ক ম্যাংক্স নাবিক বলল, গোঙাচ্ছে আসলে সদ্য ডুবে যাওয়া মানুষদের প্রেতাত্মা।

নিচ থেকে আহাব অবশ্য এই ডাক শুনতে পেল না। পরদিন সকালে ডেকে আসতে তাকে সব খুলে বলল ফ্লাস্ক। শোনার পর হো হো করে হেসে উঠে রহস্যটা ভেঙে দিল ক্যাপটেন।

নিরক্ষরেখার আশেপাশের পাথুরে দ্বীপগুলোয় হাজার হাজার সীলমাছের আবাস। তাদেরই কোন বাচ্চা মাকে হারিয়ে কিংবা কোন মা বাচ্চাকে হারিয়ে কাতর হয়ে পড়েছিল। সীলমাছের ডাক অবিকল মানুষের মত। সে-ডাক শুনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনেক নাবিকই অযথা আতঙ্কিত হয়।

পরদিন ঘটল আরেক ঘটনা। মাস্ট-হেডে প্রহরারত নাবিক দেখল, কী যেন একটা খুলে পড়ল পেকোড থেকে নিচে, নীল সাগরের খানিকটা অংশ ভরে গেল শাদা বুদবুদে।

খুলে পড়েছে লাইফ-বয়া। প্রহরারত নাবিক ভাবল, এটা নিশ্চয় কোন অমঙ্গলের আভাস। তা অমঙ্গল হোক আর যা-ই হোক, আরেকটা লাইফ-বয়া ঝোলাতে হবে স্টার্নে। নতুন লাইফ-বয়া তৈরি করানোর ভার পড়ল স্টারবাকের ওপর। কিন্তু খুঁজে-পেতে হালকা কিছু না পেয়ে সে যখন লাইফ-বয়ার আশা ত্যাগ করছে, ঠিক তখনই কুইকেগ দেখিয়ে দিল তার কফিনটা।

'কফিন দিয়ে লাইফ-বয়া!' বলল বিস্মিত স্টারবাক।

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছে না?' মাথা ঝাঁকাল স্টাব।

'তবে লাইফ-বয়া হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়,' বলল ফ্লাস্ক, 'আমার তো মনে

BanglaBook.org

হয়, ছুতোর ওটা দিয়ে বেশ সহজেই লাইফ-বয়া তৈরি করতে পারবে।'

'তৈরি করার মত উপযুক্ত আর কিছু নেই যখন, নিয়ে এসো ওটাই,' খানিক চুপ করে থাকার পর আদেশ দিল স্টারবাক। 'ছুতোর, ওভাবে তাকিয়ে থেকো না, ঝটপট একখানা লাইফ-বয়া তৈরি করে ফেলো।'

'ডালাটা পেরেক দিয়ে আটকে দেব, স্যার?' একটা হাতুড়ি হাতে এগিয়ে এল ছুতোর।

'হ্যাঁ।'

'ফুটোগুলো বন্ধ করে দেব দড়ি গুঁজে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর সেই দড়ির ওপর পিচ দেব, স্যার?'

'দূর হও আমার সামনে থেকে, দূর হও! তোমার যা খুশি করো, আমার কেবল একখানা লাইফ-বয়া চাই- ব্যস।'

'আদেশ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে তো চলে গেল অফিসার। এখন আমার কাজের পালা। ক্যাপটেন আহাবের জন্যে একটা পা বানালাম, ক্যাপটেন সেটা ভদ্রলোকের মত পরে আছে। কিন্তু এত কষ্ট করে বানানো কফিনটা তো কুইকেগের কোন কাজে লাগল না। অযথা খাটতে ভাল লাগে না বাপু। এখন আবার কফিন দিয়ে লাইফ-বয়া বানাতে হবে। কফিন দিয়ে লাইফ-বয়া বানানোর কথা কেউ শুনেছে কখনও? যাকগে, আমি হলাম ছুতোর। আমার অত মাথা ঘামিয়ে কাজ কি! ফুলশয্যার খাট আর কফিন যদি একই হাতে বানাতে পারি, তাহলে লাইফ-বয়া বানাতেই বা আপত্তিটা কিসের? কফিন দিয়ে বানাতে হবে, তাতে কি হয়েছে? ছুতোরের হাতে কফিন এক টুকরো কাঠ বই কিছু নয়। চিন্তা বাদ দিয়ে এবার লেগে পড়া যাক কাজে,' বিড়বিড় করতে করতে কাজে হাত লাগাল ছুতোর।

১০৪

কেবিন গ্যাংওয়ে ধরে পা বাড়াতেই আহাবের পিছু নিল পিপ। আহাব বলল, 'যা, ফিরে যা, আমি এখনই আসছি।'

একটু পরেই ছুতোরের সামনে এসে দাঁড়াল সে, 'এখানে কি হচ্ছে?'

'লাইফ-বয়া, স্যার। মি. স্টারবাকের আদেশ।'

'আচ্ছা, তুমিই তো আমার পা তৈরি করেছিলে?'

'জ্বী। কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো, স্যার?'

'না। কিন্তু কফিনটাও তো তোমারই তৈরি?'

'জ্বী, কুইকেগের জন্যে বানিয়েছিলাম। এখন ওই কফিন দিয়েই আবার অন্য জিনিস বানাতে হচ্ছে।'

'তাহলে তোমার নিয়ম-নীতি বলে কিছু নেই, তাই না? কখনও তুমি তৈরি করো পা, কখনও কফিন, আবার কখনও সেই কফিন দিয়েই লাইফ-বয়া।'

'আমি কিছু ভেবে করি না, স্যার। হাতের কাছে যখন যে-কাজ পাই, করি।'

'আচ্ছা, কফিন তৈরি করতে করতে কখনও কি তুমি গান গাওনি? কবর যারা খোঁড়ে, তারাও কিন্তু খুঁড়তে খুঁড়তে গান গায়।'

'ওরা গান গায় ওদের যন্ত্রপাতি গান জানে না বলে। আমার, স্যার, যন্ত্রপাতিই গান গায়, তাই নিজে গাইবার প্রয়োজন পড়ে না।'

ফিরতে ফিরতে বিড়বিড় করতে লাগল আহাব, 'এই ব্যাটার কফিনের লাইফ-বয়া বানানোর শব্দে কান তো ঝালাপালা হয়ে যাবে। উঁহুঁ, বলে দিতে হবে, এবার ডেকে এসে এই জিনিস যেন আর না দেখি। পিপের সঙ্গে আলাপ করতে হবে এ-বিষয়ে। ইতিমধ্যেই ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি।'

১০৫

পরদিন দেখা হলো র‍্যাচেল নামের এক জাহাজের সঙ্গে। পেকোড তখন এগোচ্ছিল পূর্ণ গতিতে, র‍্যাচেল একেবারে সামনে এসে পড়ায় থামতে বাধ্য হলো।

'দুঃসংবাদ, নিশ্চয় দুঃসংবাদ আছে,' বিড়বিড় করল বুড়ো মোংক্স। শিঙ্গা মুখে নৌকোয় দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাচেলের ক্যাপটেন। খানিক পরেই আহাব বেরিয়ে এল বাইরে।

'সাদা তিমিটাকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, গতকাল। কোন নৌকো ভেসে যেতে দেখেছেন?'

না-সূচক জবাব দিল আহাব। লাফিয়ে পেকোডের ডেকে উঠল র‍্যাচেলের ক্যাপটেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে চিনতে পারল আহাব, ন্যানটাকেটেই ভদ্রলোকের বাড়ি।

'তিমিটা কোথায়?– মারা যায়নি নিশ্চয়?' এগিয়ে এল উত্তেজিত আহাব।

গতকাল বিকেলে একদল তিমি দেখে পিছু নিয়েছিল র‍্যাচেলের তিনটে নৌকো। জাহাজ থেকে চার পাঁচ মাইল এগোবার পর হঠাৎ তাদের সামনে ভেসে উঠল মবি ডিকের প্রকাণ্ড সাদা মাথা আর কুঁজ। তিমিটাকে দেখে নামানো হলো চতুর্থ আরেকটা নৌকো। বাতাসের অনুকূলে বেশ খানিকটা এগোবার পর হারপুন গাঁথতে সমর্থ হলো ওটা। কিন্তু তীর বেগে সেটাকে টানতে টানতে উধাও হয়ে গেল মবি ডিক। চিন্তিত হয়ে পড়ল নাবিকেরা, তবে আতঙ্কিত হবার মত তেমন কিছু খুঁজে পেল না। আঁধার নেমে এল সাগরের ওপর। ফলে সেদিনের মত খোঁজার আশা ত্যাগ করতে হলো সবাইকে। পরদিন খোঁজ শুরু হলো চারদিকে নৌকো পাঠিয়ে, কিন্তু চতুর্থ সেই নৌকোটাকে আর পাওয়া গেল না।

কথা শেষে পেকোডকেও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অনুরোধ করল র‍্যাচেলের ক্যাপটেন। দুই জাহাজ মিলে অনুসন্ধান করলে কাজ অনেক সহজ হয়ে আসবে।

'আমার মনে হয়,' ফিসফিস করে উঠল স্টাব ফ্লাস্কের কানে কানে, 'হারানো নৌকোয় রয়েছে ক্যাপটেনের সবচেয়ে ভাল কোটটা। তাই ওটা পাবার জন্যে

BanglaBook.org

অস্থির হয়ে উঠেছে বেচারি। তিমি মারার এই সুসময়ে একটা হোয়েল-বোট খোঁজার জন্যে দু'টো জাহাজ ব্যস্ত হবার কথা কেউ শুনেছে কখনও? কিন্তু ক্যাপটেনের মুখটা অমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে কেন? উঁহুঁ, আমার মনে হচ্ছে কোট নয়– ঘটনা গুরুতর–'

'নৌকোটায় অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে আমার ছেলে– আমার নিজের ছেলে,' আহাবের সামনে প্রায় হাতজোড় করে দাঁড়াল র‍্যাচেলের ক্যাপটেন, 'তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে আপনার জাহাজটা দয়া করে দিন আমাকে। আমি এজন্যে ভাড়া দেব, উপযুক্ত ভাড়া দেব– আমার এই অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।'

'ছেলে!' বলল স্টাব, 'আহা, বেচারির ছেলে হারিয়ে গেছে! কোট নিয়ে বাজে কথা বলার জন্যে আমি সত্যিই লজ্জিত।'

'আর সবার সঙ্গে ডুবে গেছে সে,' বলল বুড়ো ম্যাপল, 'সেরাতে তাদের প্রেতাত্মার গোঙানিই শুনেছি আমরা।'

'ছেলেটাকে আমাদের উদ্ধার করতেই হবে,' বলল স্টাব।

শুধু ক্যাপটেনের ছেলেই নয়, হারিয়ে গেছে ন্যানটাকেটের আরেকটা বারো বছরের ছেলে। তাই শেষমেশ র‍্যাচেলের ক্যাপটেন আহাবকে বলল, 'আপনি রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না। সন্তান আপনারও আছে, আমার অবস্থাটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।'

'থামুন,' বলল আহাব, 'ক্যাপটেন গার্ডিনার, আপনার আবদার রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। মি. স্টারবাক, অন্য জাহাজের সবাইকে পেকোড থেকে নেমে যেতে বলো, আর তিন মিনিটের মধ্যে রওনা দাও পূর্ণ গতিতে,' ঘুরে কেবিনের দিকে পা বাড়াল সে।

১০৬

আহাব ডেকের দিকে এগোতেই তার একটা হাত ধরে ফেলল পিপ।

'এখন আমার পিছু নিস না। এখানে আমার চেয়ারে বসে থাক, ক্যাপটেনের মত সম্মান পাবি।'

'না, না, না, আমি একা থাকতে চাই না, আমি সবসময় আপনার একটা অংশ হয়ে থাকতে চাই।'

'ছেলেটার মাথা বোধ হয় ভাল হয়ে যাচ্ছে।'

'স্যার, শুনেছি, স্টাব ছেড়ে গিয়েছিল বলেই নাকি ডুবে গেছে পিপ। আমি কখনও আপনাকে ছেড়ে যাব না।'

'এখন তোর যাওয়া চলবে না আমার সঙ্গে।'

ফোঁপাতে লাগল পিপ।

'খবরদার, কাঁদবি তো একেবারে খুন করে ফেলব। শোন, সঙ্গে যাবার

BanglaBook.org

দরকার নেই, তুই এখান থেকেই আমার পায়ের শব্দ পাবি। তুই খুব ভাল ছেলে রে, একদম খাঁটি! এরকম থাকার চেষ্টা করিস, তাহলে ঈশ্বর তোকে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করবে।'

আহাব চলে গেল, এক ধাপ এগিয়ে থেমে গেল পিপ।

'মঁসিয়ে, তোমরা কেউ পিপকে দেখেছ? কালো একটা ছেলে, পাঁচ ফুট লম্বা, ভীতু– একবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হোয়েল-বোট থেকে। দেখোনি? বেশ। আরে, ঠিকই তো স্যারের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। না, স্যারের কাছে যাব না। পরিস্থিতি যত খারাপই হোক, আমি এখানেই থাকব।'

১০৭

এত দিনে সাদা তিমিটাকে আওতার মধ্যে পেয়েছে আহাব। বিশাল জলরাশি জুড়ে বিচরণকারী তিমিটা এখন এসে গেছে মাত্র এক মহাসাগরের সীমানায়। সেইসঙ্গে হারিয়ে গেছে নাবিকদের যাবতীয় হাসি-আনন্দ। স্টাব আর রসিকতা করে না, স্টারবাকেরও সময় নেই রসিকতা শোনার। যন্ত্রের মত ডেকে ঘুরে বেড়ায় তারা, সবসময় সচকিত হয়ে থাকে অত্যাচারী একজোড়া চোখের কথা ভেবে।

এখন, শুধু আহাব না থাকলে, দিন-রাতের যে-কোন সময়ে নাবিকেরা আসে ডেকে। আহাব প্রায়ই এখন দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে, কখনও পায়চারি করে মেইন আর মিজেন-মাস্টের মাঝখানে। আবার কখনও দাঁড়িয়ে থাকে কেবিনের সামনে, হ্যাট নামানো থাকে চোখের ওপরে, ফলে নিশ্চল ক্যাপটেনকে দেখে অনেক সময়েই বোঝা যায় না সে ঘুমিয়ে আছে নাকি জেগে। ইদানীং হ্যামকে আর ওঠেই না আহাব। নাবিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে, ভারী হ্যাটের নিচ থেকে আহাব বুঝি তাদের ওপরেই রেখেছে কড়া নজর। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত গড়িয়ে যাচ্ছে এভাবেই। রাতের কুয়াশায় আহাবের পোশাক ভিজে যায়, পরদিন আবার শুকিয়ে যায় সূর্যের তাপে।

ঊষার প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসে আহাবের চিৎকার– 'মাস্ট-হেডে ওঠো!'– তারপর গোধূলি পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় সে বলতে থাকে– 'কিছু দেখতে পেলে? ভাল করে দেখো! নজর আরও তীক্ষ্ণ করো!'

কিন্তু র‍্যাচেলের সঙ্গে দেখা হবার তিন চার দিন পরেও যখন কারও চোখে পড়ল না তিমির কোন ফোয়ারা, তিন হারপুনার ছাড়া আর সবার ওপর সন্দেহ এসে গেল আহাবের। তার মনে হলো, ফোয়ারা উঠেছে ঠিকই, কিন্তু নজর এড়িয়ে গেছে অমনোযোগী নাবিকদের। সুখের বিষয়, এই সন্দেহের কথা আহাব প্রকাশ করল না।

তবে এক সকালে সে ঘোষণা দিল, 'তিমিটা প্রথমে আমিই দেখতে চাই। হ্যাঁ, ওই ডাবলুন্ আহাবকেই পেতে হবে!'

একটা পা কৃত্রিম বলে মাস্ট-হেডে ওঠা আহাবের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং

ওপরে উঠবে সে ঝুড়ির সাহায্যে। ঝুড়িতে বসে পড়বে সে, তারপর তাকে ওপরে তোলা হবে দড়ি টেনে টেনে। এই প্রক্রিয়ার একটা বিপদ আছে। ওপরে ওঠানোর পর নিচ থেকে সবসময় একজনকে ধরে থাকতে হয় দড়ি। কারণ, দড়ি ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবে ঝুড়ি। কে নেবে এই ভার? ডাগগু, কুইকেগ, ট্যাসটেগোর ওপর দিয়ে ঘুরে আহাবের দৃষ্টি শেষমেশ এসে স্থির হলো চীফ মেট স্টারবাকের ওপর।

প্রথম বার ওপরে উঠে মিনিট দশেক থাকল আহাব। লাল টকটকে ঠোঁটের একটা সামুদ্রিক বাজপাখি কিছুক্ষণ ঘুরল তার মাথার চারপাশে, খাড়া উঠে গেল অনেক ওপরে, তারপর নেমে এসে আবার ঘুরতে লাগল।

কিন্তু আহাবের দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ, বুনো পাখিটাকে সে লক্ষই করেনি।

'আপনার হ্যাট, স্যার! আপনার হ্যাট!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মিজেন মাস্ট-হেডে পাহারারত একজন সিসিলিয়ান নাবিক।

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। হ্যাট খুলে নিয়ে অনেকটা সরে গেছে পাখিটা।

প্রাচীন কালে এক ঈগল তারকিনের মাথার চারপাশে বার তিনেক ঘুরে হ্যাট খুলে নিয়ে, ফিরিয়ে দিয়েছিল আবার। আর তারপরেই তার স্ত্রী, তানাকিল ঘোষণা করেছিল যে তারকিনই হবে রোমের রাজা।

সেক্ষেত্রে হ্যাট খুলে নিয়েও ফিরিয়ে দেয়াটা বিবেচিত হয়েছিল শুভ লক্ষণ হিসেবে। কিন্তু সামুদ্রিক বাজপাখিটা ফিরিয়ে দিল না আহাবের হ্যাট। উড়তে উড়তে একসময় দিগন্তে মিলিয়ে গেল পাখিটা। তবে ঠিক যেখানে মিলিয়ে গেল, সেখান থেকে কালো একটা বিন্দু খসে পড়ল অনেক নিচের সাগরে।

BanglaBook.org

১০৮

এগিয়ে চলল পেকোড। কেটে গেল দিনের পর দিন। অবশেষে একদিন দেখা হলো বিষণ্ন এক জাহাজের সঙ্গে। এরকম একটা জাহাজের নাম ডিলাইট, এর চেয়ে বড় ব্যঙ্গ বুঝি আর কিছু হতে পারে না।

জাহাজটায় ঝুলছে ছিন্নভিন্ন একটা নৌকো, হোয়েল-বোট হিসেবে ওটাকে চিনতেও কষ্ট হয়।

'সাদা তিমিটাকে দেখেছেন?'

'দেখেছি!' জবাব দিল ডিলাইটের শীর্ণ ক্যাপটেন।

'ওটাকে মেরেছেন?'

'ওই তিমিকে মারার মত হারপুন আজও তৈরি হয়নি।'

'হয়নি!' ক্রচ থেকে নিজের হারপুনটা তুলে নিল আহাব– 'এই দেখুন, এটার আঘাতেই শেষ হবে অভিশপ্ত তিমিটার জীবন!'

'ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন। ওই হ্যামকে পড়ে থাকা মৃতদেহটা দেখতে পাচ্ছেন? গতকালও জীবিত ছিল পাঁচজন তরতাজা যুবক, আজ তাদের একজনকে কবর দিতে পারছি, মরার আগেই কবর হয়ে গেছে বাদবাকি

চারজনের।' একজন নাবিকের দিকে ঘুরল সে, 'সব তৈরি? তক্তাটাকে ওপরে রেখে দেহটা তোলো। হে ঈশ্বর'– হাত ওপরে তুলে এগিয়ে গেল সে হ্যামকটার দিকে– 'হয়তো সেই পুনরুজ্জীবন–'

'জাহাজ চালু করো! এই মুহূর্তে!' বজ্রের মত ঘোষিত হলো ক্যাপটেন আহাবের আদেশ।

কিন্তু পেকোড যাত্রা শুরু করার আগেই ডিলাইট থেকে পানিতে আছড়ে পড়ল হতভাগ্য নাবিকের দেহ।

১০৯

সে রাতে পাহারার মাঝখানে ডেকে এসে হঠাৎ কুকুরের মত সাগরের দিকে নাক বাড়িয়ে কি যেন শুঁকল আহাব। তারপর ঘোষণা দিল, কাছেপিঠে কোথাও অবশ্যই একটা তিমি রয়েছে। শিগগিরই সবাই পেল অদ্ভুত সেই গন্ধ।

সকাল হতেই শোনা গেল তার বজ্র গর্জন, 'মাস্ট-হেডে উঠে পড়ো! ডেকে আসো সবাই!'

ফোকাসলে তিনটে হ্যাণ্ডস্পাইক দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি দিয়ে নাবিকদের ঘুম ভাঙাল ট্যাসটেগো।

'কি দেখতে পাচ্ছ?' আকাশের দিকে মুখ তুলল আহাব।

'কিছুই না, স্যার,' জবাব দিল মাস্ট-হেডে দাঁড়ানো নাবিক।

বিরক্ত হয়ে আহাব নিজেই উঠতে চাইল ওপরে। তাকে ওপরে তুলতে দিগন্তের দিকে চেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে ডাকছে! সে ডাকছে! বরফ-পাহাড়ের মত সাদা কুঁজ! ওই যে মবি ডিক!'

আহাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠল তিন মাস্ট-হেডের নাবিক। বিখ্যাত তিমিটাকে এক নজর দেখার জন্যে অন্যেরা ছুটল জাহাজের প্রান্তে। আহাবের সমান উচ্চতায় উঠে পড়েছে ট্যাসটেগো। তাদের মাইলখানেক সামনে দেখা যাচ্ছে মবি ডিকের ঝকঝকে সাদা কুঁজ, নিয়মিত বিরতিতে ফোয়ারা ছাড়ছে তিমিটা। নাবিকদের মনে হলো, চাঁদনি রাতে ঠিক এরকম ফোয়ারাই তারা দেখেছে আটলান্টিক আর ভারত মহাসাগরে।

'তোমাদের কেউই তিমিটাকে আমার আগে দেখতে পাওনি?' ওপরে ওঠা নাবিকদের দিকে চেয়ে জানতে চাইল আহাব।

'আমি স্যারের সঙ্গেই দেখতে পেয়েছি,' বলল ট্যাসটেগো।

'সঙ্গে নয়– উঁহুঁ, একসঙ্গে নয়–, না, ওই ডাবলুন আমার, নিয়তিই আমার জন্যে তুলে রেখেছে ওটা। সাদা তিমিটাকে আমিই আগে দেখতে পেয়েছি। ওই যে সে ডাকছে! সে ডাকছে! আবার! আবার!' স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মত বকছে আহাব। 'শব্দ না করে ওর উপায় নেই! মি. স্টারবাক, লক্ষ রেখো, জাহাজ যেন কোন দিকে ঘুরে না যায়! প্রস্তুত হয়ে থাকো সবাই, একদম প্রস্তুত! ওই যে লেজ! না, লেজ নয়, কালো পানি! নৌকো সবগুলো তৈরি? মি. স্টারবাক, আমাকে

BanglaBook.org

নামিয়ে দাও! নামাও! শিগগির!' ডেকে নামল আহাব।

'ওটা চলেছে বাতাসের দিকে, স্যার,' বলল স্টাব, 'সোজা আমাদের সামনে সামনে। জাহাজ এখনও দেখতে পায়নি।'

'চুপ করো সবাই! চুপ করো! নৌকো নামাও! নৌকো!'

দেখতে দেখতে নামানো হলো স্টারবাক ছাড়া আর সবার হোয়েল-বোট। ঝপাঝপ দাঁড় পড়তে লাগল পানিতে। সবচেয়ে সামনে আহাবের নৌকো।

প্রায় নিঃশব্দে তারা গিয়ে পৌঁছুল শত্রুর পাশে। হাবভাবে মনে হলো, তিমিটা তাদেরকে লক্ষ করেনি। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওটার সাদা কুঁজ, আশেপাশের সাগর সম্পূর্ণ শান্ত, যেন কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে কেউ পানির ওপরে। সামান্য ভেসে আছে তিমিটার মাথা, চোয়ালের ওপরের কুঞ্চনগুলো দেখতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। পিঠের ওপরে বেরিয়ে আছে সাম্প্রতিক ছোঁড়া একটা লম্বা বর্শার ভাঙা অংশ। আশেপাশে উড়ছে অসংখ্য সামুদ্রিক পাখি, তাদের ঝাঁক কখনও চাঁদোয়া সৃষ্টি করছে সাদা তিমিটার ওপর, আবার কোন কোনটা এসে বসছে বর্শায়।

রাজকীয় ভঙ্গিতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে হঠাৎ লেজ ওপরে তুলল তিমিটা, তারপর ডুবে গেল ভুস করে। পানিতে যে-আলোড়ন উঠল, তা ঘিরে উড়তে লাগল সামুদ্রিক পাখির দল।

উত্তেজনায় টান টান হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তিনটে নৌকো, আবার কখন উঠে আসে মবি ডিক।

'এক ঘণ্টা,' বলল আহাব হোয়েল-বোটের স্টার্নে দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি পানির ওপর স্থির।

'পাখি! পাখি!' বলল ট্যাসটেগো।

সাদা পাখিগুলো আহাবের নৌকোর দিকে উড়ে আসছে এখন সারসের মত লম্বা সারি বেঁধে। পাখিরা ওপরে থাকে বলে পানিতে কোন জিনিসের গতিবিধি মানুষের অনেক আগেই টের পায়। তাই আহাব কিছু দেখতে না পেলেও উল্লসিত ডাক ছাড়তে ছাড়তে পানির ওপর চক্কর দিতে লাগল ওগুলো। হঠাৎ পানির অনেক নিচে বেজির মত সাদা একটা জিনিস ধরা পড়ল ক্যাপটেনের চোখে। সাদা ঝকঝকে দু'সারি দাঁত, হাঁ করা মুখটা যেন দরজা খোলা কোন সমাধি। দাঁড় টেনে নৌকোটাকে পিছিয়ে নিল আহাব, তারপর ফেদাল্লার সঙ্গে জায়গা বদল করে তুলে নিল পার্থের হারপুন।

কিন্তু মবি ডিকের যে-শয়তানি বুদ্ধির কথা সবাই বলাবলি করে, এবার দেখা গেল তার প্রকাশ। লম্বালম্বিভাবে মাথাটা সে নামিয়ে আনল হোয়েলবোটের ঠিক নিচে।

একটু পর সামান্য ভাসল মবি ডিক, তার চোয়ালের একটা পাশ এখন আহাবের মাথার ইঞ্চি ছয়েক ওপরে। এই অবস্থায় হারপুন বিদ্ধ করা অসম্ভব, তার ওপর পিঠ দিয়ে নৌকোটাকে ঝাঁকাতে লাগল তিমিটা। স্টার্নে কোনরকমে টিকে রইল ফেদাল্লা।

ক্রমাগত নৌকো ঝাঁকানো দেখে মনে হলো, মবি ডিক এতে বেশ একটা

BanglaBook.org

আনন্দ উপভোগ করছে। কিছুই করতে না পেরে আহাবের উন্মাদনা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। খোলা দুই হাতে সে চেপে ধরল তিমির চোয়াল। খানিক পর চোয়াল নামাল তিমিটা, তারপর এক কামড়ে দু'টুকরো করে ফেলল নৌকোটা। ছিটকে পানিতে পড়ল আহাব।

শিকারের কাছ থেকে খানিকটা সরে গেল মবি ডিক। মাঝে মাঝে তার মাথা উঠে গেল পানি ছেড়ে বিশ ফুট কি তারও বেশি ওপরে, ফলে নামানোর সময় উথালপাতাল হতে লাগল আশেপাশের পানি। একটু পর আবার ভাসমান নাবিকদের ঘিরে চক্কর কাটা শুরু করল মবি ডিক। একটা পা কৃত্রিম হওয়ায় সাঁতরানো আহাবের পক্ষে সহজ নয়, তবু কোনমতে ভেসে রইল সে।

ওদিকে পুরো দৃশ্যটাই দেখা গেল জাহাজের মাস্ট-হেড থেকে। উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে এল পেকোড। 'সোজা গিয়ে,' কথাটা শেষ না হতেই ঢেউয়ের ধাক্কায় খানিকটা ছিটকে গেল আহাব। কিন্তু ওপরে উঠতেই আবার বলল, 'সোজা গিয়ে তাড়িয়ে দাও তিমিটাকে!'

পেকোড এসে পড়ল তিমি আর ভাসমান নাবিকদের মাঝখানে। ধীরে ধীরে সরে গেল মবি ডিক, সঙ্গে সঙ্গে ছুটল উদ্ধারের নৌকো।

ধরাধরি করে স্টাবের হোয়েল-বোটে তোলা হলো আহাবকে। চোখদু'টো রক্তের মত লাল, শক্তি নিঃশেষ প্রায়। নিশ্চল পড়ে রইল সে বেশ কিছুক্ষণ। বুকের মৃদু ওঠানামা জানান দিল যে সে এখনও মরেনি।

'হারপুনটা,' অবশেষে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে সামান্য উঠে জিজ্ঞেস করল আহাব, 'আমার হারপুনটা ভাল আছে?'

'জ্বী, স্যার, আপনি ছোঁড়েননি বলেই রক্ষা পেয়েছে ওটা,' হারপুনটা দেখিয়ে বলল স্টাব, 'এই যে।'

'আমার সামনে রাখো। মারা গেছে কেউ?'

'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ– ওই যে পাঁচটা দাঁড়, স্যার, আর এখানে রয়েছে পাঁচজন মানুষ।'

'বেশ, বেশ। এবার একটু তুলে ধরো, আমি দাঁড়াতে চাই। না দাঁড়ালে যে মবি ডিককে দেখতে পাব না! ওই যে! ওই যে! এখনও যাচ্ছে সে বাতাসের দিকে! কী বিরাট ফোয়ারা! হাত সরাও, আমাকে ধরে থাকতে হবে না। হাড়ের ভেতর থেকে আবার চুঁইয়ে নামছে অনন্ত প্রাণশক্তি! সব পাল তুলে দাও! এখনই পিছু নাও ওটার!'

তিমি শিকারে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে যে উদ্ধারকৃত নৌকোর নাবিকেরা উদ্ধারকারী নৌকোর নাবিকদের সঙ্গে যোগ দেয়। পেকোডেও সেরকমই ঘটল। স্টাবের নাবিকদের সঙ্গে দাঁড় ধরল আহাবের নাবিকেরা। দ্বিগুণ শক্তি পেয়ে তীরবেগে এগোতে লাগল হোয়েল-বোট। কিন্তু তিমির শক্তির কাছে মানুষের মিলিত শক্তিও কিছুই নয়। মবি ডিক তার সাঁতারের বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। এখন তার কাছে যাওয়া একেবারে অসম্ভব না হলেও দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, অত সময় ধরে দাঁড় টানার শক্তি বজায় রাখা কোন নাবিকের পক্ষেই

BanglaBook.org

সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতিতে জাহাজ এগিয়ে আসে সাহায্য করার জন্যে। ভাঙা নৌকোটাকে আগেই তোলা হয়েছিল, এবার নাবিকসহ স্টাবের নৌকোটাকে তুলে নিয়ে দু'পাশের পাল তুলে পেকোড এগোতে লাগল অ্যালবাট্রসের মত। মাঝেমধ্যে যখনই ফোয়ারা চোখে পড়ল, চিৎকার করে জাহাজের সবাইকে জানিয়ে দিল মাস্ট-হেডের নাবিকেরা। ডেকে পায়চারি করতে করতে আহাব বলল, 'ডাবলুনটা এখন কার? তিমিটাকে দেখতে পাচ্ছ কেউ?'

কিন্তু ফোয়ারা ছাড়া তিমিটার আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফলে নাবিকেরা জবাব দিল, 'না, স্যার।' তখন আহাব নিজেই উঠতে চাইল ওপরে, কিন্তু খানিক পরে আবার ডেকে নেমে পায়চারি করতে লাগল সে। এভাবেই কেটে চলল দিনটা।

পায়চারি করতে করতে আহাব কখনও কখনও থামল তার ভাঙা নৌকোটার সামনে। বিষণ্ন মুখ আরও বিষণ্ন হয়ে উঠতে লাগল।

ব্যাপারটা লক্ষ করল স্টাব, তারপর ক্যাপটেনের মনে রেখাপাত করার মত কিছু কথা বলার জন্যে এসে দাঁড়াল পাশে। 'কাঁটাগাছটা বোধ হয় গাধাটার মুখে খুব লেগেছে, স্যার, তাই খেতে চাইল না। হা হা হা।'

'একটা ভাঙা নৌকোর সামনে দাঁড়িয়ে হাসাটা কিরকম নির্দয় ব্যাপার জানো? আমি তো এতদিন তোমাকে একজন বীরপুরুষই ভেবে এসেছি। কিন্তু এখন শপথ করে বলতে পারি, আসলে তুমি একটা কাপুরুষ। ভাঙা নৌকোর সামনে হাসির শব্দ একেবারে বেমানান।'

'জ্বী, স্যার,' এগিয়ে এল স্টারবাক, 'এরকম হাসা অশুভ লক্ষণ।'

'লক্ষণ? উঁহুঁ, ঈশ্বরের যদি কিছু বলার থাকে মানুষকে, তাহলে সরাসরিই বলবে, কোন লক্ষণ-টক্ষণ দেখাবে না। ভাগো এখান থেকে! তোমরা দু'জন একই জিনিসের বিপরীত দুই মেরু– স্টারবাককে ওল্টালে স্টাব আর স্টাবকে ওল্টালে স্টারবাক। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আহাব মাত্র একজন, ঈশ্বর বা মানুষ কেউই তার প্রতিবেশী নয়! উহ্, কী ঠাণ্ডা! কাঁপ ধরে যাচ্ছে! এই, আর কিছু দেখতে পেলে তোমরা? ফোয়ারা দেখলেই জানাবে, মুহূর্তে যদি দশ বার ফোয়ারা ছাড়ে– তবু!'

দিন প্রায় শেষ। দেখতে দেখতে চারপাশ ঢেকে গেল অন্ধকারে, মাস্ট-হেড থেকে ফোয়ারা দেখা আর সম্ভব নয়।

'আর দেখতে পাচ্ছি না, স্যার, খুব অন্ধকার,' ভেসে এল একটা কণ্ঠ।

'শেষ কোন্ দিকে যাচ্ছিল?'

'আগের মতই– বাতাসের দিকে স্যার।'

'এখন সে গতি কমিয়ে দেবে, রাত নেমে এসেছে তো। জাহাজের গতি কমিয়ে দাও, ওটার গায়ের ওপর উঠে পড়া চলবে না। মি. স্টাব, সারা রাতের জন্যে কাউকে তুলে দাও ফোরমাস্ট-হেডে।'– আহাব এবার এগিয়ে গেল মেইনমাস্ট-হেডের কাছে– 'এই ডাবলুন আমার, কিন্তু সাদা তিমিটা না মরা পর্যন্ত আমি এটা খুলে নেব না। মারা যাওয়ার দিন মবি ডিককে যে দেখতে পাবে, স্বর্ণমুদ্রাটা হবে তার। তবে সেদিনও আমিই যদি তিমিটাকে প্রথম

দেখতে পাই, তাহলে দশটা স্বর্ণমুদ্রার সমান টাকা ভাগ করে দেব তোমাদের মাঝে!'

হ্যাটটাকে আরও নামিয়ে ডেকের একপাশে গিয়ে দাঁড়াল আহাব। তারপর একইভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে রইল ভোর পর্যন্ত। মাঝে মাঝে তন্দ্রা ভেঙে শুধু চমকে উঠে দেখল, কিভাবে কেটে যাচ্ছে দীর্ঘ রাত।

১১০

সকালে তিন মাস্ট-হেডেই তুলে দেয়া হলো নতুন নাবিক।

'দেখতে পাচ্ছ তিমিটাকে?' জানতে চাইল আহাব।

'না, স্যার।'

'সব পাল তুলে দাও! যতখানি ভেবেছিলাম, তিমিটা তার চেয়ে অনেক জোরে যাচ্ছে– রাতে পালগুলো তুলে রাখাই উচিত ছিল। তবে এক দিক দিয়ে এটা ভাল হয়েছে– কাজের আগে বিশ্রাম।'

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দিনের পর দিন মাত্র একটা তিমির পিছু নেয়া কিন্তু সহজ কাজ নয়। দিনের আলোয় দেখা গেলেও রাতে তিমিকে দেখা যায় না। তখন নিখুঁতভাবে অনুমান করতে হয়, রাতের মধ্যে মাছটা কোন্ দিকে কতখানি এগোতে পারে।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে পেকোড।

'ডেকে পায়চারি করতে করতে পায়ে একেবারে খিল ধরে গেল!' বলল স্টাব। 'তবে জাহাজটার মতই সাহসী আমি! হা হা! ছুঁড়ে দাও আমাকে সাগরে, চলতে থাকব জাহাজের মতই!'

'ওই যে ফোয়ারা তুলছে! ফোয়ারা তুলছে! ঠিক সামনে!' ভেসে এল মাস্ট-হেড নাবিকের চিৎকার।

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' বলল স্টাব, 'আমি জানতাম, পালাতে তুমি পারবে না, বাবা তিমি, ফোয়ারা তুলতে তুলতে ফাটিয়ে ফেলো তোমার স্পাউট, স্বয়ং শয়তান পিছু নিয়েছে, তোমার আর নিস্তার নেই!'

পেকোডের নাবিকরা উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে। গত কাল দিন এবং রাতের পর আবার উত্তেজনা জেগে উঠেছে তাদের মধ্যে। নির্দিষ্ট একটা তিমি এই উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু। সব পাল তুলে দেয়ায় পেকোড় প্রায় উড়ে চলল।

তিরিশজন নাবিক এই মুহূর্তে আর তিরিশজন নেই, এক হয়ে গেছে। তাদের সাহস-ভয়-আশা আকাঙ্ক্ষা সব গাঁথা পড়েছে এক নিয়তির সুতোয়। আহাবের ইচ্ছের কাছে সবাই সঁপে দিয়েছে নিজেদের সত্তা।

'আরে, তোমরা তিমিটা সম্বন্ধে আর কিছু বলছ না কেন?' মাস্ট-হেড নাবিকদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ল আহাব। 'আমাকে তুলে নাও ওপরে, দেখায় তোমাদের ভুল হতে পারে। একবার মাত্র ফোয়ারা তুলে অদৃশ্য হয়ে যাবে, মবি

BanglaBook.org

ডিক সেরকম বস্তু নয়।'

আহাব ভুল বলেনি। উত্তেজনার মাথায় মাস্ট-হেড নাবিক অন্য কোন জিনিসকে মনে করেছে তিমির ফোয়ারা। আহাব ওপরে উঠতে না উঠতেই পেকোডের মাত্র মাইলখানেক সামনে ভেসে উঠল মবি ডিক।

'ওই যে! ওই যে!' সম্মিলিত চিৎকার ছাড়ল নাবিকরা। অতিকায় শরীর নিয়েও মবি ডিক স্যামন মাছের মত লাফিয়ে উঠল শূন্যে। আকাশ আর সাগরের নীল মিলেমিশে একাকার হওয়ায় ফোয়ারাটাকে মনে হলো হিমবাহের মত ঝকঝকে।

'হ্যাঁ, শেষ বারের মত লাফিয়ে নে,' বলল আহাব, 'সময় তোর শেষ হয়ে এসেছে। নৌকো নামাও! শিগগির!'

মবি ডিককে দেখার জন্যে যেসব নাবিক দড়াদড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছিল, ঝটপট নেমে এল তারা। নামল আহাবও।

গতকাল বিকেলে অতিরিক্ত একটা নৌকো ঝোলানো হয়েছিল ক্যাপটেনের জন্যে। সেটাতে উঠেই আহাব বলল, 'নামিয়ে দাও! মি. স্টারবাক, তুমি জাহাজ নিয়ে সরে যাও। তবে দেখো, নৌকোগুলো থেকে একেবারে দূরে যেয়ো না আবার। নামাও আমার নৌকো, এই মুহূর্তে!'

যেন একটা আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশ্যে মবি ডিক এগিয়ে আসতে লাগল নৌকো তিনটের দিকে। মাঝখানে রয়েছে আহাবের নৌকো। তিমির মাথা বরাবর নাবিকদের এগোতে বলল সে। এটা একটা কৌশল, একেবারে সামনের দিকে দেখতে পায় না তিমি। হঠাৎ গতি বাড়িয়ে, হাঁ করে লেজ আছড়াতে আছড়াতে ছুটে এল মবি ডিক। হারপুন ছুঁড়ল তিনটে নৌকো, কিন্তু তিমিটা সেসবের তোয়াক্কাই করল না, নৌকোগুলোকে খণ্ড বিখণ্ড করলে তবে যেন তার শান্তি। কৌশলের সঙ্গে আঘাত এড়িয়ে যেতে লাগল নৌকো তিনটে, আর এই হুটোপাটির মাঝেও আদেশ দিয়ে চলল আহাব।

এদিকে মবি ডিক একবার এই নৌকো একবার ওই নৌকোর দিকে ছোটার ফলে প্যাঁচ লেগে গেছে হারপুনের লাইনগুলোতে। আহাব লক্ষ করল, নৌকো থেকে ছোঁড়া অসংখ্য বর্শা আর হারপুনের প্রান্ত হাঙরের দাঁতের মত এগিয়ে আসছে তার নৌকোর দিকে। ঝটপট ছুরি তুলে নিয়ে নৌকোর লাইনগুলো কেটে দিল আহাব। মুক্ত হলো তার নৌকো, কিন্তু আটকা পড়ে রইল স্টাব আর ফ্লাস্কের নৌকো দুটো।

এতক্ষণ সম্ভবত একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল তিমিটা, এবার সোজা ছুটে এসে আঘাত হানল দুই নৌকোয়। তক্তাগুলো খুলে গেল, কে কোথায় ছিটকে পড়ল তার কোন ঠিক নেই। পানিতে বিশাল এক বাদামী আলোড়ন তুলে ডুবে গেল মবি ডিক।

ভাঙা দুই হোয়েল-বোটের নাবিকেরা পাগলের মত এদিক-সেদিক সাঁতরাচ্ছে ভেসে যাওয়া টাব, দাঁড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ধরার জন্যে। শূন্য শিশির মত ওঠানামা করছে ফ্লাস্কের মাথা। উদ্ধার পাবার জন্যে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে স্টাব। আহাব এগিয়ে গেল তাদের দিকে। হঠাৎ পানি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল তার

নৌকো। বিশাল কপাল দিয়ে খানিক ঠেলা দেয়ার পর জোর ধাক্কা লাগাল সাদা তিমিটা। শূন্যে উঠে গেল আহাবের নৌকো, তারপর কয়েক বার পাক খেয়ে আছড়ে পড়ল পানিতে। সাগর প্রান্তের গুহায় বাস করা সীলমাছের মত নাবিকদের নিয়ে নৌকোর নিচ থেকে বেরিয়ে এল আহাব।

সামান্য সরে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়াল তিমিটা, ভাসমান দাঁড় বা অন্য যে-কোন জিনিস লেজের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলল প্রচণ্ড আঘাতে। এভাবে কিছুক্ষণ ধ্বংসলীলা চালাবার পর গতকালের মত আবার রওনা দিল মবি ডিক।

এবারেও উদ্ধার করতে এগিয়ে এল পেকোড। প্রথমে একটা নৌকো নামিয়ে দিয়ে নাবিকদের তুলে নিল, তারপর একে একে তোলা হলো ভাসমান জিনিসপত্র। সৌভাগ্যের বিষয়, কেটে ছড়ে যাওয়া ছাড়া মারাত্মক আঘাত কেউই পায়নি। ডেকে তোলার পর সবার চোখ গিয়ে পড়ল আহাবের ওপর। দাঁড়িয়ে আছে সে স্টারবাকের কাঁধে ভর দিয়ে, কখন যেন খুলে পড়ে গেছে হাড়ের পা-টা।

'স্টারবাক, কখনও কখনও কারও ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো সত্যিই খুব আরামের,' বিড়বিড় করে উঠল ক্যাপটেন।

'জিনিসটা টিকল না, স্যার,' এগিয়ে এল ছুতোর, 'আপনার পা-টা কিন্তু খুব খেটে তৈরি করেছিলাম।'

'আশা করি কোনও হাড় ভাঙেনি, স্যার,' গম্ভীর মুখে বলল স্টাব।

'হ্যাঁ, সবকিছু ভেঙে গেলেও হাড় আমার ভাঙেনি। তবে ভাঙা হাড় নিয়েও আহাব পৃথিবীর যে-কোন জিনিসের মোকাবিলা করতে পারে। যাকগে, তিমিটা গেছে কোন্ দিকে?'

'সোজা বাতাসের দিকে, স্যার।'

'তাহলে যাও, আবার শক্ত হাতে হাল ধরো। মি. স্টারবাক, নাবিকদের একত্রিত করো!'

'আগে আপনাকে বুলওয়ার্কে রেখে আসি, স্যার।'

'হায়রে দুর্ভাগ্য! নির্ভীক যে-ক্যাপটেন জীবনে কাউকে ভয় করেনি, তার কিনা এমন মেট!'

'কী বললেন, স্যার?'

'আমার শরীরের অবস্থা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। বেত বা ভাঙা একটা বর্শা দাও, তাহলেই আমি দাঁড়াতে পারব। তুমি নাবিকদের একত্রিত করো। একজনকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। হারিয়ে গেছে? শিগগির সবাইকে ডাকো!'

বুড়োর সন্দেহই সত্য বলে প্রমাণিত হলো। নাবিকদের জড়ো করার পর দেখা গেল, কামার সেখানে নেই।

'কামার নেই,' বলল স্টাব, 'ও নিশ্চয় জড়িয়ে গিয়েছিল তাহলে–'

'তোমার মুখে পোকা পড়ক! দৌড় দাও সবাই, কেবিন আর ফোকাসলে খুঁজে দেখো, আছেই কোথাও না কোথাও।'

কিন্তু খোঁজাখুঁজি করে ফিরে এল সবাই, কামারকে পাওয়া গেল না।

BanglaBook.org

'জ্বী, স্যার,' বলল স্টাব, 'ও জড়িয়ে গিয়েছিল আপনার লাইনের সঙ্গে– আমার তো মনে হয় ওকে তলিয়ে যেতেও দেখেছি।'

'হায় ঈশ্বর! অন্তত একবার মাথা ঠাণ্ডা করে বোঝার চেষ্টা করুন,' বলল স্টারবাক। 'ওই তিমিকে আপনি কখনও মারতে পারবেন না। ঈশ্বরের দোহাই, এই উন্মাদনা ছাড়ুন। দু'দিন পিছু নিলেন, একের পর এক ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল নৌকোগুলো, পা-টাও হারালেন। ঈশ্বর আপনাকে বার বার সাবধান করে দিচ্ছেন, এখনও সময় আছে। আসলে কী চান আপনি? আমরা সবাই মারা পড়ি খুনে ওই মাছটার পিছু নিয়ে? আমাদের সবাইকে সে সাগরের অতলে টেনে নিয়ে যাক, এটাই কি আপনি চান?'

'স্টারবাক, পরে তোমার প্রতি একটা টান জেগেছে আমার। কবে থেকে, সেটা তুমি খুব ভাল করেই জানো। কিন্তু এই তিমিটার ব্যাপারে তোমার ভয় পাওয়া চলবে না। মনে নেই, এই সাদা তিমিটাকে মারার জন্যে কোটি কোটি বছর আগে থেকে মহড়া দিয়ে আসছি আমরা দু'জন? এত আগে থেকে যে এই সাগরের জন্মও তখন হয়নি, মনে পড়ে? কিসের এত ভয় তোমার, স্টারবাক? নিয়তির? নিয়তিকে তো আমি নিয়ন্ত্রণ করি। তাছাড়া একটা পা হারিয়েও আমি যদি নির্ভীক থাকতে পারি, তুমি সুস্থ-সবল মানুষ হয়ে কেন কাঁপবে নিয়তির ভয়ে? আচ্ছা, তুমি এসব লক্ষণ-টক্ষণ বিশ্বাস করো? যদি তা-ই করো, তাহলে ভেবে নাও, তিমিটার শেষ লক্ষণ আমরা দেখেছি। দু'বার ডোবার পর দু'বার উঠেছে তিমিটা। আগামীকাল সে উঠবে শেষ বারের মত ডোবার জন্যে। তৃতীয় বার ওঠাই হবে তার শেষ ওঠা। কি, সাহস একটু জাগছে এখন?'

'আমার ভয়-ডর সব উবে গেছে, স্যার,' বলল স্টাব। 'আমি এখন আগুনের মত নির্ভীক।'

'এবং আগুনের মত যান্ত্রিক,' বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে এল আহাব। 'ওহ্, এসবকে নাকি লক্ষণ বলে! কামার, কামার, সত্যিই কি নেই সে? মরার আগে আরেকবার তার দেখা নিশ্চয় পাব– কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? এ-ধাঁধা তো মাথায় ঢুকছে না– তবু এর সমাধান আমি করবই!'

গোধূলি নেমে এল, তিমিটা তখনও বাতাসের দিকেই চলেছে।

গত রাতের মতই আবার খাটো করা হলো পাল, কমে এল পেকোডের গতিবেগ। কানে আসতে লাগল শুধু হাতুড়ির শব্দ, লণ্ঠনের আলোয় জাহাজের গায়ে আবার হোয়েল-বোট ঝোলানোর তোড়জোড় চলছে, অস্ত্রপাতিতে শান দিচ্ছে কেউ কেউ। হ্যাট মাথায় ডেকের একপাশে সারা রাত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল আহাব, প্রথম সূর্যের আলো দেখার আশায় দৃষ্টি স্থির পুবাকাশে।

১১১

তাজা বাতাস বয়ে নিয়ে এল তৃতীয় দিনের ভোর। প্রত্যেকটা মাস্ট-হেডে তুলে দেয়া হলো নতুন নাবিক।

BanglaBook.org

'তিমিটাকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা?' জানতে চাইল আহাব। না-সূচক জবাব দিল সবাই।

'লক্ষ রাখো সবাই, তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখো চারদিকে। আহ্, আবার কী চমৎকার একটা দিন! এর চেয়ে সুন্দর ভোর আর হতে পারে না। এই পরিবেশে চিন্তার খোরাক আছে, কিন্তু আহাব কখনও চিন্তা করে না। সে শুধু অনুভব করে। অনুভব– নশ্বর মানুষের পক্ষে ওটুকুই যথেষ্ট! চিন্তা করা ধৃষ্টতা। চিন্তা করার অধিকার রয়েছে কেবল ঈশ্বরের। কারাগার আর হাসপাতাল থেকে বয়ে আসা বিশ্রী বাতাস এখানে এসে সুন্দরের পোশাক পরেছে। আমি বাতাস হলে দুর্দশাগ্রস্ত এই পৃথিবীতে কখনোই বইতাম না। তবে এটা ঠিক যে বাতাসের মধ্যে একটা বীরত্বব্যঞ্জক ব্যাপার রয়েছে। আজ পর্যন্ত কে তাকে জয় করতে পেরেছে? যে-কোন লড়াইয়ে সে-ই জয়ী হয় শেষমেশ। যাকগে, চোখ তীক্ষ্ণ করো সবাই। কী দেখতে পাচ্ছ?'

'কিচ্ছু না, স্যার।'

'কিচ্ছু না! এদিকে যে প্রায় দুপুর হয়ে এল! কারও কাছে যাবার জন্যে ডাবলুনটা অস্থির হয়ে উঠেছে। আমরা নিশ্চয় পেরিয়ে এসেছি তিমিটাকে। এখন আমরা তাকে অনুসরণ করছি না, সে-ই আমাদের অনুসরণ করছে। হ্যাঁ, গত রাতেই তিমিটাকে পেছনে ফেলে দিয়েছি আমরা। জাহাজ ঘোরাও! মাস্ট-হেডের ক'জন ছাড়া নেমে এসো আর সবাই।'

ঘুরে বাতাসের উল্টো দিকে চলতে লাগল পেকোড।

আপনমনে বিড়বিড় করে স্টারবাক বলল, 'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। কিন্তু হাড়-মাংস ভেতর থেকে কেমন জমে যেতে চাইছে। তাঁকে মান্য করার ফলে আমি বুঝি ঈশ্বরকে অমান্য করছি!'

'আমাকে ওপরে টেনে তোলো,' এগোতে এগোতে বলল আহাব। 'শিগগিরই ওটাকে দেখতে পাব আমরা।'

'জ্বী, স্যার,' আবার আহাবের আদেশ পালন করল স্টারবাক, ঝুড়িতে বসে দুলতে দুলতে ওপরে উঠে গেল ক্যাপ্টেন।

দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা ঘণ্টা। সময়ও যেন উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। অবশেষে ওয়েদার বো থেকে তিন পয়েন্ট সামনে ফোয়ারা দেখতে পেল আহাব। একইসঙ্গে তিন মাস্ট-হেড নাবিকেরও চোখে পড়ল ফোয়ারাটা। পরমুহূর্তে বাতাস বিদীর্ণ হলো তাদের চেঁচামেচিতে।

'এই নিয়ে তিন বার তোর মুখোমুখি হব, মবি ডিক। মি. স্টারবাক, এখন নৌকো নামানো যাবে না, তিমিটা দূরে আছে। বেশ জোরেই যাচ্ছে সে, আমাকে নামতে হবে এখান থেকে। তবে নামার আগে আরেক বার সাগরটাকে দেখে নিই। পুরনো একটা দৃশ্য, তবু যেন চির নতুন। সেই কবে, ছোটবেলায়, প্রথম সাগর দেখেছিলাম ন্যানটাকেটের বালিয়াড়ির ওপর থেকে, অথচ আজও তার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। নূহ নবী যেমন দেখেছিল, সাগর আজও ঠিক তেমনি আছে। মাস্ট-হেড, তিমিটার ওপর চোখ রাখো।'

ঝুলতে ঝুলতে ডেকে নেমে এল আহাব।

BanglaBook.org

যথাসময়ে নামানো হলো নৌকো। ওঠার আগে চীফ মেটকে ডাকল আহাব।

'স্টারবাক!'

'বলুন, স্যার।'

'তৃতীয় বার আমার নৌকো তিমিটার পিছু নিতে যাচ্ছে।'

'জী, স্যার।'

'স্টারবাক, কোন কোন জাহাজ বন্দর থেকে বেরোয় কিন্তু আর কখনোই বন্দরে ফিরে আসে না।

'ঘটনাটা দুঃখজনক হলেও সত্য।'

'জোয়ার-ভাঁটার সময় মানুষ মরে, মরে অগভীর পানিতেও। আমি বুড়ো মানুষ, স্টারবাক। এসো, হাত মেলাও আমার সঙ্গে।'

মিলে গেল দু'জোড়া হাত, সামনাসামনি তাকিয়ে চোখ ভিজে উঠল স্টারবাকের।

'ক্যাপটেন, ক্যাপটেন, দয়া করে যাবেন না!'

'নৌকো নামাও!' ঝটকা মেরে স্টারবাকের হাত সরিয়ে দিল আহাব। 'নাবিকেরা প্রস্তুত হও!'

নৌকো নিয়ে আসা হলো স্টার্নের ঠিক নিচে।

'হাঙর! হাঙর!' চেঁচিয়ে উঠল কে যেন, 'ক্যাপটেন, যাবেন না!'

কিন্তু আহাব সেই চিৎকার শুনেও শুনল না।

নৌকো জাহাজ থেকে সামান্য সরে যেতেই পানির নিচ থেকে উঠে এল দলে দলে হাঙর। প্রত্যেক বার ডুব মারার আগে কামড় বসাতে লাগল দাঁড়ে। এই দৃশ্যটা অবশ্য দুর্লভ নয়। অনেক সময়েই হোয়েল-বোটকে অনুসরণ করে হাঙরের দল। তবে সাদা তিমিটাকে দেখার পর এই প্রথম হাঙর চোখে পড়ল। এগোতে লাগল ওগুলো আহাবের নৌকোর পিছে পিছে, অন্য নৌকোগুলোর কোনরকম অসুবিধে সৃষ্টি করল না।

হঠাৎ নিচের দিকে হাত দেখিয়ে একটা ইশারা করল মাস্ট-হেডের নাবিক। আহাব বুঝতে পারল, তিমিটা শব্দ করেছে। কিন্তু মাছটার আরও কাছে যাবার জন্যে নৌকো থামাবার নির্দেশ দিল না।

'কখনও কোন কফিন আমার কাজে লাগবে না, আমার মৃত্যু হতে পারে একমাত্র শণের দড়িতে। হা! হা! হা!' উন্মাদের মত হাসছে আহাব।

চারপাশের পানি ফুলে উঠতে লাগল, নিচ থেকে ভেসে এল একটা গুম গুম শব্দ। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল নাবিকেরা। ভৌতিক একটা প্রকাণ্ড সাদা মূর্তি ভেসে উঠল ধীরে ধীরে, শরীরের পাশ থেকে ঝুলছে অসংখ্য লাইন, হারপুন আর বর্শা। পানি থেকে ত্রিশ ফুট ওপরে মাথা তুলল মবি ডিক, চারপাশের পানি রূপান্তরিত হলো কাঁচা দুধে।

'এগোও!' দাঁড়িদের উদ্দেশে চিৎকার করল আহাব। আক্রমণের জন্যে ছুটে এল মবি ডিক। অন্য নৌকো দুটোর গলুই ভেঙে গেল, কিন্তু অক্ষত রয়ে গেল আহাবেরটা।

ভাঙা গলুই তোলার জন্যে ঝুঁকে পড়ল ডাগ্‌গু আর কুইকেগ। সাদা তিমিটা

BanglaBook.org

সরে যেতে লাগল। বিস্ফারিত চোখে সবাই দেখল, তিমিটার পাঁজরের কাছে জট পাকানো লাইনে আটকে রয়েছে কামারের প্রায় দু'টুকরো হয়ে যাওয়া মৃতদেহ। পোশাক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, খোলা দুই চোখ সোজা তাকিয়ে রয়েছে আহাবের দিকে।

হারপুন পড়ে গেল ক্যাপটেনের হাত থেকে।

'তাহলে আবার দেখা হলো তোমার সঙ্গে,' কয়েক মুহূর্ত দম বন্ধ করে রাখার পর বলল সে। 'মেটরা, জাহাজে চলে যাও, নৌকো মেরামত করে পারলে ফিরে আসো। মরার জন্যে আহাব একাই যথেষ্ট– কি ব্যাপার, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, যাও, তোমরাই তো আমার হাত-পা, সুতরাং অবাধ্য হয়ো না। তিমিটা কোথায়? আবার ডুব মেরেছে?'

নিচু হয়ে বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করল আহাব। না, কাছে কোথাও নেই তিমিটা। তারপর মাথা তুলতে সে দেখল, মবি ডিক পেকোড পেরিয়ে যাচ্ছে।

'ওই যে, ক্যাপটেন,' বলল স্টারবাক, 'এখনও সময় আছে, ফিরে আসুন। দেখছেন না, তিমিটা চলে যাচ্ছে? মবি ডিক আপনাকে খুঁজছে না, আপনিই তাকে খুঁজছেন!'

কিন্তু পাল তুলে দ্রুত বেগে আবার ধাওয়া শুরু করল আহাব। পেকোডের পাশে আসতে দেখল, ট্যাসটেগো, কুইকেগ আর ডাগগু ইতিমধ্যেই উঠে পড়েছে মাস্ট-হেডে। রেলিংয়ে ঝুঁকে থাকা স্টারবাককে ধীরে ধীরে অনুসরণ করতে বলল সে। পোর্টহোল দিয়ে স্টাব আর ফ্লাস্ককেও সে দেখতে পেল এক ঝলক, দু'জনেই নতুন হারপুন আর বর্শা খোঁজায় ব্যস্ত। হাতুড়ির শব্দও কানে এল তার, মেরামত হচ্ছে ভাঙা নৌকো।

গতি ইতিমধ্যে কমিয়ে দিয়েছে মবি ডিক। হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তিন দিনের দৌড়াদৌড়িতে, কিংবা হারপুন আর বর্শার আঘাতে। প্রায় কাছাকাছি এসে পড়ল আহাবের হোয়েল-বোট। হাঙরের পাল তখনও পিছু ছাড়েনি। মাঝে মাঝেই কামড় বসাচ্ছে তারা, ফলে এবড়োখেবড়ো হয়ে যাচ্ছে দাঁড়।

'ব্যাটাদের পাত্তা দিয়ো না, ওরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

'কিন্তু, স্যার, শয়তানগুলোর কামড়ে দাঁড় যে ছোট হয়ে আসছে।'

'এই দাঁড়ই আরও অনেকক্ষণ টিকবে! বেয়ে যাও!– কিন্তু কে জানে,' বিড়বিড় করতে লাগল আহাব, 'কাকে খাবার জন্যে পিছু নিয়েছে হাঙরের দল, তিমিটাকে না আমাকে!– যা-ই হোক, দাঁড় বেয়ে যাও তোমরা! হাল ধরো! আমাকে সামনে যেতে দাও।' দু'জন নাবিকের সাহায্যে নৌকোর সামনে এসে দাঁড়াল সে।

অবশেষে মবি ডিকের পাশে এসে পড়ল হোয়েল-বোট। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ঝকঝকে সাদা কুঁজ, কুয়াশার ফোয়ারা যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। অভিশাপ দিতে দিতে হারপুন ছুঁড়ল আহাব। প্রায় সকেট পর্যন্ত ঢুকে গেল হারপুন। যন্ত্রণায় মোচড় খেলো মবি ডিক, ঢুঁ লাগল নৌকোতে। গানেল আঁকড়ে ধরে না থাকলে আবার সাগরে পড়ে যেত আহাব। তবে সে ছাড়া বাকি তিন নাবিক ছিটকে পড়ল পানিতে। দু'জন সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল হাঁচড়ে-পাঁচড়ে, কিন্তু একজন সাঁতরাতে লাগল অসহায়ভাবে। নৌকো ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে মবি ডিকের টানে।

নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে নিতে বলল আহাব। ব্যস্ত হয়ে উঠল নাবিকেরা, কিন্তু

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে টান লেগে ছিঁড়ে গেল লাইন।

'কি ছিঁড়ে গেল আমার ভেতরে? মাংসপেশী? না, জোড়া লেগে গেছে আবার। দাঁড় বাও সবাই! জোরে জোরে!'

ঘুরতেই তিমিটার চোখে পড়ল এগিয়ে আসা জাহাজের কালো হাল। সম্ভবত সে ভাবল, এটা আরও বড় কোন শত্রু। ছড়ানো ফেনার মাঝে হাঁ করে জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তিমিটা।

টলে উঠল আহাব, হাত বাড়ি খেলো কপালের সঙ্গে। 'সবকিছু আঁধার হয়ে এল কেন? রাত নামল নাকি?'

'সাদা তিমি! জাহাজ!' চিৎকার করে উঠল এক নাবিক।

'এগোও সবাই! হে সাগর, একটা শেষ সুযোগ দাও, আহাব যেন লক্ষ্যভেদ করতে পারে। জাহাজ! জাহাজ! আরও জোরে দাঁড় বাও! তোমরা কি আমার জাহাজটাকে রক্ষা করবে না?' আহাবের কণ্ঠে আক্ষেপ ফুটে উঠল।

কিন্তু হোয়েল-বোট জাহাজের কাছে যাবার আগেই তিমিটা যেখানে আঘাত হেনেছিল, সেখান থেকে খুলে পড়ল দু'টো তক্তা। হুড় হুড় করে পানি ঢুকতে লাগল, তোড় ঠেকাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল নাবিকেরা।

মাস্ট-হেড থেকে ট্যাসটেগো দেখল, হাঁ করে এগিয়ে আসছে তিমিটা। নিচ থেকে স্টাব আর ফ্লাস্কও দেখতে পেল এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

'তিমি! তিমি! এরকম অসহায়ভাবে স্টারবাককে মরতে দিয়ো না! এখানেই কি তাহলে আহাবের সব প্রার্থনার ইতি হতে যাচ্ছে? ওই যে, ভয়ঙ্কর চোয়াল খুলে এগিয়ে আসছে দানবটা। ঈশ্বর, আমার পাশে এসে দাঁড়াও!' পাগলের মত প্রলাপ বকছে আহাব।

জাহাজের বো থেকে অসহায়ের মত ঝুলছে নাবিকরা। হাতে তাদের হাতুড়ি, তক্তার টুকরো, বর্শা, হারপুন। মবি ডিকের দিকে চেয়ে তাদের দু'চোখ বিস্ফারিত। ফেনা কেটে তীব্র গতিতে ছুটে এল সাদা মাথাটা, প্রচণ্ড ধাক্কা মারল স্টারবোর্ড বোতে। ছিটকে পড়ল সবাই, জাহাজে পানি ঢুকতে লাগল পাহাড়ী ঢলের মত।

জাহাজের নিচে ঢুকে উল্টো পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল মবি ডিক, তারপর চুপচাপ ভেসে রইল আহাবের হোয়েল-বোটের কয়েক গজ দূরে।

'ট্যাসটেগো, তোমার হাতুড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছি না কেন? আমার হার-না-মানা তিন বীরও কি তাহলে হার মানল? নাবিকদের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার গৌরবও কি তাহলে আমার ভাগ্যে জুটবে না? নিঃসঙ্গ জীবনের নিঃসঙ্গ পরিসমাপ্তি! মবি ডিক, সব ধ্বংস করেও তুই অপরাজেয়। কিন্তু শেষ নিশ্বাসেও আমি তোর প্রতি ছুঁড়ে দেব রাশি রাশি ঘৃণা!'

হারপুন ছুঁড়ল আহাব। ছুটতে লাগল হারপুন বিদ্ধ মবি ডিক। টাবের গা থেকে খুলে গেল লাইন, তারপর প্যাঁচ লাগল হঠাৎ। দ্রুত ঝুঁকে পড়ে প্যাঁচ খুলে দিতে গেল আহাব, কিন্তু হাত লাগাবার আগেই উড়ন্ত লাইনে জড়িয়ে গেল সে, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গিয়ে পড়ল পানিতে। শূন্য টাব থেকে একসময় ছিঁড়ে চলে গেল লাইন, টাবের আঘাতে ছিটকে পড়ে তলিয়ে গেল এক নাবিক।

BanglaBook.org

বিস্ময়ে এক মুহূর্ত পাথর হয়ে রইল হোয়েল-বোটের নাবিকেরা, তারপর ফিরল জাহাজের দিকে। কিন্তু কোথায় জাহাজ? ঘূর্ণির মাঝে জেগে আছে কেবল তার তিনটে মাস্ট-হেড; কুইকেগ, ডাগ্‌গু আর ট্যাসটেগো তখনও লটকে আছে সেখানে। হঠাৎ হোয়েল-বোটটা ছুটে গেল সেই ঘূর্ণিজলের দিকে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পেকোডের চিহ্নমাত্র রইল না। তবে পেকোড সম্পূর্ণ ডুবে যাবার আগে একটা কাণ্ড ঘটল। শয়তান যেমন স্বর্গীয় কোন জিনিস সঙ্গে না নিয়ে নরকে যাবে না, ঠিক তেমনি পেকোডের মেইন মাস্ট-হেডে ওড়া পতাকায় জড়িয়ে তলিয়ে গেল একটা সামুদ্রিক পাখি।

ঘূর্ণিজলের কাছ দিয়ে উড়তে লাগল ছোট ছোট পাখিরা, ফেনা আছড়ে পড়ল এদিক-সেদিক। তারপর একসময় সব শান্ত হয়ে এল, শুধু গড়িয়ে যেতে লাগল প্রকাণ্ড সব ঢেউ, মহাসাগরে যে-ঢেউ গড়াত পাঁচ হাজার বছর আগেও।

***

শেষ কথা

নাটকের যবনিকা পড়ে গেছে। তাহলে কেন আবার এই দৃশ্যের অবতারণা? কারণ, পেকোডের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে একজন রেহাই পেয়েছিল।

কামার মারা যাবার পর আমি যোগ দিয়েছিলাম আহাবের হোয়েল-বোটের নাবিকদের সঙ্গে। তৃতীয় দিনে হোয়েল-বোটে মবি ডিকের ঢুঁ লেগে দু'জন নাবিকের সঙ্গে ছিটকে পড়লাম পানিতে। ওরা দু'জনা ঝটপট উঠে পড়ল আবার, আমি উঠতে পারলাম না। ভাসতে ভাসতে একসময় এগিয়ে চললাম ঘূর্ণিজলের দিকে। উথালপাতাল হচ্ছে ক্রীম-রঙা সাগর, সামনে মুখ ব্যাদান করে আছে নিশ্চিত মৃত্যু। হঠাৎ চোখে পড়ল কালোমত কি যেন একটা। দেখি, কুইকেগের কফিনে তৈরি সেই লাইফ-বয়া, কখন যেন ছিঁড়ে পড়ে গেছে পেকোডের গা থেকে। উঠে পড়লাম ওটায়। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে লাগল ঠোঁট-বাঁকা সামুদ্রিক পাখির দল, লাইফ-বয়া ঘিরে ভদ্রলোকের মত সাঁতরে চলল হাঙরের পাল– একবারও কামড়াল না তারা। পুরো এক দিন এক রাত ভাসার পর দেখা হলো র‍্যাচেলের সঙ্গে। জাহাজটা তখনও খুঁজছিল ক্যাপটেনের সেই হারানো ছেলেকে, কিন্তু একজন এতিমকে পেল তার পরিবর্তে।